বাছাই করা বারোটি

সত্যজিৎ রায়

এক ডজন গপ্‌পো/আরো এক ডজন
আরো বারো/এবারো বারো সিরিজের
বারোটি গল্পের তরতাজা গ্রন্থ

বাছাই বারো ॥ সত্যজিৎ রায়

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

রায় পরিবারের ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে সত্যজিৎ রায়ের লেখনীর জগৎ, তাঁর ভাবনা চিন্তা, বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর গ্রন্থে সৃষ্ট চরিত্রগুলো নিয়ে একটি ব্যতিক্রমী আলোচনা সংবলিত।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

নওরোজ সাহিত্য সম্ভার

A book of Selected Short Stories of Satyajit Ray in the name of 'BASAI BARO' Selected Twelve. Published by Iftikhar Rasul Goarge on be-half of Nawroze Sahitya Samvar/Nasas Dhaka. 46, Banglabazar Dhaka 1100. First Published February 1986. Second Royal Edition : 2006. 3rd Print : 2008.
Price Tk. : One Hundred Fifty Only.

ISBN : 984-702-115-5

প্রকাশনায়	নসাস নওরোজ সাহিত্য সম্ভার'-র পক্ষে ইফতেখার রসুল জর্জ ৪৬ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
প্রথম মুদ্রণ	ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬
দ্বিতীয় রাজ সংস্করণ	২০০৬
তৃতীয় মুদ্রণ	জুন ২০০৮
প্রচ্ছদ	মোবারক হোসেন লিটন
কম্পোজ	নসাস কম্পিউটার্স নসাস ঢাকা'-র কম্পিউটার বিভাগ ৪৬ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুদ্রণে	হেরা প্রিন্টার্স ৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড ঢাকা ১১০০
মূল্য	একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

বাংলাদেশের সত্যজিৎ রায়ের
লেখার ভক্ত সমস্ত পাঠবৃন্দের
উদ্দেশ্যে—

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বাছাই বারো গল্পসূচি

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি
প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্‌
বঙ্কুবাবুর বন্ধু
ফ্রিৎস
বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম
ব্রাউন সাহেবের বাড়ি
মিঃ শাসমলের শেষ রাত্রি
পিন্টুর দাদু
ভূতো
সাধন বাবুর সন্দেহ
ফার্স্ট ক্লাস কামরা
ধাপ্পা

নসাস প্রকাশিত সত্যজিৎ রায়-এর অন্যান্য গ্রন্থ

- ফেলুদার অভিযান
- ফেলুদার অভিযান : ২
- তারিণীখুড়োর অভিযান
- প্রোফেসর শঙ্কুর অভিযান
- বারো ভুতের গপ্পো
- ফেলুদার সপ্তকান্ড
- সত্যজিৎ রায়ের প্রিয় গল্প
- সেরা অভিযান সমগ্র
- সেরা অভিযান সমগ্র : ২
- নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ এক ডজন

বাছাই বারো গল্পসূচি

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি
প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্‌
বঙ্কুবাবুর বন্ধু
ফ্রিৎস
বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম
ব্রাউন সাহেবের বাড়ি
মিঃ শাসমলের শেষ রাত্রি
পিন্টুর দাদু
ভূতো
সাধন বাবুর সন্দেহ
ফার্স্ট ক্লাস কামরা
ধাপ্পা

সত্যজিৎ রায়ের লেখনী বাংলাদেশের বাছাই বারো

রায়চৌধুরী পরিবারের বিচিত্র উজ্জ্বল পরিবেশে বিমর্ষ নিঃসঙ্গতার কোনো অবকাশ ছিল না। পূণ্যলতার লেখা থেকে অথবা সত্যজিৎ রায়ে'-র *'যখন ছোট ছিলাম'* থেকে ভালভাবেই অনুমান করা যায় দুঃখ বা বেদনার কালো ছায়া এ পরিবারের প্রবল প্রাণশক্তির কাছে সহজে হার মানত। প্রাণের প্রবলতার দুটি মুখ—এক, সে কল্পনা করতে ভয় খায় না, দুই, কৌতুকের ঝিকিমিকি প্রাণস্রোতে সদাই খেলা করে। উপেন্দ্রকিশোরের জমজমাট পরিবারে বিত্ত থেকে চিত্ত ছিল অনেক বেশি—জীবন সেখানে স্রোতের মতো প্রাণবন্ত বলে কেউ কোথাও আবদ্ধ ছিল না—না কীর্তির অহঙ্কারে, না বয়সের গরিমায়। সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত অহমিকার ক্ষুদ্র 'আমি' সেখানে মাথা চাড়া দিত না বলেই 'আমি'-র আত্মবিকাশের পথ ছিল অনবরুদ্ধ। *'যখন ছোট ছিলাম'* অথবা পূণ্যলতার লেখা থেকে আমরা এই পরিবারের অনর্গল প্রাণময় মেশামেশির অবিরল সাক্ষ্য পাই। উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার এই প্রধান দুই রায়-শিশুর অমলিন অফুরন্ত জগতে তাঁদের মননকর্ম নিবেদন করেছিলেন। পারিবারিক ব্যবহারিক জীবনেও তার দ্বিরাচারণ ছিল না। উপেন্দ্রকিশোর জিজ্ঞাসু শিশুকে থামিয়ে দেবার কুমন্ত্রণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। রেলগাড়ির বিস্মিত সহযাত্রী দেখেছিলেন কীভাবে তিনি বাচ্চাদের সঙ্গে মনের অবাধ সেতুবন্ধন রচনা করেন। সুকুমার রায় তাঁর অদ্ভুত মনগড়া জন্তু-জানোয়ারদের প্রথম রচনা করেছেন ছোট ভাই বোনদের খুশি করতে গিয়ে। আজকে সময়ের দিক থেকে এত তফাতে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটির একটা অন্য তাৎপর্যও চোখে পড়ে। পরাধীন ভারতে, অষ্টাবক্র সমাজে, নানা বন্ধনে জর্জর অস্তিত্বের তাড়নায় যে আবেগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছুটে গিয়েছিলেন প্রকৃতির কাছে, তারই সঙ্গে বুঝি তুলনীয় পুরোগামী রায়দের শিশুর জগতে ঘুরে বেড়ানো। শিশুর নিশ্চিত, শিশুর অকৃত্রিমতা, বন্ধনবিমুগ্ধতা, অবাধ কল্পনার দুঃসাহস, ছকবাঁধা ব্যাপারে অরুচি—আমাদের স্বাধীনতাস্পৃহারই অন্য রূপক। ঠিক এমনভাবে তাঁরা কেউ কথাটি বলেন নি। কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট জগতের বিচিত্র অবাধ প্রান্তরের মুক্তি নিতে নিতে আজও এই কথাটি এমন করেই আমাদের মনে

হয়। এই কথাটি এমন করে নয়, কিন্তু অন্যরকমে মনে হয় সত্যজিৎ রায়ে'-র গল্প পড়তে পড়তেও। সেখানে আমরা যে সব চরিত্রের দেখা পাই তারা আমাদের বাস্তব জগতেরই বাসিন্দা। কিন্তু কল্পনার সাহস তাদের অনেকেরই উপাদানে ব্যবহৃত। আমাদের খণ্ডিত অস্তিত্বের সমস্যাসঙ্কুল জগৎটা সেখানে মাথা চাড়া দেয় না। তার বদলে পাই মহাকাশের সঙ্কেত, অতল সমুদ্রের ডাক, মরু বা মেরুর ইশারা—অথবা মানুষের, একান্তই ছাপোষা সাধারণ মানুষের অশেষত্বের ঠিকানা। প্রযুক্তি পারঙ্গম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যে মানুষের গল্প তিনি শোনান সে মানুষ গাণিতিক সিদ্ধির জগতে গণিতের অতীত মানুষ। সুতরাং রায়চৌধুরীদের পরিবারের ঐতিহ্য-পটেই তাঁর গল্পের চরিত্রগুলিও প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত পাত্র। এই গল্পগুলির চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ সমীক্ষা বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য।

॥ ২ ॥

রায়চৌধুরী পরিবারের কীর্তিমান ঐতিহ্যের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সত্যজিৎ রায় তাঁর ক্ষেত্র নির্বাচন করেছেন। উপেন্দ্রকিশোরে'-র লক্ষ্য ছিল সেই সব শিশুরা যারা সবে মায়ের কোল থেকে নেমে পড়েছে, ডিঙিয়েছে বর্ণ পরিচয়ের বেড়া, *'টুনটুনির বই'* যেন তাদের গলার আওয়াজ আর বাক্যবন্ধের প্রতিধ্বনিতে নির্মিত। সুখলতা রাওয়ের গল্পও তাই। সবে যারা বাক্য গড়তে শিখেছে তাদের মাপ অনুযায়ীই যেন সে গদ্যের জগৎ গড়া। পক্ষান্তরে সুকুমার রায়ে'-র গল্প যাদের উদ্দেশ্যে রচিত, তারা আর একটু বড়—আজকের ভাষায় ক্লাস সিক্স সেভেন স্টান্ডার্ডের ছেলে তারা। তাদের নির্দোষ দুর্বুদ্ধিতা, নিছক নির্বুদ্ধিতা, গুল দেবার কল্পনাশক্তি, মজা করার দামাল অভিপ্রায়—এ সব নিয়ে গড়ে উঠছে সুকুমার রায়ের গল্প। সে গল্পের প্রধানাংশ স্কুল স্টোরি। বাংলা শিশু-সাহিত্যে নতুন সামগ্রী। সুকুমার রায়ে'-র কল্পনা ও অভিজ্ঞতা থেকে সম্ভব হয়েছে পাগলা দাশু'-র মতো চিরস্থায়ী চরিত্র। তার পাগলামীর মধ্যে একটা মেথড ছিল। সে জন্যই সে পাগলামি গভীরতর বাস্তব তাৎপর্যের ঠিকানা দিতে পারে—'যাও সবে নিজ নিজ কাজে'—আজও আমাদের বহু আড়ম্বরপূর্ণ অভিপ্রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ যবনিকা সম্পাতী বাচন। পাগলা দাশু-কে স্কুল স্টোরির পটভূমি ছাড়া ভাবাই যায় না।

সত্যজিত রায় কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। প্রথমেই লক্ষ্য করি, তিনি সুকুমাব রায় বা লীলা মজুমদারে'-র মতো একটিও স্কুল স্টোরি লিখলেন না।

দ্বিতীয় লক্ষণীয়, তাঁর গল্পে ছোট ছেলে বলতে যা বোঝায় তার সংখ্যা অনুপাতে কম। *'সদানন্দের খুদে জগৎ'*, *'পিন্টুর দাদু'*, বা *'অতিথি'*, গল্পের মতো ছোট ছেলেরই গল্প তাঁর খুব বেশি নেই। এর মধ্যে *'সদানন্দের খুদে জগৎ'* ছোটরা কতখানি ধরতে পারবে জানি না, গল্পটির মধ্যে ছোট ছেলের নৈতিক জগতের টেন্‌শন্ যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে সেটাও বালকভোগ্য নয়। তবু ছোট ছেলের মনোজগতের এমন প্রতিচ্ছবি দুর্লভ। তৃতীয় লক্ষণীয়—এবং এটাই তাঁর গল্পের আসল কথা—সে সব গল্প ছোটদের গল্প এই অর্থে যে ছোটরা বড়দের বিষয়ে যে সব গল্প শুনতে চায় এগুলো সেই জাতীয় গল্প। তার মানে এই নয় যে, বড়দের জীবনের সতর্ক নির্বাচিত অংশ নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন। সেই সতর্কতা থাকলে শিল্প হিসাবে গল্পগুলি মাটি হ'ত। বলবার কথাটা এই, তিনি বড়দের চরিত্রপাত্র করে গল্প লিখলেও সেগুলো অন্যদের মতো মজার গল্প নয়, কেবল এ্যাডভেঞ্চার স্টোরি নয়। তাঁর পৃথক কৃতিত্ব ছোটদের জন্য বড় বয়সীদের গল্প বলতে বসে সকলকে গল্প শোনানো। অথচ এ গল্প একদিকের বিচারে ছোটদেরই গল্প। যে পাঠকরা তাঁর মূল লক্ষ্য তাদের জীবনসম্বন্ধীয় নিজস্ব এ্যাটিচ্যুডকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করে এসব গল্প লেখা। সুকুমার রায়ে'-র গল্পবিষয়ে বুদ্ধদেব বসু'-র চমৎকার মন্তব্যটি আমরা মনে রাখি—'সুকুমার রায়ে'-র প্রত্যেক গল্পেই উপদেশ আছে কিন্তু সেটা বাইরে থেকে নিক্ষিপ্ত নয়, ভিতর থেকেই প্রকাশ পাওয়া; সে

উপদেশ সেই জাতের, যা বালকেরা নিজেরাই মাঝে মাঝে কৃতজ্ঞচিত্তে নিয়ে থাকে জীবন থেকে। এই জন্যই তাদের উপভোগ কখনো ব্যাহত হয় না; তাদের বয়সোচিত নানারকম ছলচাতুরী, বোকামি ও দুষ্টুমির শেষে জব্দ হওয়ার দৃশ্যটিতে নিজেরাই তারা প্রাণ খুলে হাসে; সত্যজিৎ রায়ে'-র গল্পে বাইরে থেকে ভিতর থেকে কোথাও থেকেই কোনো উপদেশ নেই। বড় ছোট নির্বিশেষে যেখানে একবয়সী হয়ে যায়, সেই আসরে সত্যজিৎ রায় এমন গল্প বলেন, আর যদি কিছু জানবার কথা থাকে তা হল—বিশ্বাস করো জগৎকে আর জীবনকে। জগতের বেলায় বিশ্বাস করো অসীম রহস্যে ভরা আ-মর্ত্য-নীহারিকা। জীবনের বেলায় বিশ্বাস করো—এর সুস্থিত নৈতিক নর্ম ভেঙে দেওয়া ঠিক নয়। ভূগোল বা মহাকাশ-বিশারদের মতো বা নীতিবেত্তার মতো তিনি এ কথা বলেন না কিন্তু। সর্বপ্রথমে সে-গুলি গল্প, সবশেষেও সে-গুলি গল্প। সুকুমার রায়ে'-র বালক চরিত্রগুলির পরবর্তী ক্লাশে উন্নীত রূপ লীলা মজুমদারে'-র কোনো কোনো গল্পে পাওয়া যায়। সুকুমার রায়ে'-র কোনো কোনো চরিত্রের উপভোগ্য নতুন রূপায়ণ দেখা যায় লীলা মজুমদারে'-র চমৎকাব কিছু গল্পে। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে সুকুমার রায়ে'-র জগ্যিদাসকে। আজগুবি গল্প বলার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তার। এক হিশাবে এ ক্ষমতা যত হাসির খোরাক যোগান দিক না কেন অন্যার্থে এতো তাঁর কল্পনাশক্তিরই প্রমাণ। লীলা মজুমদারে'-র বিখ্যাত গল্পের হরিনারায়ণ চরিত্র যেন জগ্যিদাসে'-র দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই। ছোট ছেলের প্রথম পাওয়া সমাজজীবন তার স্কুলজীবন। জগ্যিদাস ও হরিনারায়ণ-কে সেই সমাজজীবনেই পাওয়া যায়। সত্যজিৎ রায় সযত্নে তাঁর গল্পে এই সমাজবদ্ধ বালক বা কিশোরকে পাশ কাটিয়েছেন। তাকে নিয়ে কৌতুকগল্প লিখতে গেলে সেই সমাজজীবনের গুরুগম্ভীর নিয়মবদ্ধতার মাঝখানে সে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কোন্ অসঙ্গতি সৃষ্টি করছে সেটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে সত্যজিৎ রায় হাসির গল্প বলতে যা বোঝায় তা লেখেননি বললেই হয়, যদিও তাঁর গল্পে হিউমার প্রচুর। তাঁর গল্পের প্রধান চরিত্রপাত্রদের একাকীত্বের কথা আমি পূর্বে এক রচনায় বলেছি। এখানে এই বিষয়টি আরেকটু তলিয়ে দেখতে চাই।

॥ ৩ ॥

'যখন ছোট ছিলাম' এই অসামান্য স্মৃতিকথা নানা বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সে আলোচনার ক্ষেত্র আলাদা। কিন্তু যাঁর স্মৃতিকথা এই বইটি তাঁর নিজস্ব ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের গভীর গহনের একটা চাবিকাঠি এই বইটির প্রারম্ভে লেখক আনমনে

আমাদের হাতে তুলে দিলেন। চাবিকাঠিটি সম্পূর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের মর্মশালায় তৈরী—*'সাধারণ অসাধারণ প্রভেদ বড়দের মতো করে ছোটরা করে না, তাই তাদের মেলামেশার কোনো বাছবিচার থাকে না। এ ব্যাপারে গুরুজনের বিচার যে ছোটরা সবসময় বোঝে বা মানে তাও নয়।'* এই উক্তিটি রায়চৌধুরী পরিবারের মর্মশালায় প্রস্তুত এ কথা বলার কারণ আর কিছু নয়—কথাটির মধ্যে ছোট ছেলের চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের ও প্রথামুক্ত ভাবনা ভাবার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়া আছে। সেই স্বীকৃতির প্রতিষ্ঠা স্থাপনে রায়চৌধুরী পরিবারের তিন পুরুষের আত্মনিবেদন বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসের সামগ্রী। *'যখন ছোট ছিলাম'* বইটি অবশ্যই স্মৃতিকথা। সে স্মৃতিকথায় মেলে শ্রী রায়ে'-র মানসিক গঠনের গোড়াপত্তনের আদিকথা। *'আসলে আমার অনেকটা সময় একাই কাটাতে হত'*। এই একাকীত্বকে পূরণ করতে গিয়ে সেদিনের বালককে নিজের জগৎ কিছুটা নিজেকেই নির্মাণ করে নিতে হয়েছে। জানলার উল্টোদিকে দেওয়ালে বাইরের জগতের ছায়াছবি, দরজার ছোট্ট ফুটোয় ঘষা কাচ ধরে বাইরে দৃশ্য খুদে আকারে দেখা, চারখণ্ডে রোম্যান্স অফ ফেমাস লাইভ্স, স্টিরিওস্কোপ—এই সবই আলো ধরতে চাইছে এমন এক বালকতরুর বিচিত্র ডালপালা। এইখানে আমাদের মাথা স্বতঃই নত হয়ে আসে। সত্যজিৎ জননী সুপ্রভা দেবী'-র উদ্দেশ্যে। একান্ত অসময়ে পিতৃহারা সেই বালকটিকে তিনি অযথা সহানুভূতির ভারে বিব্রত করেন নি। তিনি জানতেন সে বালককে মানুষ করতে গেলে, ছন্দের বন্ধনে থেকে কবিতা যেমন স্বাধীনতা ভোগ করে, বালকটিকে তেমনই স্বাধীনতা দিতে হয়। তাই বোধ হয় সত্যজিতে'-র একলা থাকার বেলাটুকুতে তিনি হস্তক্ষেপ করেননি। এই বালকের জননীর পক্ষে এই জ্ঞানটুকু খুব জরুরী ছিল, কতটুকু এই বালককে বাঁধতে হবে আর কতখানি ছাড়তে হবে। তাঁর সেই একাকীত্বের কিয়দংশ ভর্তি হত ছেদিলাল আর হরেনে'-র উদ্ভাবন-নিপুণ কর্মঠ সখ্যে। চাবিকাঠি, মেটে লণ্ঠন, ঘুড়ি—এগুলো তো সেই একাকী বালকের আনন্দলোক আবিষ্কারের পথে এক একটা কুড়িয়ে পাওয়া রত্ন। নিজের মতো করে যে বাড়তে পায় নিজের মতো করে সে দেখতে শেখে। রায়চৌধুরী পরিবারের ছড়ানো চৌহদ্দির মধ্যে সে বালক আর একটা কথা বুঝেছিল যে, সেখানকার প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলি আপন আপন অভিনব এককত্বে অনন্য। কেউ তাঁরা বাঁধা চৌখুপিতে খাপ খাওয়ানোর জন্য জন্মাননি। ধনদাদু কুলদারঞ্জন রায় মুগুর ভাঁজতেন, ক্রিকেট মাঠে সেঞ্চুরি হাঁকাতেন, প্রপেলারের মত লাঠি ঘোরাতে পারতেন—অন্য সাক্ষ্য থেকে বলছি, *'ঘুলঘুলি দিয়ে হাত বাড়িয়ে খপ্ করে পাতি কাক ধরতেন'*,—কিন্তু আসল মানুষটি শিল্পী। ছোটকাকা সুবিমল রায় প্রতিটি গ্রাস বত্রিশ বার চিবোতেন, চার রকম রঙের কালিতে একটি

দূরনুমেয় লজিক ধরে এক একটি বাক্যের শব্দগুলি লিখতেন। কিন্তু আমাদেরই পরিচিত চায়ের যে বারোটি ধরন তিনি লিখে রেখে গেছেন, শুধু তাঁর জোরেই তাঁকে আমরা যথার্থ প্রতিভা বলতে পারি। এই কাকা-ভাইপোর সকৌতুক স্নেহ-শ্রদ্ধার ভিক্তিভূমিটি শ্রী রায়ে'-র পরবর্তী জীবনে নানা গল্পে বিচিত্র রসসঞ্চারী হয়েছে। তোপ্‌সে-ফেলুদা সম্পর্ক, হারুণ-ফটিক সম্পর্ক, শিবু-ফটিকদা সম্পর্ক এখানে আমাদের মনে পড়ে। লীলা মজুমদারে'-র গল্পের সঙ্গে এখানেও সত্যজিৎ রায়ে'-র গল্পের একটি তফাৎ দেখা যায়। লীলা মজুমদারে'-র গল্পে বালকটির দরকার হয় একটি শক্তপোক্ত মাঝবয়সী মাদার টাইপ। *'পদিপিসির বর্মীবাক্সে'*-র সেই ফরমিডেব্‌ল্ অবিস্মরণীয় দিদিমাটি যেমন। সত্যজিৎ রায়ে'-র কিশোর চরিত্রটি মাদার-টাইপের ধারে কাছে ঘেঁষে না। তাঁর দরকার কল্পনাকে নাড়া দিতে পারে এমন একটি বয়সে বড় যুবক চরিত্র। তার কারণ লীলা মজুমদারে'-র চঞ্চল বালকটির আত্মরক্ষার দরকার। সত্যজিৎ রায়ে'-র উন্মুখ কিশোরটির বিশ্ব রহস্যের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানোর জন্য সেতু দরকার।

সত্যজিৎ রায় তাঁর গল্পে দেখিয়েছেন—ব্যক্তির একাকীত্বের তথা অনন্যতার জন্য কোনো বৃহৎ কীর্তির ঠেক্‌নোর দরকার হয় না। ব্যক্তিত্বের অশেষত্ব একান্তভাবেই ব্যক্তির স্বোপার্জিত ব্যাপার। সত্যজিৎ রায়ে'-র *'পটলবাবু ফিল্‌ম্ স্টার'*, *'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'*, প্রভৃতি গল্প তথাকথিক অকিঞ্চিৎকর মানুষের অন্তর্গত অশেষত্বর গল্প। সাধারণের সাদা পোষাকে সংসার তাঁদের ঢেকে রাখলেও তাঁরা কথাটা অসাধারণ—সেটাই এসব গল্পের মূলকথা। ফেলুদা সিরিজের সিধু জ্যাঠা এই রকম লোক। বঙ্কুবাবু আর পটলবাবু'-র মধ্যে মিলটা লক্ষ্য করার মতো। জীবন তাদের দুজনের জন্যই দুটো ছোট ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। একজন কাঁকুরগাছি প্রাইমারি স্কুলের ভূগোলের মাস্টার, আরেকজন চাকরি খোয়ানো গেরস্ত মানুষ। কিন্তু শতেক লাঞ্ছনা সহ্য করেও বঙ্কুবাবু নিষ্ঠার সঙ্গে ভূগোল পড়ান। পটলবাবু সত্যি সত্যি অভিনয়শিল্পী। সিধু জ্যাঠার নাম ধাম ক্রিয়াকর্ম ফেলুদা ছাড়া কেউ জানে না। তিনি জানানোর জন্য ব্যস্তও নন। কিন্তু যেটা তিনি নিজের কাজ বলে ধরে নিয়েছেন সেখানে তিনি একনিষ্ঠ একাগ্র। এই অকৃত্রিমতা এসব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বাইরের সংসারের নানা ধাক্কায় নানা লাঞ্ছনায় বঙ্কুবাবু পটলবাবু'-র মতো মানুষরা ক্লান্ত হয় না শুধু অন্তরের মৃগনাভিটুকু অক্ষুন্ন বলে। সংসারের মাপমাঠিতে অপেক্ষাকৃত সফল প্রতিবেশীরা তাকে মজা ও টিপ্পনির বিষয় বলে মনে করে—কিন্তু ক্রেনিয়াস গ্রহের উন্নততর প্রাণী অ্যাং তাদের উন্নততর যন্ত্রে ঘর-ফেরতা বঙ্কুবাবুকেই তাদের যন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেখিয়ে যান, নর্থ পোলের অন্তহীন বরফের মরুভূমি, অরোরা বেরিয়ালিস, সিন্ধুঘোটক, পেঙ্গুইন। দেখিয়ে যান ব্রেজিলের জটিল অরণ্যের অসূর্যম্পশ্য ভীষণতার মধ্যে

অ্যান্যাকন্ডা সাপ, পিরান্‌হা মাছের বিভীষিকা। এই অতি অকিঞ্চিৎকর ভূগোলের মাস্টারের জীবনে যে বিশ্বব্যাকুলতা লুকিয়ে আছে তার এক আশ্চর্য পরিচয় এই অংশটি। তার অস্তিত্বের দীনতা ঘুচে গেল—বিশাল পৃথিবীর ও পৃথিবীরও ওপারের মহাকাশের সংস্পর্শে। আমরা বেশ অনুমান করতে পারি পরের দিন কাঁকুরগাছি প্রাইমারি স্কুলে ভূগোলের ক্লাশের মেধাবী আগ্রহী ছাত্রটির কাছে একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়ে এই শিক্ষক ধন্য হবে। পটলবাবু'-র গল্পটির পরিসমাপ্তিতে পটলবাবু'-র উপলব্ধিটি বড় কথা। আর্থিক প্রাপ্তির জন্য তার আর অপেক্ষা করার দরকার হল না—কেননা অভিনয় শিল্পের মূল রহস্যর অসীমতা তার কাছে ধরা দিয়েছে। শিল্পী জানে সব পাওয়ার বড় পাওয়া এটাই। হয়তো নিঃসম্পৃক্ত এ অনুমান—তথাপি ভাবতে ইচ্ছে হয়, পথের পাঁচালী'-র দুর্লজ্ঘ্য অর্থাভাবের দিনে অর্ধসমাপ্ত ছবিটির শিল্পরহস্যের দিকে তাকিয়ে তার স্রষ্টাও কোনোদিন ভেবেছিলেন—আমি তো জেনেছি আমার বলা কী রকম হবে।

কিন্তু এ প্রশ্নটা সত্যজিৎ বাবু'-র গল্প পড়তে পড়তে ক্রমশই অনিবার্য হয়ে ওঠে—ঠিক ছোট ছেলেদের জন্য লেখা কোন্ গল্পগুলি ? বাইরের দিক থেকে তার একটা মীমাংসা বোধ হয় আমরা করতে পারি। যে গল্পগুলি রায়চৌধুরী পরিবারের ধারাধরনের আত্মীয় সেগুলিই নিছক বালকভোগ্য গল্প। যেমন ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু'-র প্রথম ডায়েরিটি পড়তে গিয়ে আনমনে একবার না একবার ভাবতে হবেই *'হেশোরাম হুঁশিয়ারে'*-র ডায়েরি। অন্তত একবারও মনে হবেই দুই আবিষ্কারকের অভিযানের দুঃসাহসের মিল, অজ্ঞাতপূর্বকে আবিষ্কারের পর লাগসই নামকরণের দক্ষতা। *'হেশোরাম হুশিয়ারে'*-র হাস্যকরতা বাদ দিলে শঙ্কু'-র প্রাথমিক উপাদান নজরে পড়ে। প্রোফেসর শঙ্কু'-র গবেষণাগারের বিচিত্র উপদানগুলির প্রসঙ্গেও সুকুমার রায়ে'-র প্রোফেসর নিধিরাম পাটকেলের গবেষণাগারের বিচিত্র উপাদানগুলির কথা মনে পড়বে। প্রোফেসর পাটকেলের গোলার মধ্যে ছিল বিছুটির আরক, লঙ্কার ধোঁয়া, ছারপোকার আতর, গাঁদালের রস, পচা মূলোর এক্‌স্ট্র্যাক্‌ট। প্রোফেসর শঙ্কু'-র রকেটের উপাদানে ব্যাঙের ছাতা, সাপের খোলস, কচ্ছপের ডিমের খোলা,—তার সঙ্গে একুইয়স ভেলোসিলিকা। তবে শঙ্কু অতি দ্রুত এই প্রাথমিক অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে। প্রহ্লাদের সাংসারিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল শঙ্কু কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বঙ্কুবাবু নন। বঙ্কুবাবু'-র দীন সহিষ্ণুতা তার মধ্যে মিলবে না। তিনি আত্মপ্রত্যয়ী বৈজ্ঞানিক। অনেক কীর্তির অধিকারী। তার আবিষ্কৃত মিরাকিউরল ম্যাঙ্গোরেঞ্জ, এ্যানাইহিলিন, অরনিমন্, রিমেমব্রেন, অক্সিমোর, বটিকা ইন্ডিকা, অম্‌নিস্কোপ, স্নাফগান, মাইক্রোসোনোগ্রাফ ক্যামেরাপিড, সম্‌নোলিন, লিঙ্গুয়াগ্রাফ রোবু প্রভৃতি ঔষধ, যন্ত্র, অস্ত্র ও গ্যাজেট সরলার্থে বিস্ময়কর। তাঁকে আমরা আন্তর্জাতিক

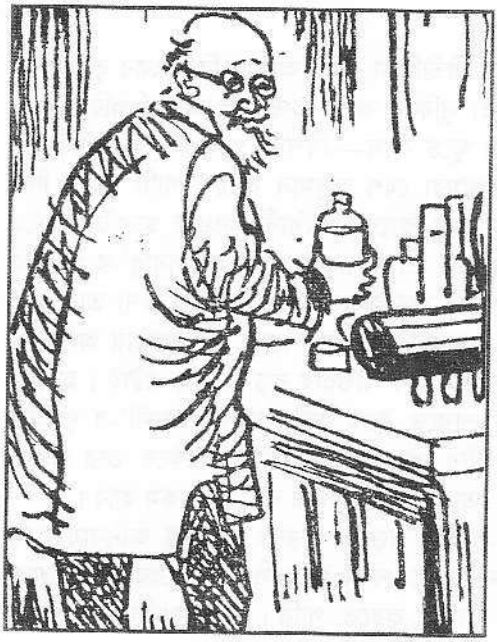

বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে সসম্মানে অবলীলাক্রমে ঘুরে বেড়াতে দেখি। কিন্তু তিনি খাঁটি বাঙালি। অবিনাশবাবুর মতো একান্ত এ্যাভারেজ প্রতিবেশীকে তিনি অম্লান বদনে সহ্য করেন সকৌতুকে। কোনো খাঁটি বাঙালি টাকওয়ালা লোকের টাকার ডাঁট সহ্য করতে পারে না—শঙ্কুও পারে না। খাঁটি বাঙালির বসুধৈব কুটুম্বকম্। সায়েব দেখলে সে মাথা হারায় না। শঙ্কু'-রও উত্তরস্বাধীনতা ভারতীয়ের বিশ্বনাগরিকত্ববোধ শ্রদ্ধাই। এ সবই আমরা বড়রা বিশেষভাবে উপভোগ করি। মাপের বাইরে চলে যেও না—প্রযুক্তিবিদ্যায় পারঙ্গম বিশ্বের প্রতি এটাই শঙ্কু'-র বাণী। ডিমিট্রিয়াসের গল্প, আশ্চর্য পুতুলের গল্প সেকথাই বলছে। তবে এসব সত্ত্বেও শঙ্কুর'-র গল্প বিশেষ করে কিশোরভোগ্য গল্প। সে সব গল্পের প্রথম দিকের দুটি তিনটি বাদ দিলে সব গল্পেরই ঘটনাস্থল সুদূর বিদেশ। ভ্রমণরসের সঙ্গে রহস্যরস মিশিয়ে তার সঙ্গে যথোপযুক্ত এ্যাডভেঞ্চার রস জুড়ে দিলে কী জিনিস দাঁড়ায় স্বদেশের পটে তার নিদর্শন ফেলুদা'-র কাহিনী, বিদেশের পটে তার নিদর্শন প্রোফেসর শঙ্কু। দুটোই দুই অর্থে আবিষ্কারের কাহিনী।

কিন্তু শঙ্কু'-র গল্প এ সব সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এমন গভীর প্রশ্ন নিয়ে আমাদের সম্মুখীন হয়েছে যা বয়স্ক মানুষের প্রশ্ন। *'কম্পু'* গল্পটির কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। ইলেকট্রনিক্স্ এর সম্ভাবিত শেষ কীর্তি সেই ক্ষুদ্রকায় গোলকটির নাম কম্পু। সে সব প্রশ্নের উত্তর জানে। জানতে জানতে সে মানবিক

জ্ঞানের সীমানা পেরিয়ে গেল, হয়ে উঠলো অন্তর্জামী, হয়ে উঠলো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। পরিশেষে সে তার প্রদত্ত দেহ ত্যাগের আগে সব থেকে চূড়ান্ত প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। *'কম্পু'* আমার মতে শঙ্কু সিরিজের শিখরী গল্প। কম্পু যেন প্রাচীন সর্বজ্ঞ ভারতীয় ঋষির কম্প্যুটর প্রতীক। সেই প্রাচীন ঋষির মতোই সে জানতে জানতে জেনেছে জানার শেষ নেই—কিন্তু সে থামে নি। ঋষির মতোই সেও নিজের জন্য কিছু চায় না। কিন্তু মানুষকে দিতে চায় তার জ্ঞানের ফল। জাপানকে সে বলে দিয়ে গেল প্রাকৃতিক পীড়ন থেকে রক্ষা পাবার কৌশল। তারপর প্রাচীন নচিকেতার মতো সব শেষে উচ্চারণ করেছে তার শেষ পরম প্রশ্নের নিজস্ব উত্তর পাবার সংবাদ। এ গল্প ঠিক বালকভোগ্য গল্প নয়—না হয়ে ভালই হয়েছে। এরকম দৃষ্টান্ত অবশ্য সংখ্যায় বেশি নয়। রায়চৌধুরী পরিবারের শিশু সহিত্যের মূল উৎসটি তিনি আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন *'প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্‌'* গল্পে। আমার কিন্তু গল্পটিতে *'হ-য-ব-র-ল'* বা *'আবোল-তাবোল'*-কে ছাপিয়ে মনে পড়ে ওয়েল্‌স-এর *'আইল্যান্ড অফ ডক্টর মোরো'*। মোরোর ট্র্যাজিক গবেষণার সঙ্গে প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্‌-এর বিচিত্র ভয়াবহ গবেষণার মিল আছে। গোপালপুর সীকোস্ট-এ নির্জন পরিবেশে 'ষষ্ঠীচরণ' কেমন একটা গা ছমছমে পরিবেশ সৃষ্টি করে। সে রসটার উত্তমর্ণ ওয়েল্‌স নন কিন্তু। সুকুমার রায়-কেও পাশ কাটিয়েছেন লেখক আশ্চর্য তৎপরতায়। অদ্ভুত রস ও হাস্যরসের মিশ্রণ থেকে তিনি সযত্নে হাস্যরসটি এখানে ছেঁকে বার করে দিয়েছেন। যা রইল তা অদ্ভুত ও ভয়ানকের মোক্ষম বিমিশ্র স্বাদ।

সত্যজিৎ রায়ে'-র অলৌকিক গল্পগুলির বেলাতেও বলতে পারি এগুলি পড়ে আমরা বড়রা যদিও সম্যক তৃপ্তি পাই, তথাপি এগুলি ছেলেদের জন্যই লেখা। কিন্তু একটু বড় ছেলেরা এর লক্ষ্য। লীলা মজুমদারে'-র হাত থেকে আমরা খুব চমৎকার ভূতের গল্প পেয়েছি। কিন্তু সে গল্পের লক্ষ্য অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেরা। রায় ও মজুমদার দুজনেরই ভূতের গল্পের প্রিয় পটভূমি পরিত্যক্ত নির্জন বাড়ি। লীলা মজুমদারে'-র ভূতেরা, তাদের উপভোক্তাদের কথা ভেবেই বোধ হয় খুব স্নেহময়, মজারও কখনো-কখনো। ভূতের গল্পের আরেক সার্থকস্রষ্টা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ে'-র ভূতেরা, লীলা মজুমদারে'-র গল্পের ভূতেদের ছানাপোনা। সত্যজিৎবাবু'-র গল্পের ভূতেরা কিন্তু আসল ভূত। এবং তাঁর ভূতের গল্পের বয়স্কভোগ্য সৌন্দর্য গল্পের স্ট্রাকচারে। সকলেই জানেন ভূতের গল্পের প্রধান মজা ভূতের আত্মপ্রকাশে। এ বিষয়ে সত্যজিৎ রায় বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। *'অনাথ বন্ধুর ভয়'*, এবং *'ব্রাউন সায়েবের বাড়ি'*, গল্প দুটির তাক্ লাগানো উপসংহার ভৌতিক হতভম্বতা সৃষ্টি করে। এটাই ভালো ভূতের গল্পের আর্ট। অলৌকিক রসের গল্প হলেও *'খগম্‌'* ভূতের গল্প নয়। ছোট ছেলেদের এ গল্প

পড়তে বাধা নেই, উপভোগ করতেও বাধা নেই—কিন্তু এ গল্পের অন্তর্গত তাৎপর্যের তীরটি বয়স্কদের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত। কোনো মানুষ তার সেন্স অফ গিল্‌ট্‌ বা অপরাধচেতনার হাত থেকে মুক্তি পায় না। এই বক্তব্যটি সত্যজিৎ রায়ে'-র একাধিক গল্পে দেখা দিয়েছে একাধিক রূপে। সে কথায় আমরা পরে আসছি। *'খগম্‌'* গল্পের ব্যাপারটি নাটকীয়। বালকিষণ-কে ধূর্জটীবাবু অহৈতুকী জিঘাংসায় মেরে ফেললেন, ফলে ক্রুদ্ধ ইমলিবাবার অভিশাপে ধূর্জটিবাবু সাপ হয়ে গেলেন—এই ভয়াবহ গল্পটির পিছনে রয়েছে একটি পুরাতন ভারতীয় থীম। থীমটি অভিশাপের থীমকে নিয়ে গঠিত। *'খগম্‌'* নামটি ধূর্জটিবাবুর মুখে উঠে এল অবচেতনের ধাক্কায়। তখন অপরাধবোধে অভিভূত বলেই ইমলিবাবার অভিসম্পাতী মূর্তির সঙ্গে ধূর্জটিবাবু মহাভারতের শাপোদ্যত মুনিকে ঘুলিয়ে ফেলেছে। বাকিটুকু বিকারের ফল। *'মিঃ শাসমলের শেষরাত্রি'* গল্পে শেক্‌সপীয়ারের *'রিচার্ড দি থার্ড'*-র এ্যাভেঞ্জিং ঘোস্টদের কথা মনে পড়বে। সেখানেও কৃতকর্মের অবচেতনসঞ্চিত পাপবোধ শেষ মুহূর্তে মাথা চাড়া দিয়েছে।

॥ ৪ ॥

সত্যজিৎ রায়ে'-র গল্পের দুটি চরিত্র একটু আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়—জটায়ু আর অবিনাশবাবু। দুজনেই সাধারণ মাপের বাঙালি। ঘটনাচক্রে দুজনেই জড়িয়ে পড়েছেন মেধায় মননে অসাধারণ করিৎকর্মা দুজন মানুষের সঙ্গে। এ সম্মেলন হাস্যরসের যথেষ্ট কারণ হতে বাধ্য—হয়েওছে তাই। দুজনের মধ্যে আছে দূরপনেয় বাঙালিয়ানা—সে বাঙালি একটু একটু সাহেব হতে পারলে সুখী হয়—কিন্তু তার বাঙালিস্বভাব শেষ পর্যন্ত দুর্মর। কৃতি প্রতিবেশীকে পরিহাস করতে পারা পড়শী বাঙালির একধরণের মৌতাত। অবিনাশবাবু প্রথমটা ছিলেন সেই মানুষ। প্রতিবেশীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব তার কাছে উপহাসের সামগ্রী। তিনি সে প্রতিবেশীর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাফল্যের চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন নিজের মূলোর ক্ষেতের নিরাপত্তার জন্য। তার জন্য খেসারত দাবি করতে ও তাগাদা দিতেও তার বাধেনি। আবার সেই শঙ্কু'-র সঙ্গে পরে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেও তার কোনো চক্ষুলজ্জা হয়নি। এই বেরিয়ে পড়ার ঘটনা থেকেই বোঝা গেল অবিনাশবাবুর চরিত্রে আরেকটা মাত্রা আছে—বাঙালির ভ্রমণপিপাসা। এতেই চরিত্রটি মুক্তি পেল তার ভাঁড়ামি থেকে। কিন্তু অবিনাশবাবু'-র ভ্রমণপিপাশা অজানা জায়গা চোখে দেখার অহমিকা তৃপ্তি মাত্র। তার কৌতূহলের কোনো ইতিহাসও নেই, ভবিষ্যৎও নেই। সহযাত্রীদের বিষয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই।

তিব্বতযাত্রার সাহেব সঙ্গীদের জন্য তিনি মাত্র তিনটি ইংরেজি বাক্য স্থির করে রেখেছিলেন। সকালে গুড মর্নিং, সন্ধ্যায় গুড ইভিনিং এবং সাহেবদের কেউ যদি খাদে গড়িয়ে পড়ে যায়, তাহলে গুড বাই। তিনি ভীতু নন ঠিক কথা, কিন্তু তাঁর সাহসের কোনো পরীক্ষাও হয় নি। উনিশ শতকীয় বাংলায় গদ্য লেখেন, মানুষটিও সে হিসাবে খাঁটি মফস্বল ব্রান্ড। ভিড়ে পড়তে পারবার আশ্চর্য ক্ষমতায় তিনি সিদ্ধ। কৈলাস শৃঙ্গ দেখে সায়েবদেরও তিনি গড় করিয়ে ছেড়েছিলেন—খাঁটি বাঙালি লজিক প্রয়োগে—*'সেক্রেড্, সেক্রেড্, মোর সেক্রেড্ দ্যান কাউ।'* তা বলে তিনি ইংরেজি জানেন না এমন নয়। ঠিক ঠিক জায়গায় তিনি মোক্ষমভাবে মিলটনের কাব্য স্মরণ করতে পারেন। নকুড়বাবু সে জায়গায় একান্ত সাদামাটা বর্ণহীন মানুষ। বিনীত ভঙ্গিতে মাটি চেটে ফেলেন যেন এমন ভাষায় চিঠি লেখেন। কিন্তু তাঁর একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। অতীত দর্শন, ভবিষ্যৎ দর্শন ইত্যাদি অনেক গুণ আছে এঁর। এমন কি মনগড়া ঘটনাও ইনি অনেক সময় চোখের সামনে দেখতে পান, মনের জোরে অন্য লোককে দেখিয়ে দিতে পারেন। *'নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো'* গল্পে নকুড়বাবু'-র প্রতিষ্ঠা। কিন্তু নকুড়বাবু'-র সম্যক শক্তির আশ্চর্য কাহিনীগত প্রয়োগ ঘটেছে *'প্রোফেসর শঙ্কু', 'ও ইউ. এফ. ও'* গল্পে। তাজমহলকে কারবোনির ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে নকুড়বাবু'-র অলৌকিক শক্তির অদ্ভুত প্রয়োগ বিশ্বাস্য হ'ত না যদি না আমরা আগের গল্পটি পড়ে রাখতাম।

জটায়ু সে তুলনায় একান্তই নাগরিক মানুষ। কলকেতে বাঙালিয়ানায় তার আদ্যন্ত চিহ্নিত। সে যখন 'মিস্টার মিত্তির' বলে ফেলুদা-কে ডাকে তখন ইংরেজি কেতার *'মিস্টার'* আর বাগবাজারী *'মিত্তির'* শব্দের পাশাপাশি অবস্থান বুঝিয়ে দেয় লোকটি মোটেই ইংরেজি কেতার ধার ধারে না। ইংরেজি ভাষার প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে, দখল তেমন নেই। অম্লানবদনে উল্টোপাল্টা ইংরেজি বলে, যেমন ইনকঙ্গিটো (ইনকগ্‌নিটো)। খুব প্রথম শ্রেণীর কোনো এ্যাম্‌বিশন তার নেই। রোমহর্ষক নামের, *'ভ্যাঙ্কুভারে ভ্যাম্পায়ার'* জাতীয় বই লিখে তাতে অনেক ভুলভাল থাকে—দুমাসে তিন হাজার কপি বাজারে চালাতে পারলেই সে সুখী। ফিল্‌মে বই চললে আরো সুখী। গাড়ি কিনেছে। *'সোনার কেল্লা'* থেকে সে ফেলুদা'-র সঙ্গী হয়েছে। কিন্তু এমন একটা কিছু তার মধ্যে আছে যে তারপর থেকে জটায়ু—ফেলু মিত্তির—তোপ্‌সে রূপান্তরিত হয়েছে অচ্ছেদ্য ত্রয়ীতে। যা ছিল বুদ্ধিগ্রাহ্য তাদন্তিক গল্প বা ডিটেকশন স্টোরি, জটায়ু যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে উঠল সকৌতুক ও এন্টারটেনিং। কিন্তু কমিক রিলিফের সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়নি। প্রত্যক্ষ ঘোষিত না হলেও জটায়ুর একটা জীবনদর্শন আছে। সে রহস্যকাহিনী লেখে। ফেলু মিত্তির তাকে রহস্যঘটনার

সঙ্গে সরাসরি জড়িত হবার সুযোগ দিচ্ছে। *'সোনার কেল্লা'* ফিল্‌মে সে যখন জিজ্ঞাসা করে, *'আমরা কি এমন ডেকয়েটদের পিছু পিছু ছুটছি'* তখন তার বুক টিপ-টিপ উত্তেজনায় আগ্রহ উদ্বেগে মিশ্রিত মুখচ্ছবিটি সন্তোষ দত্ত খুব চমৎকার ধরে দেন। এই হচ্ছে আসল লোকটা। *'ফ্যাক্‌ট্‌ ইজ্‌ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্‌শন্‌'*, একথা জেনেই বোধ হয় জটায়ু ফিক্‌শনের ফক্‌কা জগৎ ছেড়ে ফ্যাক্‌টস্‌-এর জগতে ঢুকে পড়েছে। রহস্যকাহিনীর লেখক রহস্য ঘটনার মধ্যে ঢুকে পড়ল এমন একটি চরিত্র অবশ্য এর আগে আমরা ফেলুদা কাহিনীতে পড়েছি---তিনি *'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'* গল্পের তিনকড়ি বাবু। কিন্তু তিনকড়িবাবু সত্যি তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি। তাকে দিয়ে জটায়ু'-র উদ্দেশ্য মিটত না। আশ্চর্য নয় জটায়ু বিপুল জনপ্রিয় হবে। সংখ্যায় বেশি লোক জটায়ু'-র মতো লেখকের লেখা পড়তে ভালবাসে—জটায়ু নিজেও জানে সে বড় মাপের মানুষ নয়। তা নিয়ে তার মাথা ব্যথাও নেই। কিন্তু সে ভ্রমেভ্রান্তিতে আগ্রহে কৌতূহলে ভয়ে ভরসায় খুব জ্যান্ত মানুষ। পাঠিকারা তার খুব অনুরাগী। রুণু তাই ফেলুদা'-কে দেখে প্রথমেই জটায়ু'-র খবর নিয়েছে। জটায়ু'-র ভীতু ভাবটাকে পাঠিকারা খুবই উপভোগ করে। ভয়ের মুহূর্তে যে কোনো ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে মহাপ্রাণের নিশ্বাস মিশে যাওয়া—'চ' বলতে 'ছ' অথবা 'কে' বলতে গিয়ে 'খে' বলে ফেলা আমাদের মনে পড়ে। উত্তেজনাপ্রবণ ভদ্রলোকটি উত্তেজনার মাথায় যেভাবে ইংরেজি

গুলিয়ে ফেলেন সেটাও কম উপভোগ্য নয়, যেমন—*'দি সার্কাস হুইচ এসকেপড্ ফ্রম দি গ্রেট ম্যাজেস্টিক টাইগার'*—ভদ্রলোক লক্ষ্য করেননি সেন্সটাই প্রায় এস্‌প্‌কেপ করেছে। ফেলুদা ও তোপ্‌সে কম্‌বিনেশনে কোনো হাস্যরসের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু দ্রষ্টা ও ন্যারেটর তোপ্‌সে'-র চোখে বাগ্‌যত ও র‍্যাশনাল ফেলুদা এবং বাকলুব্ধ ও উত্তেজনাপ্রবণ জটায়ু একসঙ্গে হলে যে চমৎকার অসঙ্গতি সৃষ্টি করে তা উপভোগ্য হাস্যরসের উৎস। *'ছিন্নমস্তার'* কাহিনীতে জটায়ু যখন ফস্‌কে যাওয়া বুদ্ধির পৌনঃপৌনিক 'ছ্যা' 'ছ্যা'-এর স্রোতে গল্প প্রায় থামিয়ে ফেলার যোগাড় করছিলেন, তখন ফেলু মিত্তিরে'-র গণ্ডীর সংযত ধমকে জটায়ু-কে পরে 'ছ্যা' 'ছ্যা' করার নির্দেশ, জটায়ু-কে থামিয়ে দিয়ে আমাদের হাসিয়ে দেয়।

॥ ৫ ॥

কিন্তু যেসব গল্পে বয়স্কপাঠ্য ও কিশোরপাঠ্যের বিভাজন রেখা ভাবা হয়নি, পাঠকও ভাবেন না, সে সব গল্পেই সত্যজিৎ রায়ে'-র শক্তি একটা অন্য মাত্রায় ফুটে ওঠে। একটু ইতস্তত করেই বলে ফেলছি—সে সব গল্পেই তাঁর নিজস্ব স্বভাবের যথার্থ পরিচয়। সে স্বভাবের সংক্ষিপ্ত নাম শিল্পীস্বভাব। নানা ভাবে এর প্রকাশ ঘটেছে—নানাস্তরে। শিল্পীর কৌতূহল নিয়ে, শিল্পীর শ্রদ্ধা নিয়ে, বিনয় নিয়ে, এবং বিনয় মিশ্রিত প্রত্যয় নিয়ে তিনি জীবনের মুখোমুখি হতে চেয়েছেন। বিশ্বাস করেছেন সব ক্ষতিপূরণ ওখানে। *'টেরোড্যাকটিলের ডিম'* গল্পটি উল্লেখ করছি। বদনবাবু ছাপোষা কেরাণী। পঙ্গু ছেলে বিলটুর জন্য তাকে গল্পের যোগান দিতে হয়। তাই মনে মনে তিনি গল্প ফাঁদেন—বিলটুকে শোনাবেন বলে। টেরোড্যাকটিলের ডিম দারিদ্রের গল্প নয়, তথাকথিত বাস্তবতা এর উপাদান নয়। পঙ্গু ছেলের জন্য দুঃখী পিতার গল্পও এ নয়। এ এক এমন মানুষের গল্প যে অক্লেশে মাস মাইনের একটা ভারী অংশ পকেটমারকে ধরে দিয়ে আসে এই আনন্দে যে, ছেলের জন্য একটা মোক্ষম গল্প সংগ্রহ করা গেছে। এখানে আসল শিল্পী ওই পকেটমারটি। যে প্রায় ম্যাজিক দেখিয়েছে হাতসাফাই করে—আর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিসিয়ানের উপযুক্ত হতভম্ব করে দেওয়া প্যাটার করে। এই প্যাটারটাই শিল্প। বদনবাবু শিল্পপ্রাণ বলেই টাকা খোয়ানোর দুঃখের চেয়ে বড়ো করে ধরেছেন ওই প্যাটারের বিস্ময়করত্ব। দরিদ্র সংসারের রুগ্ন পিতার দুঃখ ধান্ধাকে এ গল্পে মিথ্যা বলা হয়নি। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো সত্য বলা হয়েছে বদনবাবু'-র আনন্দ পাবার ক্ষমতাকে।

অন্যদিক থেকে একই কারণে বলতে পারি *'অতিথি'* গল্পটির কথা। যে পরিবারটির পটভূমিকা গল্পটিতে ব্যবহার করা হয়েছে সে পরিবার আর্থিক দারিদ্রে ম্লান নয়। কিন্তু সে পরিবারের একটা অন্য দারিদ্র রয়েছে। সেটা তাদের মনের দারিদ্র। তারা তাদের সংকীর্ণ সিদ্ধির চার দেওয়ালের মধ্যে ছক বাঁধা অস্তিত্বকে আঁকড়ে থাকে। যা তাদের প্রত্যহ ব্যবহৃত সংজ্ঞার বাইরে তাকে তারা বিশ্বাস করতে নারাজ। এরই মাঝখানে এসে হাজির হয়েছিলেন মন্টুর দাদু—বিচিত্র বিশ্বের ডাকমোহর বুকে নিয়ে। স্বভাবতই তাঁকে এ বাড়ির মধ্যে যে বুঝে নিতে চেয়েছে সে মন্টু। দাদুও মন্টুদের সঙ্গেই গল্প করতেন—সাহারার তুয়ারেগদের গল্প, জাহাজে দুঃসাহসিক যাত্রার গল্প। টাকা পয়সায় মাপা সাংসারিক সাফল্যের দ্বারা স্পৃষ্ট নয় যে সব বয়সোত্তর মানুষ—তা সে শিশু হোক কিশোর হোক অথবা প্রৌঢ় হোক সত্যজিৎ বাবু'-র গল্পের লক্ষ্য তারা। দাদুও তার মানসিকতার উত্তরাধিকারী করে গেছেন মন্টুকে—সে সেই বয়সোত্তর মানবগোষ্ঠীর সদস্য বলে। যে মন পাকা, সে মন শ্রী রায় অথবা ঐ দাদু কারো লক্ষ্য নয়। এটাও শ্রী রায়ে'-র জীবন সমালোচনারই একটা অঙ্গ।

এ জীবন সমালোচনাকেই আরেকটু অন্য মাত্রায় দেখতে পাই আমরা *'অসমঞ্জবাবুর কুকুর'* গল্পে। বিজ্ঞান কাহিনী লেখক ওলাফ স্টোপলডনে'-র একটা উপন্যাসে একটা কুকুর ছিল, বৈজ্ঞানিক তার সারমেয় শরীরে মানবীয় মস্তিষ্ক সৃষ্টি করেছিলেন। অসমঞ্জবাবুর কুকুর সে জাতীয় নয়। অসমঞ্জবাবু সত্যজিৎ বাবু'-র অনেক গল্পের মতোই একলা মানুষ। পটলবাবু বা বঙ্কুবাবু'-র মতো সংসারের বাজার দরে তিনিও আদপেই পয়লা মার্কার মানুষ নন। শাখা ডাকঘরে কেরাণি, দেড়খানা ঘরের ভাড়াটিয়া। মাসে দুটো হিন্দি ছবি, একটা বাংলা যাত্রা বা থিয়েটার, হপ্তায় দুদিন মাছ, আর চার প্যাকেট উইল্‌স্‌ সিগারেট হলেই তাঁর চলে যায়। একা মানুষ, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন বিশেষ নেই। এ হেন ব্যক্তি একটি কুকুর যোগাড় করলেন। নাম ব্রাউনী। তাজ্জব ব্যাপার এই যে, কুকুরটি হাসে—ঠিক জায়গায় হাসে, হাস্যরসের সূত্র অনুযায়ী বুঝে-সুঝে হাসে। এ গল্পের চূড়ান্ত সীমায় আছে ব্রাউনী-কে কিনে ফেলতে ইচ্ছুক এক মার্কিন সাহেবের ব্যাপার-স্যাপার দেখে ব্রাউনীর নতুন হাসি। *'সাহেব ভাবছেন টাকা দিলে দুনিয়ার সব কিছু কেনা যায়, তাই শুনে কুকুর হাসছে'*—সাহেব সোনার পার্কার কলম পুনরায় পকেটবন্দী করে ফিরে যাবার সময় অসমঞ্জবাবু'-র বিষয়ে বলে গেলেন—*হিঁ মাস্ট বি ক্রেঁজি।* টাকা দিয়ে মানুষের ভালবাসার সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়া যায় এ কথা যে ভাবে সে সবচেয়ে হাস্যকর—আর বিত্তহীন সাধারণ মানুষের ভেতর থেকে একটা অসাধারণ মানুষ বেরিয়ে আসে উপলব্ধির ঘনিষ্ট মুহূর্তে। তখন এক মুহূর্তে নাটকটা পাল্টে যায়। ঝকঝকে চকচকে শ্যামল নন্দী

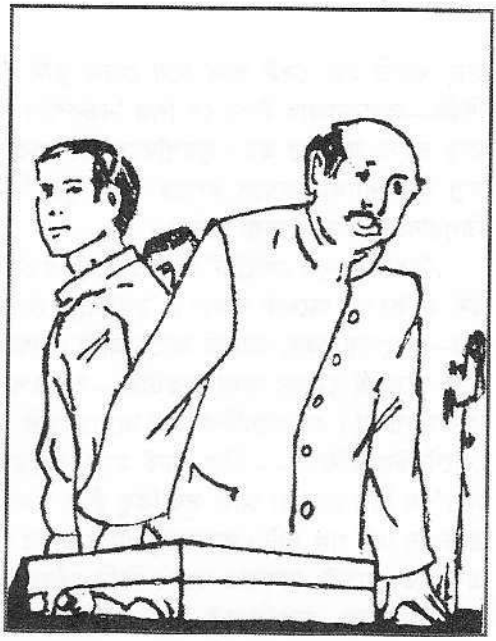

সাহেবের ধাতানির ভয়ে অসমঞ্জবাবু'-র ওপর কঠিন হতে চায়। কিন্তু অসমঞ্জবাবু ব্রাউনী'-র হাসির আলোয় সহসা উপেক্ষা করে বসেন ঐ অতলান্তিক পারের ধনকুবেরকে আর কমিশন ভিক্ষু বাঙালি নন্দীকে। এমনি করেই একদা *'কাঞ্চনজঙ্ঘা'* ছবির বেকার যুবকটি মনের অপ্রেমেয় মানসিক বিস্তারের মুহূর্তে প্রত্যাখ্যান করে বসেছিল উমেদার ভূমিকা। এক হিশাবে সত্যজিৎ বাবু'-র এই গোত্রের সব গল্পই ব্যক্তির আত্মাবিষ্কারের গল্প। তুলে নিতে পারি *'দুই ম্যাজিশিয়ান'* গল্পটি। ম্যাজিক স্টোরিতে লীলা মজুমদার-ও সিদ্ধহস্ত। তাঁর সুবিখ্যাত *'ভানুমতির খেল'* গল্পটি ম্যাজিকের অপার অবাককাণ্ডের গল্পই বটে, যদিও শেষ পর্যন্ত গল্পটি ড্রিম স্টোরি। সত্যজিৎবাবু'-র গল্পেও একটা স্বপ্ন আছে। কিন্তু তার তাৎপর্য আলাদা। সেই স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ঘটেছে সুরপতিবাবু'-র আত্মোপলব্ধি। এ গল্পের মূল উপাদানটি রয়েছে সত্যজিৎ বাবু'-র শৈশব স্মৃতিতে। *'যখন ছোট ছিলাম'* বইটিতে শেফালো সাহেবের স্টেজের কারসাজি বনাম বিয়ে বাড়িতে দেখা এক বাঙালি ভদ্রলোকের টাকা আংটির ম্যাজিকের স্মৃতি পরিণত চেতনায় *'দুই ম্যাজিশিয়ান'* গল্পে রূপ ধরেছে। এবং বীজ-বক্তব্যটিও এক—জেনে নিতে হবে কোন্‌টি প্রকৃত শিল্প, খাঁটি ভারতীয় স্বভাব-যুক্ত। সুরপতি-কে ত্রিপুরাবাবু বলেছিলেন, *'একজন বিদেশী বুজরুকের বাইরের জাঁকজমক তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিল। আসল পথ ছেড়ে যে পথে চট করে অর্থ*

হয়, খ্যাতি হয়, সেই পথে চলে গেলে তুমি।' এখানেই বোঝা যায় ত্রিপুরাবাবু শিল্পী—কলকব্জার উপর সে শিল্প নির্ভরশীল নয়। সাধনায়, নিষ্ঠায়, একাগ্রতায় তার রহস্য করায়ত্ত হয়। সুরপতিকে ত্রিপুরাবাবু সেটাই বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। স্বপ্ন ধরে ব্যাখ্যা করলে বলতে পারি সুরপতি'-র অবচেতনে যা ছিল সেটাই ত্রিপুরাবাবু'-র মুখে ব্যক্ত হয়েছে।

'সহদেববাবুর পোর্ট্রেট' ও *'রতনবাবু ও সেই লোকটি'*, এই গল্প দুটির মধ্যে রস ও রূপের অনেক তফাৎ। *'রতনবাবু ও সেই লোকটি'* এক কথায় দারুণ গল্প—বাংলায় কেন, আমার জ্ঞানে আমি কোথাও এরকম গল্প পড়িনি। কিন্তু এই দুটি গল্পেরই মোদ্দা কথা একটাই—অনুরূপা কোনো দিক থেকেই মঙ্গলের কারণ হয় না। এর প্রাথমিক বীজ রয়েছে বুঝি *'প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু'* গল্পে—বোর্গেল্টের উক্তিতে—*'ঠিক ওরই মতো আরেকজন কেউ থাকে সেটা ও চাইল না।'* যে বিশ্ব সভ্যতা আজ সব কিছু ছাঁচে ঢালাই করার জন্য ব্যস্ত তার শিল্পময় প্রতিবাদ এই গল্প দুটি। রতনবাবু এমন মানুষ যার সঙ্গে কারো মেলে না। তিনি একা তো বটেই, অনন্যও বটে। তিনি খোঁজেনও অনন্যকেই—যা সবাই দেখে না, খোঁজে না, সেগুলিকেই তিনি খোঁজেন। কিন্তু সিনিতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন তার এক হুবহু ডুপ্লিকেট। এখানেই রতনবাবু'-র মতো মানুষ বড় ধাক্কা খেলেন। এই একটা জায়গা যেখানে সব উত্তরই তার জানা—কেননা তিনি নিজেই সেই উত্তরগুলো। রতনবাবু সেই অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি চাইলেন অনুরূপকে ধ্বংস করে। কিন্তু অনুরূপ তো পারস্পরিক—কে রূপ আর কে আনুরূপা দুটো জীবনে স্থির হল না বলেই একটা মৃত্যুতেও তা স্থির হল না। সহদেববাবু নিজে থেকেই অঙ্কিত প্রতিকৃতির অনুরূপা হতে চেয়েছিলেন। সে আনুরূপা সাধনার ফলে তাঁর অর্জিত সৌভাগ্যের ভাঁটা সরতে শুরু করল। অবশ্য সহদেববাবু'-র এই দুর্দশা তার একটা কৃতকর্মের শাস্তিও বটে। পোর্ট্রেট ফেরত দিয়ে আবার রিয়্যালের জগতে ফিরে এলেন।

সত্যজিৎবাবু'-র গল্পের একটা বৈশিষ্ট্য হল—জীবনচর্চায় কতকগুলি প্রাথমিক নর্মকে স্বীকৃতি দান। একটা নর্ম্ হল ছোটবেলার বন্ধুকে আঘাত করতে হয় না। হলে কি হয় তার প্রমাণ *'বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম'*। শৈশবের বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া আঘাতের স্মৃতি মোছে না । তার প্রমাণ *'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'* এবং *'চিলেকোঠা গল্প'*। এই জগতের আর একটি নর্ম্ হল তুমি কৃতী হলেও তোমার কৃতিত্বের সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত কৃতজ্ঞতা ও বিনয়—*'ভূতো'*, এবং *দুই ম্যাজিশিয়ান'*, গল্প তার প্রমাণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বের চলচ্চিত্রকার সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রধানত স্নেহরসের বশ। তাঁর গল্পে আমরা পাই ক্লাসফ্রেন্ডের প্রতি সকল অবিশ্বাস, সংশয় এবং তজ্জনিত গ্লানির অবসান ঘটে জয়ের ছেলে সঞ্জয়ের

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বদনবাবু'-র জীবনের টান তাঁর ছেলে বিলটুর জন্য। পিন্টুর জগৎ, মন্টুর জগৎ, সদানন্দের জগৎ অনেক বেশি বিশ্বাস্য—একথা তিনি আমাদের শোনান—আমরা যারা নানা খর্বতায় আর সংকীর্ণতায় পীড়িত। ফটিকচাঁদের হারুণও স্নেহমিশ্র সখ্যের বশ। এমন মানুষই যথার্থ শিল্পী। সে শিল্প জীবনের বিশাল গাছে লতা। হারুণ বাবলু-কে তার ফটিকচাঁদ পর্বে এ কথাই শেখাল জীবনকে ভালবাসলে তবে শিল্পী হওয়া যায়। আর জীবনকে যে ভালবাসে, সে মুক্ত। সব কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত। এই মুক্তির চেহারাটা বাবলু এর আগে দেখেনি। হারুণ ফটিকচাঁদ-কে বাবলু'-র জীবনে অবিস্মরণীয় করে দিল—বাবলু জানল কাকে বলে অকৃত্রিমতার প্রতিবাদ। হারুণে'র মতো সেও আমাদের শেখায় মনের দিক থেকে বড় মাপের মানুষ হতে। আর্টিষ্ট কি শুধু একরকম হয়...বলের খেলা, রঙের খেলা, কথার খেলা, সুরের খেলা—এক এক খেলা এক এক স্টাইলে খেলতে হয়। আর শেখাল আর্টিষ্টের নিয়মগুলো একটু আলাদা। ফটিকচাঁদ জানল কাকে বলে জীবনের সত্য মুক্তাঙ্গন। একটা কথা তাকে হারুণ বলে গেল জীবনের কোনো অবস্থার জন্যই খেদ থাকে না তার—যে শিল্পকে ভালবাসে।

সব শেষে আলাদা করে বলতে হয় সত্যজিৎ রায়ে'-র গদ্যশৈলী। এ সবটাই তাঁর নিজস্ব। এ গদ্যে কোথাও ফেনা নেই। পাতাবাহার নেই। নিষ্পত্র অথচ ফলবতী লতার মতো মনোজ্ঞ সে গদ্য। তোপ্‌সে'-র ভাষা আর শঙ্কু'-র ভাষার মধ্যে পার্থক্য এখানে উল্লেখ করি। তোপ্‌সে'-র গদ্যে একটা অন্তরঙ্গ সরল কৌতুক আছে—একটা উঁচু ক্লাশের স্কুলের ছেলের স্কুল-ল্যাঙ্গুয়েজ সে স্বভাবতঃ নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করে। ইংরেজি উচ্চারণের বিশুদ্ধতা নিয়ে তার একটু অহঙ্কারও আছে। কেউ ভুল করলে তা নিয়ে 'ফান' করতেও তার ভাল লাগে। পক্ষান্তরে শঙ্কু স্বভাবগম্ভীর। তার গদ্যও তাই। হিউমার সেখানে যথাসম্ভব স্বল্প। অপরের অজ্ঞতায় সে হাসে না, বিরক্ত হয় না—বোধ হয় নির্বোধের প্রতি অনুকম্পা পোষণ করে। লক্ষ্য করি যে, শঙ্কু'-র ভাষার ডায়েরি-রেজিস্টার যেমন সংক্ষেপে সংহত হতে জানে, তোপ্‌সে'-র ভাষার কিশোর স্মার্টনেশ তেমনি ডাইনামিক। তোপ্‌সে'-র বা ফটিকচাঁদ উপন্যাসের বাবলু'-র ভাষার প্রধান গুন তা বিশ্লেষণকে বিশেষ প্রশ্রয় দেয় না। দেখাকে শুনিয়ে দেওয়া খুব শক্ত কাজ। এ ভাষার সে ক্ষমতা আছে। এই ভাষার প্রধান লক্ষণ সম্বন্ধে ফেলুদা তোপ্‌সে-কে যা বলেছিলেন তা এই—*'গদাগুচ্ছের মর্চে ধরা বিশেষণ আর তথাকথিত লেখাপড়া করা শব্দ ব্যবহার না করে চোখে যা দেখলি সেইটি ঠিক ঠিক সোজাসুজি বলে গেলে কাজ দেবে ঢের বেশি।'* তার মানে কিন্তু এ নয় যে এ ভাষায় কবিতা নেই। *'ছোট বড় মেজ সেজো নানান সাইজের সাদা কালো*

খয়েরি পাটকিলে ছিটদার সব পাথর ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে, যুগ যুগ ধরে সেগুলোকে মোলায়েম করে পালিশ করে ব্যস্তবাগীশ ভেড়া নদী তড়িঘড়ি ছুটে চলেছে দামোদরে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। এই ঝাঁপের জায়গাই হল রাজরাপ্পা।' নদীর ছুট আর ঝাঁপ *'ছিন্নমস্তার অভিশাপে'*-র এই গদ্যে যেন সটান ছায়া ফেলেছে। আসলে একজন আর্টিষ্ট যিনি বস্তুকে রঙ সমেত চাক্ষুষ করে দিতে চান—এ গদ্য তাঁর গদ্য। সংযম, যথাযথতা একটা নিখুঁত শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে এখানে। স্ফটিক স্বচ্ছতার সঙ্গে তা তুলনীয়। অথচ দরকারে রঙ ধরাতেও এ জানে।

সব শেষে সত্যজিৎ রায় 'বাছাই বারো' বাংলাদেশে প্রকাশের ছাড়পত্র দেয়াতে আমি প্রকাশকের সাথে পুলকিত ॥

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রখ্যাত লেখক ও সাহিত্য সমালোচক
'মহানগর' পত্রিকা

কোলকাতা : ১৯৮৫

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

ফে লু দা র গো য়ে ন্দা গি রি

রাজেনবাবুকে রোজ বিকেলে ম্যাল্-এ আসতে দেখি। মাথার চুল সব পাকা, গায়ের রং ফরসা, মুখের ভাব হাসিখুশি। পুরোনো নেপালী আর তিব্বতী জিনিস-টিনিসের যে দোকানটা আছে, সেটায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাইরে এসে বেঞ্চিতে আধঘণ্টার মত বসে সন্ধে হব-হব হলে জলাপাহাড়ে বাড়ি ফিরে যান। আমি আবার একদিন ওঁর পেছন পেছন গিয়ে ওঁর বাড়িটাও দেখে এসেছি। গেটের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি, হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে হে তুমি, পেছু নিয়েছ ?' আমি বললাম, 'আমার নাম তপেশরঞ্জন বোস।' 'তবে এই নাও লজেঞ্চুস' বলে পকেট থেকে সত্যিই একটা লেমনড্রপ বার করে আমায় দিলেন, আর বললেন, 'একদিন সকাল সকাল এসো আমার বাড়িতে— অনেক মুখোশ আছে; দেখাবো।'

সেই রাজেনবাবুর যে এমন বিপদ ঘটতে পারে তা কেউ বিশ্বাস করবে ? ফেলুদাকে কথাটা বলতেই সে খ্যাক করে উঠল।

'পাকামো করিসনে। কার কী করে বিপদ ঘটবে না-ঘটবে সেটা কি মানুষকে দেখলে বোঝা যায় ?'

আমি দস্তুরমত রেগে গেলাম।

'বারে, রাজেনবাবু যে ভালো লোক সেটা বুঝি দেখলে বোঝা যায় না ? তুমি তো তাকে দেখোইনি। দার্জিলিং-এ এসে অবধি তো তুমি বাড়ি থেকে বেরোওইনি। রাজেনবাবু নেপালী বস্তিতে গিয়ে গরীবদের কত সেবা করেছে জান ?'

'আচ্ছা বেশ বেশ, এখন বিপদটা কী তাই শুনি। আর তুই কচি খোকা, সে বিপদের কথা তুই জানলি কী করে ?'

কচি খোকা অবিশ্যি আমি মোটেই না, কারণ আমার বয়স সাড়ে তেরো বছর। ফেলুদার বয়স আমার ঠিক ডবল।

সত্যি বলতে কি—ব্যাপারটা আমার জানার কথা নয়। ম্যাল্-এ বেঞ্চিতে বসেছিলাম—আজ রবিবার, ব্যান্ড বাজাবে, তাই শুনব বলে। আমার পাশে বসেছিলেন তিনকড়িবাবু, যিনি রাজেনবাবুর বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে দার্জিলিং-এ গরমের ছুটি কাটাতে এসেছেন। তিনকড়িবাবু আনন্দবাজার পড়ছিলেন, আর আমি কোনরকমে উঁকিঝুঁকি মেরে ফুটবলের খবরটা দেখার চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্যাকাশে মুখ করে রাজেনবাবু এসে ধপ্ করে তিনকড়িবাবুর পাশে বসে গায়ের চাদরটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন।

তিনকড়িবাবু কাগজ বন্ধ করে বললেন, 'কী হলে চড়াই উঠে এলেন নাকি ?'

রাজেনবাবু গলা নামিয়ে বললেন, 'আরে না মশাই। এক ইন্‌ক্রেডিব্‌ল ব্যাপার।'

ইন্‌ক্রেডিব্‌ল কথাটা আমার জানা ছিল। ফেলুদা ওটা প্রায়ই ব্যবহার করে। ওর মানে 'অবিশ্বাস্য'।

তিনকড়িবাবু বললেন, 'কী ব্যাপার ?'

'এই দেখুন না।'

রাজেনবাবু পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা নীল রং কাগজ বার করে তিনকড়িবাবুর হাতে দিলেন। বুঝতে পারলাম সেটা একটা চিঠি।

আমি অবিশ্যি চিঠিটা পড়িনি, বা পড়ার চেষ্টাও করিনি; বরঞ্চ আমি উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে গুণগুণ করে গান গেয়ে এমন ভাব দেখাচ্ছিলাম যেন বুড়োদের ব্যাপারে আমার কোন ইন্টারেস্টই নেই। কিন্তু চিঠিটা না পড়লেও, তিনকড়িবাবুর কথা আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

'সত্যিই ইন্‌ক্রেডিব্‌ল। আপনার ওপর কার এমন আক্রোশ থাকতে পারে যে আপনাকে এভাবে শাসিয়ে চিঠি লিখবে ?'

রাজেনবাবু বললেন, 'তাইতো ভাবছি। সত্যি বলতে কি, কোনদিন কারুর অনিষ্ট করেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

তিনকড়িবাবু এবার রাজেনবাবুর দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, 'হাটের মাঝখানে এসব ডিসকাস না করাই ভালো। বাড়ি চলুন।'

দুই বুড়ো উঠে পড়লেন।

ফেলুদা ঘটনাটা শুনে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে গুম্ হয়ে রইল। তারপর বলল, 'তুই তাহলে বলছিস যে একবার তলিয়ে দেখা চলতে পারে ?'

'বা রে—তুমিই তো রহস্যজনক ঘটনা খুঁজছিলে। বললে অনেক ডিটেক্‌টিভ বই পড়ে তোমারও ডিটেক্‌টিভ বুদ্ধিটা খুব ধারালো হয়ে উঠেছে।'

'তা তো বটেই। এই ধর—আমি তো আজ ম্যাল্‌ে যাইনি, তবু বলে দিতে পারি তুই কোনদিকের বেঞ্চে বসেছিলি।'

'কোন দিক ?'

'রাধা রেস্টুরান্টের ডান পাশের বেঞ্চগুলোর একটাতে ?'

'আরেব্বাস! কী করে বুঝলে ?'

'আজ বিকেলে রোদ ছিল। তোর বাঁ গালটা রোদে ঝল্‌সেছে, ডানটা ঝলসায়নি। একমাত্র ওই বেঞ্চিগুলোর একটাতে বসলেই পশ্চিমের রোদটা বাঁ গালে পড়ে।'

'ইন্‌ক্রেডিবল!'

'যাক্‌গে। এখন কথা হচ্ছে—রাজেন মজুমদারের বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার।'

* * * * *

'আর সাতাত্তর পা।'

'আর যদি না হয় ?'

'হবেই, ফেলুদা। আমি সেবার গুনেছিলাম।'

'না হলে গাঁট্টা তো ?'

'হ্যাঁ—কিন্তু বেশি জোরে না। জোরে মারলে মাথার ঘিলু এদিক ওদিক হয়ে যায়।'

কী আশ্চর্য—সাতাত্তরে রাজেনবাবুর বাড়ি পৌঁছলাম না। আরো তেইশ পা গিয়ে তবে ওর বাড়ির গেটের সামনে পড়লাম।

ফেলুদা ছোট্ট করে একটা গাঁট্টা মেরে বলল, 'আগের বার ফেরার সময় গুনেছিলি, না আসার সময় ?'

'ফেরার সময়।'

'ইডিয়েট! ফেরার সময় তো ঢালু নামতে হয়। তুই নিশ্চয় ধাঁই ধাঁই করে ইয়া বড়া স্টেপস্ ফেলেছিলি!'

'তা হবে।'

'নিশ্চয়ই তাই। আর তাই স্টেপস্ সেবার কম হয়েছিল, এবার বেশি হয়েছে। জোয়ান বয়সে ঢালু নামতে মানুষ বড় বড় পা ফেলে দৌড়নর মত। আর বুড়ো হলে ঢালুর বেলা ব্রেক ক'ষে ক'ষে ছোট ছোট পা ফেলতে হয়—তা নাহলে মুখ থুবড়ে পড়ে।'

কাছাকাছি কোন বাড়ি থেকে রেডিওতে গান শোনা যাচ্ছে। ফেলুদা এগিয়ে কলিং বেল টিপল।

'কী বলবে সেটা ঠিক করেছ ফেলুদা ?'

'যা খুশি তাই বলব। তুই কিন্তু স্পীক-টি-নট। যতক্ষণ থাকবি এ বাড়িতে, একটি কথা বলবিনে।'

'কিছু জিজ্ঞেস করলেও না ?'

'শাটাপ্!'

একটা নেপালী চাকর এসে দরজা খুলে দিল।

'অন্দর আঈয়ে।'

বৈঠকখানায় ঢুকলাম। বেশ সুন্দর পুরোনো প্যাটার্নের কাঠের বাড়ি। শুনেছি রাজেনবাবু দশ বছর হল রিটায়ার করে দার্জিলিং-এ আছেন। কলকাতায় বেশ নাম-করা উকিল ছিলেন।

চেয়ার টেবিল যা আছে ঘরে সব বেতের। যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে চারদিকে দেয়ালে টাঙানো সব অদ্ভুত দাঁত খিঁচানো চোখ রাঙানো মুখোশের সারি। আর আছে পুরোনো ঢাল, তলোয়ার, ভোজালি, থালা, ফুলদানি এইসব। কাপড়ের উপরে রং করা বুদ্ধের ছবিও আছে—কত পুরোনো কে জানে ? কিন্তু তাতে যে সোনালি রংটা আছে সেটা এখনও ঝলমল করছে।

আমরা দুজনে দুটো বেতের চেয়ারে বসলাম।

ফেলুদা দেয়ালের এদিক ওদিক দেখে বলল, 'পেরেকগুলো সব নতুন, মর্চে ধরেনি। ভদ্রলোকের প্রাচীন জিনিসের শখটা বোধহয় বেশি প্রাচীন নয়।'

রাজেনবাবু ঘরে ঢুকলেন।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম ফেলুদা উঠে গিয়ে টিপ্ করে এক পেন্নাম ঠুকে বলল, 'চিনতে পারছেন ? আমি জয়কৃষ্ণ মিত্তিরের ছেলে ফেলু।'

রাজেনবাবু প্রথম চোখ কপালে তুললেন, তারপর চোখের দু'পাশ কুঁচকিয়ে একগাল হেসে বললেন, 'বা-বা! কত বড় হয়েছো তুমি, অ্যাঁ ? কবে এলে এখানে ? বাড়ির সব ভালো ? বাবা এসেছেন ?'

ফেলুদা জবাব দিচ্ছে, আর আমি মনে মনে বলছি—কী অন্যায়, এত কথা হল, আর ফেলুদা একবারও বলল না সে রাজেনবাবুকে চেনে ?

এবার ফেলুদা আমার পরিচয়টাও দিয়ে দিল। রাজেনবাবুর মুখ দেখে মনেই হল না যে এই সাতদিন আগে আমাকে লাজঞ্চুস দেবার কথাটা ওঁর মনে আছে।

ফেলুদা এবার বলল, 'আপনার খুব প্রাচীন জিনিসের শখ দেখছি।'

রাজেনবাবু বললো, 'হ্যাঁ। এখন তো প্রায় নেশায় দাঁড়িয়েছে।'

'কদ্দিনের ব্যাপার ?'

'এইতো,—মাস ছ'য়েক হবে। কিন্তু এর মধ্যেই অনেক কিছু সংগ্রহ করে ফেলেছি।'

ফেলুদা এবার একটা গলা খাঁকরানি দিয়ে, আমার কাছ থেকে শোনা ঘটনাটা বলে বলল, 'আপনি আমার বাবার মামলার ব্যাপারে যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, তার প্রতিদানে আপনার এই বিপদে যদি কিছু করতে পারি...'

রাজেনবাবুর ভাব দেখে মনে হল তিনি সাহায্য পেলে খুশিই হবেন, কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই তিনকড়িবাবু ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাঁপানোর বহর দেখে মনে হল বোধহয় বেড়িয়ে ফিরলেন। রাজেনবাবু আমাদের সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার বিশেষ বন্ধু জ্ঞানেশ সেন অ্যাডভোকেট্ হচ্ছেন তিনকড়িবাবুর প্রতিবেশী। আমি ঘরভাড়া দেবো শুনে জ্ঞানেশই ওঁকে সাজেস্ট করে আমার এখানে আসতে। গোড়ায় ইনি হোটেলের কথা ভেবেছিলেন।'

তিনকড়িবাবু হেসে বললেন, 'আমার ভয় ছিল তোমার এই চুরুটের বাতিকটা নিয়ে। এমনও হতে পারত যে রাজেনবাবু হয়ত চুরুটের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না। তাই সেটা আমি আমার প্রথম চিঠিতেই লিখে জানিয়ে দিয়েছিলাম।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি কি বায়ু পরিবর্তনের জন্য এসেছেন?'

'তা বটে। তবে বায়ুর অভাবটাই যেন লক্ষ্য করছি বেশি। পাহাড়ে ঠাণ্ডাটা আরেকটু বেশি এক্সপেক্ট করে লোকে।'

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'আপনার বোধহয় গানবাজনার শখ?'

তিনকড়িবাবু অবাক হাসি হেসে বললেন, 'সেটা জানলে কী করে হে?'

'আপনি যখন কথা বলছেন তখন লক্ষ্য করছি যে লাঠির উপর রাখা আপনার ডান হাতের তর্জনীটা রেডিওর গানটার সঙ্গে তাল রেখে যাচ্ছে।'

রাজেনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'মোক্ষম ধরেছ। উনি ভালো শ্যামা সঙ্গীত গাইতে পারেন।'

ফেলুদা এবার বলল, 'চিঠিটা হাতের কাছে আছে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'হাতের কাছে কেন, একেবারে বুকের কাছে।'

রাজেনবাবু কোটের বুকপকেট থেকে চিঠিটা বার করে ফেলুদাকে দিলেন। এইবার সেটা দেখার সুযোগ পেলাম।

হাতে লেখা চিঠি নয়। নানা জায়গা থেকে ছাপা বাংলা কথা কেটে কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে চিঠিটা লেখা হয়েছে, তা হল এই—*'তোমার অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করিতে প্রস্তুত হও।'*

ফেলুদা বলল, 'এ চিঠি কি ডাকে এসেছে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। লোক্যাল ডাক—বলা বাহুল্য। দুঃখের বিষয় খামটা ফেলে দিয়েছি। দার্জিলিং-এরই পোস্টমার্ক ছিল। ঠিকানাটাও ছাপা বাংলা কথা কেটে কেটে লেখা।'

'আপনার নিজের কাউকে সন্দেহ হয় ?'

'কী আর বলব বলো! কোনদিন কারুর প্রতি কোন অন্যায় বা অবিচার করেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'আপনার বাড়িতে যাতায়াত করেন এমন কয়েকজনের নাম করতে পারেন ?'

'খুব সহজ। আমি লোকজনের সঙ্গে মিশি কমই। ডাক্তার ফণী মিত্তির আসেন অসুখ-বিসুখ হলে...'

'কেমন লোক বলে মনে হয় ?'

'ডাক্তার হিসেবে বোধহয় সাধারণ স্তরের। তবে তাতে আমার এসে যায় না, কারণ আমার ব্যারামও সাধারণ—সর্দি জ্বর ছাড়া আর কিছুই হয়নি দার্জিলিং এসে অবধি। তাই ভালো ডাক্তারের প্রয়োজন হয় না।'

'চিকিৎসা করে পয়সা নেন ?'

'তা নেন বই কি। আর আমারও তো পয়সার অভাব নেই। মিথ্যে অব্‌লিগেশনে যাই কেন ?'

'সম্প্রতি মিস্টার ঘোষাল বলে এক ভদ্রলোক যাতায়াত...এই দ্যাখো!'

দরজার দিকে ফিরে দেখি একটি ফরসা, মাঝারি হাইটের, স্যুট পরা ভদ্রলোক হাসিমুখে ঘরে ঢুকছেন।

'আমার নাম শুনলাম বলে মনে হল যে!'

রাজেনবাবু বললেন, 'এইমাত্র আপনার নাম করা হয়েছে। আপনারও আমার মত পুরোনো জিনিসের শখ সেটাই এই ছেলেটিকে বলতে যাচ্ছিলুম। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—'

নমস্কার টমস্কারের পর মিস্টার ঘোষাল—পুরো নাম অবনীমোহন ঘোষাল—রাজেনবাবুকে বললেন, 'আপনাকে আজ দোকানে দেখলুম না, তাই একবার ভাবলুম খোঁজ নিয়ে যাই।'

রাজেনবাবু বললেন, 'না,—আজ শরীরটা ভালো ছিল না।'

বুঝলাম রাজেনবাবু চিঠিটার কথা মিস্টার ঘোষালকে বলতে চান না। ফেলুদা মিস্টার ঘোষাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিটা হাতের তেলোর মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছে।

ঘোষাল বললেন, 'আপনি ব্যস্ত থাকলে আজ বরং...আসলে আপনার ওই তিব্বতী ঘন্টাটা একবার দেখার ইচ্ছে ছিল।'

রাজেনবাবু বললেন, 'সে তো খুব সহজ ব্যাপার। হাতের কাছেই আছে।'

রাজেনবাবু ঘন্টা আনতে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

ফেলুদা ঘোষালকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি এখানেই থাকেন ?'

ভদ্রলোক দেয়াল থেকে একটা ভোজালি নামিয়ে সেটা দেখতে দেখতে বললেন, 'আমি কোন এক জায়গায় বেশি দিন থাকি না। আমার ব্যবসার জন্য প্রচুর ঘুরতে হয়। আমি 'কিউরিও' সংগ্রহ করি।'

বাড়ি ফেরার পথে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, 'কিউরিও' মানে দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন জিনিস।

রাজেনবাবু ঘন্টাটা নিয়ে এলেন। দারুণ দেখতে জিনিসটা। নিচের অংশটা রূপোর তৈরী, হাতলটা তামা আর পেতল মেশানো, আর উপরে লাল নীল সব পাথর বসানো।

অবনীবাবু চোখ-টোখ কুঁচকে বেশ অনেকক্ষণ ধরে ঘন্টাটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

রাজেনবাবু বললেন, 'কী মনে হয় ?'

'সত্যিই দাঁও মেরেছেন। একেবারে খাঁটি পুরোনো জিনিস।'

'আপনি বললে আমার আর কোনই সন্দেহ থাকে না। দোকানদার বলে এটা নাকি একেবারে খোদ লামার প্রাসাদের জিনিস।'

'কিছুই আশ্চর্য না। ...আপনি বোধহয় এটা হাতছাড়া করতে রাজী নন ? মানে ভালো দাম পেলেও ?'

রাজেনবাবু মিষ্টি করে হেসে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন ? শখের জিনিস—ভালবেসে কিনেছি। সেটাকে বেচে লাভ করব, বা এমন কি কেনা দরেও বেচব—এ ইচ্ছে আমার নেই।'

অবনীবাবু ঘন্টাটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ আসি। কাল আশা করি বেরোতে পারবেন একবার।'

রাজেনবাবু বললেন, 'ইচ্ছে তো আছে।'

অবনীবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর ফেলুদা রাজেনবাবুকে বলল, 'ক'টা দিন একটু না বেরিয়ে-টেরিয়ে সাবধানে থাকা উচিত নয় কি ?

'সেটাই বোধ হয় ঠিক। কিন্তু মুশকিল কী জানো ? সেই চিঠির ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য যে এটাকে ঠিক যেন সিরিয়াসলি নিতেই পারছি না। মনে হচ্ছে এটা যেন একটা ঠাট্টা—যাকে বলে, প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক।'

'যদ্দিন না সেটা সম্বন্ধে ডেফিনিট হওয়া যাচ্ছে, তদ্দিন বাড়িতেই থাকুন না। আপনার নেপালী চাকরটা কদ্দিনের ?'

'একেবারে গোড়া থেকেই আছে। কম্‌প্লীটলি রিলায়েব্‌ল।'

ফেলুদা এবার তিনকড়িবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'আপনি কি বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকেন ?'

'সকাল বিকেল ঘন্টাখানেক একটু এদিক ওদিক ঘুরে আসি আর কি। কিন্তু বিপদ যদি ঘটেই, আমি বুড়ো মানুষ খুব বেশি কিছু করতে পারি কি ? আমার বয়স হল চৌষট্টি, রাজেনবাবুর চেয়ে এক বছর কম।'

রাজেনবাবু বললেন, 'উনি চেঞ্জে এসেছেন, ওঁকে আর বাড়িতে বন্দী করে রাখার ফন্দি করছ কেন তোমরা ? আমি থাকব, আমার চাকর থাকবে, এই যথেষ্ট। তোমরা চাও তো দু'বেলা খোঁজ-খবর নিয়ে যেও এখন।'

'বেশ তাই হবে।'

ফেলুদার দেখাদেখি আমিও উঠে পড়লাম।

আমরা যেখানে বসেছিলাম তার উল্টোদিকেই একটা ফায়ারপ্লেস। ফায়ারপ্লেসের উপরেই একটা তাক, আর তিনটে ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। ফেলুদা ছবিগুলোর দিকে এগিয়ে গেল।

প্রথম ছবিটা দেখিয়ে রাজেনবাবু বললেন, 'ইনি আমার স্ত্রী। বিয়ের চার বছর পরেই মারা গিয়েছিলেন।'

দ্বিতীয় ছবি, একজন আমার বয়সী ছেলের, গায়ে ভেলভেটের কোট।

ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'এটি কে ?'

রাজেনবাবু হো হো করে হেসে বললেন, 'সময়ের প্রভাবে মানুষের চেহারার কি বিচিত্র পরিবর্তন ঘটতে পারে সেইটে বোঝানোর জন্য এই ছবি। উনি হচ্ছেন আমারই বাল্য সংস্করণ। বাঁকুড়া মিশনারি স্কুলে পড়তাম তখন। আমার বাবা ছিলেন বাঁকুড়ায় ম্যাজিস্ট্রেট।'

সত্যি, ভারী ফুটফুটে চেহারা ছিল রাজেনবাবুর ছেলেবয়সে।

'অবশ্যি ছবি দেখে ভুলো না। দুরন্ত বলে ভারী বদনাম ছিল আমার। শুধু যে মাস্টারদের জ্বালিয়েছি তা নয়, ছাত্রদেরও। একবার স্পোর্টসের দিন হান্ড্রেড ইয়ার্ডস-এ আমাদের বেস্ট্ রানারকে কাত করে দিয়েছিলাম, ল্যাং মেরে।'

তৃতীয় ছবিটা একজন ফেলুদার বয়সী ছেলের। রাজেনবাবু বললেন সেটা তাঁর একমাত্র ছেলে প্রবীরের।

'উনি এখন কোথায় ?'

রাজেনবাবু গলা খাঁকরিয়ে বললেন, 'জানি না ঠিক। বহুকাল দেশছাড়া! প্রায় সিক্সটিন ইয়ার্স।'

'আপনার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি নেই ?'

'না।'

ফেলুদা দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'ভারি ইন্টারেস্টিং কেস।' আমি মনে মনে বললাম, ফেলুদা একেবারে বই-এর ডিটেকটিভের মত কথা বলছে।

বাইরেটা ছম্‌ছমে অন্ধকার হয়ে এসেছে। জলাপাহাড়ের গায়ের বাড়িগুলোতে বাতি জ্বলে উঠেছে। পাহাড়ের নিচের দিকে চেয়ে দেখলাম রংগীত উপত্যকা থেকে কুয়াশা ওপর দিকে উঠছে।

রাজেনবাবু আর তিনকড়িবাবু আমাদের সঙ্গে গেটটা অবধি এলেন। রাজেনবাবু গলা নামিয়ে ফেলুদাকে বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, তাও তোমাকে বলছি—একটু যে নারভাস বোধ করছি না তা নয়। এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এ-চিঠি যেন বিনামেঘে বজ্রপাত।'

ফেলুদা বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'আপনি কিছু ভাববেন না। আমি এর সমাধান করবই। আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন গিয়ে।'

রাজেনবাবু 'গুডনাইট অ্যান্ড থ্যাঙ্ক ইউ' বলে চলে গেলেন।

এবার তিনকড়িবাবু ফেলুদাকে বললেন, 'তোমার—তোমাকে তুমি বলেই বলছি—তোমার অবজারভেসনের ক্ষমতা দেখে আমি সত্যিই ইম্‌প্রেসড হইচি। ডিটেক্‌টিভ গল্প আমিও অনেক পড়িচি। এই চিঠিটার ব্যাপারে আমি হয়ত তোমাকে কিছুটা সাহায্যও করতে পারি।'

'তাই নাকি ?'

'এই যে টুকরো টুকরো ছাপা কথা কেটে চিঠিটা লেখা হয়েছে, এর থেকে কী বুঝলে বল তো ?'

ফেলুদা কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল, 'এক নম্বর—কথাগুলো কাটা হয়েছে খুব সম্ভব ব্লেড দিয়ে—কাঁচি দিয়ে নয়।'

'ভেরি গুড।'

'দুই নম্বর—কথাগুলো নানারকম বই থেকে নেওয়া হয়েছে—কারণ হরফ ও কাগজে তফাত রয়েছে।'

'ভেরি গুড। সেইসব বই সম্বন্ধে কোন আইডিয়া করেচ ?'

'চিঠির দুটো শব্দ 'শাস্তি' আর 'প্রস্তুত'—মনে হচ্ছে খবরের কাগজ থেকে কাটা।'

'আনন্দ বাজার।'

'তাই বুঝি ?'

'ইয়েস। ওই টাইপটা আনন্দবাজারেই ব্যবহার হয়—অন্য বাংলা কাগজে নয়। আর অন্য কথাগুলোও কোনটাই পুরোন বই থেকে নেওয়া হয়নি, কারণ যে হরফে ওগুলো ছাপা, সেটা হয়েছে মাত্র পনর বিশ বছর হল।... আর যে আঠা দিয়ে আঁটকানো হয়েছে সেটা সম্বন্ধে কোন ধারণা করেছ ?'

'গন্ধটা গ্রিপেক্স আঠার মত।'

'চমৎকার ধরেছ।'

'কিন্তু আপনিও তো ধরার ব্যাপারে কম যান না দেখছি।'

তিনকড়িবাবু হেসে বললেন, 'কিন্তু তোমার বয়সে আমি ডিটেক্‌টিভ কথাটার মানে জানতুম কিনা সন্দেহ!'

বাড়ি ফেরার পথে ফেলুদা বলল, 'রাজেনবাবুর মিস্ট্রি সল্‌ভ করতে পারব কিনা জানি না—কিন্তু এই সূত্রে তিনকড়িবাবুর সঙ্গে আলাপটা বেশ ফাউ পাওয়া গেল।'

আমি বললাম, 'তাহলে উনিই ব্যাপারটা তদন্ত করুন না। তুমি আর মিথ্যে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?'

'আহা—বাংলা হরফের ব্যাপারটা জানা আছে বলে কি সবই জানবেন নাকি?'

ফেলুদার কথাটা শুনে ভালোই লাগল। ওর মত বুদ্ধি আশা করি তিন-কড়িবাবুর নেই। মাঝে মাঝে ফোড়ন দিলে আপত্তি নেই, কিন্তু আসল কাজটা যেন ফেলুদাই করে।

'কাকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে ফেলুদা?'

'অপরা—'

কথাটার মাঝখানেই ফেলুদা থেমে গেল। তার দৃষ্টি দেখলাম একজন লোককে ফলো করে পিছন দিকে ঘুরছে।

'লোকটাকে দেখলি?'

'কই, না তো। মুখ দেখি নি তো।'

'ল্যাম্পের আলোটা পড়ল, আর ঠিক মনে হল'—ফেলুদা আবার থেমে গেল।

'কি মনে হল ফেলুদা?'

'নাঃ, বোধহয় চোখের ভুল। চ', পা চালিয়ে চ', ক্ষিদে পেয়েছে।'

ফেলুদা হল আমার মাসতুতো দাদা। ও আর আমি আমার বাবার সঙ্গে দার্জিলিং-এ বেড়াতে এসে শহরের নীচের দিকে স্যানাটোরিয়ামে উঠেছি। স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি বাঙালি; বাবা তাদেরই মধ্যে থেকে সমবয়সী বন্ধু জুটিয়ে নিয়ে তাসটাস খেলে গল্পটল্প করে সময় কাটাচ্ছেন। আমি আর ফেলুদা কোথায় যাই, কী করি, তাই নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না।

আজ সকালে আমার ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়েছে। উঠে দেখি বাবা রয়েছেন, কিন্তু ফেলুদার বিছানা খালি। কী ব্যাপার?

বাবাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'ও এসে অবধি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেনি। আজ দিনটা পরিষ্কার দেখে বোধ হয় আগেভাগে বেরিয়েছে।'

আমি কিন্তু মনে মনে আন্দাজ করছিলুম যে ফেলুদা তদন্তের কাজ শুরু করে দিয়েছে, আর সেই কাজেই বেরিয়েছে। কথাটা ভেবে ভারী রাগ হল। আমাকে

বাদ দিয়ে কিছু করার কথা তো ফেলুদার নয়। যাই হোক্, আমিও মুখটুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

লেডেন লা রোডে ট্যাক্সী স্ট্যান্ডটার কাছাকাছি এসে ফেলুদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি বললাম, 'বারে, তুমি আমায় ফেলে বেরিয়েছ কেন?'

'শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল—তাই ডাক্তার দেখাতে গেস্‌লাম।'

'ফণি ডাক্তার?'

'তোরও একটু বুদ্ধি খুলেছে দেখছি।'

'দেখালে?'

'চার টাকা ভিজিট নিল, আর একটা ওষুধ দিল।'

'ভালো ডাক্তার?'

'অসুখ নেই তাও পরীক্ষা করে ওষুধ দিচ্ছে—কেমন ডাক্তার বুঝে দ্যাখ; তারপর বাড়ির যা চেহারা দেখলাম, তাতে পসার যে খুব বেশি তাও মনে হয় না।'

'তাহলে উনি কখনই চিঠিটা লেখেন নি।'

'কেন?'

'গরীব লোকের অত সাহস হয়?'

'তা টাকার দরকার হলে হয় বই কি।'

'কিন্তু চিঠিতে তো টাকা চায় নি।'

'ওই ভাবে খোলাখোলি বুঝি কেউ টাকা চায়?'

'তবে?'

'রাজেনবাবুর অবস্থা কাল কি রকম দেখলি বল তো?'

'কেমন যেন ভীতু ভীতু।'

'ভয় পেয়ে মনের অসুখ হতে পারে সেটা জানিস?'

'তা তো পারেই।'

'আর মনের অসুখ থেকে শরীরের অসুখ?'

'তাও হয় বুঝি?'

'ইয়েস। আর শরীরের অসুখ হলে ডাক্তার ডাকতে হবে সেটা আশা করি তোর মত ক্যাবলারও জানা আছে।'

ফেলুদার বুদ্ধি দেখে আমার প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। অবিশ্যি ফণী ডাক্তার যদি সত্যিই এত সব ভেবে-টেবে চিঠিটা লিখে থাকে, তাহলে ওরও বুদ্ধি সাংঘাতিক বলতে হবে।

ম্যাল্‌-র মুখে ফোয়ারার কাছাকাছি যখন এসেছি তখন ফেলুদা বলল, 'কিউরিও সম্বন্ধে একটা কিউরিয়সিটি বোধ করছি।'

'কিউরিও'-র মানে আগেই শিখেছিলাম, আর কিউরিয়সিটি মানে যে কৌতূহল সেটা ইস্কুলেই শিখেছি।

আমাদের ঠিক পাশেই 'নেপাল কিউরিও শপ।' রাজেনবাবু আর অবনীবাবু এখানেই আসেন।

ফেলুদা সটান দোকানের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

দোকানদারের গায়ে ছাই রং-এর কোট, গলায় মাফলার আর মাথায় সোনালি কাজ করা কালো টুপি। ফেলুদাকে দেখে হাসি হাসি মুখ করে এগিয়ে এল। দোকানের ভেতরটা পুরোনো জিনিসপত্রে গিজগিজ করছে, আলোও বেশি নেই। আর গন্ধটাও যেন সেকেলে।

ফেলুদা এদিক ওদিক দেখে গম্ভীর গলায় বলল, 'ভালো পুরোনো থাংকা আছে?'

'এই পাশের ঘরে আসুন। ভালো জিনিস তো বিক্রী হয়ে গেছে সব। তবে নতুন মাল আবার কিছু আসছে।'

পাশের ঘরে যাবার সময় আমি ফেলুদার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম, 'থাংকা কী জিনিস?'

ফেলুদা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'দেখতেই তো পাবি।'

পাশের ঘরটা আরো ছোট—যাকে বলে একেবারে ঘুপ্‌চি।

দোকানদার দেয়ালে ঝোলানো সিল্কের উপর আঁকা একটা বুদ্ধের ছবি দেখিয়ে বলল, 'এই একটাই ভালো জিনিস আছে—তবে একটু ড্যামেজড্।'

একেই বলে থাংকা? এ জিনিস তো রাজেনবাবুর বাড়িতে অনেক আছে।

ফেলুদা ভীষণ বিজ্ঞের মত থাংকাটার গায়ের উপর চোখ ঠেকিয়ে উপর থেকে নীচে অবধি প্রায় তিন মিনিট ধরে দেখে বলল, 'এটার বয়স তো সত্তর বছরের বেশি বলে মনে হচ্ছে না। আমি অন্তত তিনশ বছরের পুরনো জিনিস চাইছি।'

দোকানদার বলল, 'আমরা আজ বিকালে কিন্তু এক লট মাল পাচ্ছি। তার মধ্যে ভালো থাংকা পাবেন।'

'আজই পাচ্ছেন?'

'আজই।'

'এ খবরটা তাহলে রাজেনবাবুকে জানাতে হয়।'

'মিস্টার মজুমদার? ওনার তো জানা আছে। রেগুলার খদ্দের যে দু-তিনজন আছেন, তাঁরা সকলেই নতুন মাল দেখতে বিকালে আসছেন।'

'অবনীবাবুও খবরটা পেয়ে গেছেন? মিস্টার ঘোষাল?'

'জরুর!'

www.alorpathsala.org

'আর বড় খদ্দের কে আছে আপনাদের ?'

'আর আছেন মিষ্টার গিলমোর—চা বাগানের ম্যানেজার। সপ্তাহে দু'দিন বাগান থেকে আসেন। আর মিষ্টার নাওলাখা। উনি এখন সিকিমে।'

'বাঙালি আর কেউ নেই ?'

'না স্যার।'

'আচ্ছা দেখি, বিকেলে যদি একবার ঢুঁ মারতে পারি।'

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'তোপ্‌সে তুই একটা মুখোশ চাস ?'

তোপ্‌সে যদিও আমার আসল ডাকনাম নয়, তবু ফেলুদা তপেশ থেকে ওই নামটাই করে নিয়েছে।

মুখোশের লোভ কি সামলানো যায় ? ফেলুদা নিজেই একটা বাছাই করে আমাকে কিনে দিয়ে বলল, 'এইটেই সবচেয়ে হরেনডাস্—কী বলিস ?'

ফেলুদা বলে হরেনডাস্ বলে আসলে কোন কথা নেই। 'টিমেনডাস্ মানে সাংঘাতিক, আর 'হরিবল্' মানে বীভৎস। এই দুটো একসঙ্গে বোঝাতে নাকি কেউ কেউ হরেনডাস্ ব্যবহার করে। মুখোশটা সম্বন্ধে যে ওই কথাটা দারুণ খাটে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দোকান থেকে বেরিয়ে ফেলুদা আমার হাত ধরে কী একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। এবারও দেখি ফেলুদা একজন লোকের দিকে দেখছে। বোধ হয় কাল রাতে যাকে দেখেছিল সেই লোকটাই। বয়স আমার বাবার মত, মানে চল্লিশ-বেয়াল্লিশ, গায়ের রং ফরসা, চোখে কালো চশমা। যে স্যুটটা পরে আছে সেটা দেখে মনে হয় খুব দামী। ভদ্রলোক ম্যাল্-র মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাইপ ধরাচ্ছেন। আমার দেখেই কেমন জানি চেনা চেনা মনে হল, কিন্তু কোথায় দেখেছি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ফেলুদা সোজা লোকটার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে ভীষণ সাহেবি কায়দার উচ্চারণে বলল, 'এক্সকিউজ মী, আপনি মিস্‌টা ছ্যাঠাঝি ?'

ভদ্রলোকও একটু গম্ভীর গলায় পাইপ কামড়ে বলল, 'নো, আই অ্যাম নঠ্।'

ফেলুদা খুবই অবাক হবার ভান করে বলল, 'স্ট্রেঞ্জ—আপনি সেন্ট্রাল হোটেলে উঠেছেন না ?'

ভদ্রলোক একটু হেসে অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'না। মাউন্ট এভারেস্ট্। অ্যান্ড আই ডোন্ট হ্যাভ এ টুইন ব্রাদার।'

এই বলে ভদ্রলোক গটগটিয়ে অবজারভেটরি হিলের দিকে চলে গেলেন। যাবার সময় লক্ষ্য করলাম যে তার কাছে একটা ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেট, আর কাগজটার গায়ে লেখা 'নেপাল কিউরিও শপ'।

আমি চাপা গলায় বললাম, 'ফেলুদা, উনিও কি মুখোশ কিনেছেন নাকি ?'

'তা কিনতে পারে। মুখোশটা তো আর তোর আমার একচেটিয়া নয়।...চ' কেভেন্‌টার্সে গিয়ে একটু কফি খাওয়া যাক।'

কেভেন্‌টার্সের দিকে যেতে যেতে ফেলুদা বলল, 'লোকটাকে চিনলি ?'

আমি বললাম, 'তুমিই চিনলে না, আর আমি কি করে চিনি বল। তবে চেনা চেনা লাগছিল।'

'আমি চিনলাম না ?'

'বারে। কোথায় চিনলে ? ভুল নাম বললে যে ?'

'তোর যদি এতটুকু সেন্স থাকে। ভুল নাম বলেছি হোটেলের নামটা বের করার জন্য, সেটাও বুঝলি না ? লোকটার আসল নাম কী জানিস ?'

'কী ?'

'প্রবীর মজুমদার।'

'ও হো! হ্যাঁ ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ! রাজেনবাবুর ছেলে, তাই না ? যার ছবি রয়েছে তাকের উপর ? অবিশ্যি বয়সটা এখন অনেক বেড়ে গেছে তো।'

'শুধু যে চেহারায় মিল তা নয়—গালের আঁচিলটা নিশ্চয় তুইও লক্ষ্য করেছিস—আসল কথাটা হচ্ছে, ভদ্রলোকের জামা কাপড় সব বিলিতি। সুট লন্ডনের, টাই প্যারিসের, জুতো ইটালিয়ান, এমন কি রুমালটা পর্যন্ত বিলিতি। সদ্য বিলেত-ফেরত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু ওঁর ছেলে এখানে রয়েছে সে খবর রাজেনবাবু জানেন না ?'

'বাপ যে এখানে রয়েছে সেটা ছেলে জানে কিনা সেটাও খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার।'

রহস্য ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে, এই কথাটা ভাবতে ভাবতে কেভেন্টারের দোকানে পৌঁছলাম।

দোকানের ছাতে যে বসার জায়গাটা আছে, সেটা আমার ভীষণ ভালো লাগে। চারিদিকে দার্জিলিং শহরটা, আর ওই নীচে বাজারটা দারুণ ভালো দেখায়।

ছাতে উঠে দেখি কোণের টেবিলটায় চুরুট হাতে তিনকড়িবাবু বসে কফি খাচ্ছেন। ফেলুদাকে দেখতে পেয়েই হাত তুলে আমাদের তাঁর টেবিলে গিয়ে বসতে বললেন।

আমরা তিনকড়িবাবুর দু'দিকে দুটো টিনের চেয়ারে বসলাম।

তিনকড়িবাবু ফেলুদাকে বললেন, 'ডিটেক্‌শনে তোমার পারদর্শিতা দেখে খুশি হয়ে আমি তোমাদের দু'জনকে দুটো হট্‌ চকোলেট খাওয়াব—আপত্তি আছে ?'

হট্‌ চকোলেটের নাম শুনে আমার জিভে জল এসে গেল।

তিনকড়িবাবু তুড়ি মেরে একটা বেয়ারাকে ডাকলেন।

বেয়ারা এসে অর্ডার নিয়ে গেলে পর তিনকড়িবাবু কোটের পকেট থেকে বই বার করে ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, 'এই নাও। একটা এক্সট্রা কপি ছিল—আমার লেটেস্ট্ বই। তোমায় দিলুম।'

বইয়ের মলাট দেখে ফেলুদার মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

'আপনার বই মানে? আপনার লেখা? আপনিই 'গুপ্তচর' নাম নিয়ে লেখেন?'

তিনকড়িবাবু আধ-বোঝা চোখে অল্প হাসি হেসে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন।

ফেলুদার অবাক ভাব আরো যেন বেড়ে গেল।

'সেকি! আপনার সব ক'টা উপন্যাস যে আমার পড়া! বাংলায় আপনার ছাড়া আর কারুর রহস্য উপন্যাস আমার ভালো লাগে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ! ব্যাপারটা কী জান? এখানে একটা প্লট মাথায় নিয়ে লেখার জন্যই এসেছিলাম। এখন দেখছি বাস্তব জীবনের রহস্য নিয়েই মাথা ঘামিয়ে ছুটিটা ফুরিয়ে গেল।'

'আমার সত্যিই দারুণ লাক্—আপনার সঙ্গে এভাবে আলাপ হয়ে গেল।'

'দুঃখের বিষয় আমার ছুটির মেয়াদ সত্যিই ফুরিয়ে এসেছে। কাল সকালে চলে যাচ্ছি আমি। আশা করছি যাবার আগে তোমাদের আরো কিছুটা হেল্প করে দিয়ে যেতে পারব।'

ফেলুদা এবার তার এক্সাইটিং খবরটা তিনকড়িবাবুকে দিয়ে দিল।

'রাজেনবাবুর ছেলেকে আজ দেখলাম।'

'বল কী হে?'

'এই দশ মিনিট আগে।'

'তুমি ঠিক বলছ? চিনতে পেরেছ তো ঠিক?'

'চৌদ্দ আনা সিওর। মাউন্ট এভারেস্ট্ হোটেলে গিয়ে খোঁজ করলে বাকি দু'-আনাও পুরে যাবে বোধ হয়।'

তিনকড়িবাবু হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'রাজেনবাবুর মুখে তার ছেলের কথা শুনেছ?'

'কাল যা বললেন, তার বেশি শুনি নি।'

'আমি শুনেছি অনেক কথা। ছেলেটি অল্পবয়সে বখে গিয়েছিল। বাপের সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করে ধরা পড়েছিল। রাজেনবাবু তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। ছেলেটি গিয়েও ছিল তাই। ২৪ বছর বয়স তখন তার। একেবারে নিখোঁজ। রাজেনবাবু অনেক অনুসন্ধান করেছিলেন, কারণ পরে তাঁর অনুতাপ হয়। কিন্তু ছেলে কোন খোঁজখবর নেয় নি বা দেয় নি। বিলেতে তাকে দেখেছিলেন রাজেনবাবুরই এক বন্ধু। তাও সে দশ বারো বছর আগে।'

'রাজেনবাবু তাহলে জানেন না যে তাঁর ছেলে এখানে আছে ?'

'নিশ্চয়ই না। আমার মনে হয় ওঁকে না জানানই ভালো। একে এই চিঠির শক্ তার উপর...।'

তিনকড়িবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। রহস্য উপন্যাস লেখা ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

ফেলুদা হাসতে হাসতে বলল, 'প্রবীর মজুমদার যে চিঠি লিখে থাকতে পারেন সেটা আপনার খেয়াল হয়নি তো ?'

'এগজ্যাক্টলি। কিন্তু....'

তিনকড়িবাবু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

বেয়ারা হট্‌চকলেট এনে টেবিলে রাখতে তিনকড়িবাবু যেন একটু চাগিয়ে উঠলেন। ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'ফণী মিত্তিরকে কেমন দেখলেন ?'

ফেলুদা একটু যেন হকচকিয়ে গেল।

'সে কি, আপনি কী করে জানলেন আমি ওখানে গেস্‌লাম ?'

'তুমি যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই আমিও গেস্‌লাম।'

'আমাকে রাস্তায় দেখেছিলেন বুঝি ?'

'না।'

'তবে ?'

'ডাক্তারের ঘরের মেঝেতে একটি মরা সিগারেট দেখে জিজ্ঞেস করলাম কে খেয়েছে। ডাক্তার ধুমপান করেন না। ফণীবাবু তখন বর্ণনা দিলেন। তাতে তোমার কথা মনে হল, যদিও তোমাকে সিগারেট খেতে দেখি নি। কিন্তু এখন তোমার আঙ্গুলের গায়ে হল্‌দে রং দেখে বুঝেছি, তুমি খাও।'

ফেলুদা তিনকড়িবাবুর বুদ্ধির তারিফ করে বললেন, 'আপনারও ফণী মিত্তিরকে সন্দেহ হয়েছিল নাকি ?'

'তা হবে না ? লোকটাকে দেখলে অভক্তি হয় না কি ?'

'তা হয়। রাজেনবাবু যে কেন ওকে আমল দেন জানি না।'

'তাও জান না বুঝি ? দার্জিলিং-এ আসার কিছুদিনের মধ্যে রাজেনবাবুর ধম্মকম্মের দিকে মন যায়। তখন ফণীবাবুই তাকে এক গুরুর সন্ধান দিয়েছিলেন। একই গুরুর শিষ্য হিসেবে ওদের যে প্রায় ভাই ভাই সম্পর্ক হে!'

ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'ফণী মিত্তিরের সঙ্গে কথা বলে কী বুঝলেন ?'

'কথা তো ছুতো। আসলে বইয়ের আলমারিগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম।'

'বাংলা উপন্যাস আছে কিনা দেখার জন্য ?'

'ঠিক বলেছ।'

'আমিও দেখেছি, প্রায় নেই বললেই চলে। আর যা আছে তাও আদ্যিকালের।'

'ঠিক'।

'তবে ফণী ডাক্তার অন্যের বাড়ির বই থেকেও কেটে চিঠি তৈরী করতে পারে।'

'তা পারে। তবে লোকটাকে দেখে ভারী কুঁড়ে বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে অতটা কাঠখড় পোড়াবে, সে কেন জানি বিশ্বাস হয় না।'

ফেলুদা এবার বলল, 'অবনী ঘোষাল লোকটা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা ?"

'বিশেষ সুবিধের লোক নয় বলেই আমার বিশ্বাস। ভারী ওপর-চালাক। আর ওসব প্রাচীন শিল্প-টিল্প কিছু না। ওর আসল লোভ হচ্ছে টাকার। এখন খরচ করে জিনিস কিনেছে, পরে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করে পাঁচগুণ প্রফিট করবে।'

'ওর পক্ষে এই হুম্‌কি চিঠি দেওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয় কি ?'

'সেটা এখনও তলিয়ে দেখি নি।'

'আমি একটা কারণ আবিষ্কার করেছি।'

আমি অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলাম। ওর ছোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

তিনকড়িবাবু বললেন, 'কী কারণ ?'

ফেলুদা গলাটা নামিয়ে নিয়ে বলল, 'যে দোকান থেকে ওঁরা জিনিস কেনেন, সেখানে কিছু ভালো নতুন মাল বিকেলে আসছে।'

এবার তিনকড়িবাবুর চোখও জ্বলজ্বল করে উঠল।

'বুঝেছি। হুম্‌কি চিঠি পেয়ে রাজেন মজুমদার ঘরে বন্দী হয়ে রইলেন আর সেই ফাঁকতালে অবনী ঘোষাল দোকানে গিয়ে সব লুটেপুটে নিলেন।'

'এগজ্যাক্টলি!'

তিনকড়িবাবু চকোলেটের পয়সা দিয়ে উঠে পড়লেন। আমরা দু'জনেও উঠলাম।

উৎসাহে আর উত্তেজনায় আমার বুকটা টিপ্‌টিপ্‌ করছিল।

অবনী ঘোষাল, প্রবীর মজুমদার আর ফণী মিত্তির—তিনজনকেই তাহলে সন্দেহ করার কারণ আছে।

পনের মিনিটের মধ্যে মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে গিয়ে ফেলুদা সেই খবরটা জেনে নিল। প্রবীর মজুমদার বলে একজন ভদ্রলোক সেই হোটেলের ষোল নম্বর ঘরে পাঁচদিন হল এসে রয়েছেন।

বিকেলের দিকে রাজেনবাবুর বাড়িতে যাবার কথা ফেলুদা বলেছিল কিন্তু দুপুর থেকে মেঘলা করে চারটে নাগাদ তেড়ে বৃষ্টি নামল। আকাশের চেহারা দেখে মনে হল বৃষ্টি সহজে থামবে না।

ফেলুদা সারাটা সন্ধে খাতা পেনসিল নিয়ে কীসব যেন হিসেব করল। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল কী লিখছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। শেষটায় আমি তিনকড়িবাবুর বইটা নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম। দারুণ থ্রিলিং গল্প। পড়তে পড়তে রাজেনবাবুর চিঠির ব্যাপারটা মন থেকে প্রায় মুছেই গেল।

আটটা নাগাদ বৃষ্টি থামল। কিন্তু তখন এত শীত যে বাবা আমাদের বেরোতে দিলেন না।

পরদিন ভোরবেলা ফেলুদার ধাক্কার চোটে ঘুম ভাঙল। 'ওঠ্, ওঠ্—এই তোপ্‌সে—ওঠ্!'

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। ফেলুদা কানের কাছে মুখ এনে দাঁতে দাঁত চেপে এক নিশ্বাসে বলে গেল, 'রাজেনবাবুর নেপালী চাকরটা এসেছিল। বলল, বাবু এখুনি যেতে বলেছেন—বিশেষ দরকার। তুই যদি যেতে চাস তো...'

'সে আর বলতে!'

পনের মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে রাজেনবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দেখি তিনি ফ্যাকাশে মুখ করে খাটে শুয়ে আছেন। ফণী ডাক্তার তাঁর নাড়ি টিপে খাটের পাশটায় বসে, আর তিনকড়িবাবু এই শীতের মধ্যেও একটা হাতপাখা নিয়ে মাথার পিছনটায় দাঁড়িয়ে হাওয়া করছেন।

ফণীবাবুর নাড়ি দেখা হলে পর রাজেনবাবু যেন বেশ কষ্ট করেই জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে বললেন, 'কাল রাত্রে—বারোটার কিছু পরে ঘুমটা ভাঙতে বিদ্যুতের আলোয় আমার মুখের ঠিক সামনে আই স এ ম্যাস্কড্ ফেস!'

'মাস্কড্ ফেস! মুখোস পরা মুখ!'

রাজেনবাবু দম নিলেন। ফণী মিত্তির দেখলাম একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখছেন। রাজেনবাবু বললেন, 'দেখে এমন হল যে চীৎকারও বেরোল না গলা দিয়ে। রাতটা যে কিভাবে কেটেছে—তা বলতে পারি না।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার জিনিসপত্তর কিছু চুরি যায় নি তো?'

রাজেনবাবু বললেন, 'না, তবে আমার বিশ্বাস, আমার বালিশের তলা থেকে আমার চাবির গোছাটা নিতেই সে আমার উপর ঝুঁকেছিল। ঘুম ভেঙে যাওয়াতে জানালা দিয়ে লাফিয়ে ...ওঃ—হরিব্‌ল্ হরিব্‌ল্!'

ফণী ডাক্তার বললেন, 'আপনি উত্তেজিত হবেন না। আপনাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। আপনার কম্‌প্লীট রেস্টের দরকার।'

ফণী বাবু উঠে পড়লেন।

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'ফণীবাবু কাল রাত্রে রুগী দেখতে গেস্‌লেন বুঝি ? কোটের পিছনে কাদার ছিটে লাগল কী করে ?'

ফণীবাবু তেমন কিছু না ঘাবড়িয়ে বললেন, 'ডাক্তারের লাইফ তো জানেনই—আর্তের সেবায় যখন জীবনটাই উৎসর্গ করিচি, তখন ডাক যখনই আসুক না কেন, বেরোতেই হবে। সে ঝড়ই হোক আর বৃষ্টিই হোক, আর বরফই পড়ুক।'

ফণীবাবু তার পাওনা টাকা নিয়ে চলে গেলেন। রাজেনবাবু এবার সোজা হয়ে উঠে বললেন, 'তোমরা আসাতে অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেস্‌লুম, জান। এখন বৈঠকখানায় গিয়ে একটু বসা চলতে পারে।'

ফেলুদা আর তিনকড়িবাবু হাত ধরাধরি করে রাজেনবাবুকে বৈঠকখানায় এনে বসালেন।

তিনকড়িবাবু বললেন, 'স্টেশনে ফোন করেছিলুম যদি যাওয়াটা দু'দিন পিছানো যায়। রহস্যের সমাধান না করে যেতে মন চাইছে না। কিন্তু ওরা বললে এ-টিকিট ক্যানসেল করলে দশদিনের আগে বুকিং পাওয়া যাবে না।'

এটা শুনে আমার ভালোই লাগল। আমি চাইছিলাম ফেলুদা একাই ডিটেক্‌টিভের কাজ করুক। তিনকড়িবাবু যেন ফেলুদার অনেকটা কাজ আগেই করে দিচ্ছিলেন।

রাজেনবাবু বললেন, 'আমার চাকরটার পাহারা দেবার কথা ছিল, কিন্তু আমি নিজেই কাল দশটার সময় তাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি। ওর বাড়িতে খুব অসুখ। বুড়ো বাপ আছে, তার এখন-তখন অবস্থা।'

ফেলুদা বলল, 'মাস্কটা কেমন ছিল মনে আছে ?'

রাজেনবাবু বললেন, 'খুবই সাধারণ নেপালী মুখোশ, দার্জিলিং শহরেই অন্তত আরো তিন চার'শ খোঁজ করলে পাওয়া যাবে। আমার এই ঘরেই তো আরো পাঁচখানা রয়েছে—ওই যে, দ্যাখো না।'

রাজেনবাবু যে মুখোশটার দিকে আঙুল দেখালেন, ঠিক সেই জিনিসটা কাল ফেলুদা আমার জন্য কিনে দিয়েছে।

তিনকড়িবাবু এতক্ষণ বেশি কথা বলেননি, এবার বললেন, 'আমার মতে এবার বোধহয় পুলিশে একটা খবর দেওয়া উচিত। একটা প্রোটেক্‌শনেরও তো দরকার। কাল যা ঘটেছে তার পরে তো আর ব্যাপারটাকে ঠাট্টা বলে নেওয়া চলে না। ফেলুবাবু তুমি তোমার নিজের ইচ্ছে মত তদন্ত চালিয়ে যেতে পার, তাতে তোমায় কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু আমি সব দিক বিবেচনা করে বলছি, এবার পুলিশের সাহায্য নেওয়া দরকার। আমি বরং যাই, গিয়ে একটা ডায়রি

করে আসি। প্রাণের ভয় আছে বলে মনে হয় না, তবে রাজেনবাবু, আপনার ঘন্টাটা একটু সাবধানে রাখবেন।'

আমরা যখন উঠছি, তখন ফেলুদা রাজেনবাবুকে বলল, 'তিনকড়িবাবু তো চলে যাচ্ছেন। তার মানে আপনার একটি ঘর খালি হয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি আজ রাতটা ও-ঘরে এসে থাকি। তাহলে আপনার কোন আপত্তি আছে কী ?'

রাজেনবাবু বললেন, 'মোটেই না। আপত্তি কী ? তুমি তো হলে আমার প্রায় আত্মীয়েরই মত। আর সত্যি বলতে কি, যত বুড়ো হচ্ছি তত যেন সাহসটা কমে আসছে। ছেলেবয়সে দূরন্ত হলে নাকি বুড়ো বয়সে মানুষ ম্যাদা মেরে যায়।'

তিনকড়িবাবুকে ফেলুদা বলল স্টেশনে ওঁকে 'সী-অফ্' করতে যাবে।

ফেরার পথে যখন নেপাল কিউরিও শপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি তখন আমাদের দু'জনেরই চোখ গেল দোকানের ভিতর।

দেখলাম দু'জন ভদ্রলোক দোকানের ভিতর দাঁড়িয়ে জিনিসপত্র দেখছে আর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। দেখে মনে হয় দু'জনের অনেক দিনের আলাপ।

আমি ফেলুদার দিকে চাইলাম।

একজন অবনী ঘোষাল, আর একজন প্রবীর মজুমদার।

তার মুখের ভাব দেখে মনে হল না সে কোন আশ্চর্য জিনিস দেখছে।

সাড়ে দশটার সময় স্টেশনে গেলাম তিনকড়িবাবুকে গুড বাই করতে। উনি এলেন আমাদেরও পাঁচ মিনিট পরে।

'চড়াই উঠে উঠে পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে তাই আস্তে হাঁটতে হল।' সত্যিই ভদ্রলোক একটু খোঁড়াচ্ছিলেন।

নীলরঙের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় উঠে তিনকড়িবাবু তাঁর অ্যাটাচিকেস খুলে একটা ব্রাউন কাগজের প্যাকেট ফেলুদাকে দিলেন।

'এটা কিনতেও একটু সময় লাগল। রাজেনবাবু তো আর কিউরিওর দোকানে যেতে পারলেন না, অথচ কাল সত্যিই অনেক ভালো জিনিস এসেছে। তার থেকে একটি সামান্য জিনিস বাছাই করে ও'-র জন্য এনেছি। তোমরা আমার নাম করে শুভেচ্ছা জানিয়ে ওঁকে দিয়ে দিও।'

ফেলুদা প্যাকেটটা নিয়ে বলল, 'আপনার ঠিকানা দিয়ে গেলেন না ? মিষ্ট্রিটা সল্‌ভ করে আপনাকে জানিয়ে দেবো ভাবছিলাম যে।'

তিনকড়িবাবু বললেন, 'আমার প্রকাশকের ঠিকানাটা আমার বইয়েতেই পাবে—তার কেয়ারে লিখলেই চিঠি আমার কাছে পৌঁছে যাবে। গুডলাক!'

ট্রেন ছেড়ে দিল। ফেলুদা আমাকে বলল, 'লোকটা বিদেশে জন্মালে দারুণ নাম আর পয়সা করত। পর পর এতগুলো ভালো রহস্য উপন্যাস খুব কম লোকেই লিখেছে।'

সারাদিন ধরে ফেলুদা রাজেনবাবুর ব্যাপারটা নিয়ে নানান জায়গায় ঘোরাফেরা করল। আমি অনেক করে বলতেও আমাকে সঙ্গে নিল না। সন্ধেবেলা যখন রাজেনবাবুর বাড়ি যাচ্ছি তখন ফেলুদাকে বললাম, 'কোথায় কোথায় গেলে অন্তত সেইটে বলবে তো!'

ফেলুদা বলল, 'দু'বার মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে, একবার ফণী মিত্তিরের বাড়ি, একবার নেপাল কিউরিও শপ, একবার লাইব্রেরী, আর আরো কয়েকটা জায়গায়।'

'ও।'

'আর কিছু জানতে চাস?'

'আপরাধী কে বুঝতে পেরেছ?'

'এখনও বলার সময় আসেনি।'

'কাউকে সন্দেহ করেছ?'

'ভালো ডিটেক্‌টিভ হলে প্রত্যেককেই সন্দেহ করতে হয়।'

'প্রত্যেককে মানে?'

'এই ধর—তুই।'

'আমি?'

'যার কাছে এই মুখোশ আছে, সে-ই সন্দেহের পাত্র, সে যে-লোকই হোক।'

'তাহলে তুমিই বা বাদ যাবে কেন?'

'বেশি বাজে বকিস্‌নি।'

'বারে—তুমি যে রাজেনবাবুকে আগে চিনতে সে কথা তো গোড়ায় বলনি। তার মানে সত্য গোপন করেছ। আর আমার মুখোশও ইচ্ছে করলে তুমিও ব্যবহার করতে পার--হাতের কাছেই থাকে।'

'শাটাপ্‌, শাটাপ্‌!'

রাজেনবাবুকে এ বেলা দেখে তবু অনেকটা ভালো লাগল। কেমন আছেন জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'দুপুরের দিকটা বেশ ভালো বোধ করেছিলাম। যত সন্ধে হয়ে আসছে ততই যেন কেমন অসোয়াস্তি লাগছে।'

ফেলুদা তিনকড়িবাবুর দেওয়া প্যাকেটটা রাজেনবাবুকে দিল। সেটা খুলে তার থেকে একটা চমৎকার বুদ্ধের মাথা বের হল। সেটা দেখে রাজেনবাবুর চোখ ছলছল করে এল। ধরা গলায় বললেন, 'খাশা জিনিস, খাশা জিনিস!'

ফেলুদা বলল 'পুলিশ থেকে লোক এসেছিল?'

'আর বোল না। এসে বত্রিশ রকম জেরা করলে। কদ্দুর কি হদিস পাবে জানি না, তবে আজ থেকে বাড়িটা ওয়াচ করার জন্য লোক থাকবে, সেই যা নিশ্চিন্তি। সত্যি বলতে কি, তোমরা হয়ত না এলেও চলত।'

ফেলুদা বলল, 'স্যানাটোরিয়ামে বড্ড গোলমাল। এখানে হয়ত চুপচাপ আপনার কেসটা নিয়ে একটু ভাবতে পারব।'

রাজেনবাবু হেসে বললেন, 'আর তাছাড়া আমার চাকরটা খুব ভালো রান্না করে। আজ মুরগীর মাংস রাঁধতে বলেছি। স্যানেটোরিয়ামে অমনটি খেতে পাবে না।'

রাজেনবাবু আমাদের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

ফেলুদা সটান খাটের উপর শুয়ে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাগ করে পর পর পাঁচটা ধোয়ার রিং ছাড়ল।

তারপর আধবোজা চোখে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ফণী মিত্তির কাল সত্যিই রুগী দেখতে গিয়েছিলেন। কার্টরোডে একজন ধনী পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী। আমি খোঁজ নিয়েছি। সাড়ে এগারটা থেকে সাড়ে বারোটা অবধি ওখানে ছিলেন।'

'তাহলে ফণী মিত্তির অপরাধী নন?'

ফেলুদা আমার কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'প্রবীর মজুমদার ষোল বচ্ছর ইংলন্ডে থেকে বাংলা প্রায় ভুলেই গেছেন।'

'তাহলে ওই চিঠি ওর পক্ষে লেখা সম্ভব নয়?'

'আর ওর টাকার কোন অভাবই নেই। তাছাড়া দার্জিলিং-এ এসেও লেবঙে ঘোড়াদৌড়ের বাজিতে উনি অনেক টাকা করেছেন।'

আমি দম আটকে বসে রইলাম। ফেলুদার আরো কিছু বলার আছে সেটা বুঝতে পারছিলাম।

আধ খাওয়া জ্বলন্ত সিগারেটটা ক্যারমে ঘুটি মারার মত করে প্রায় দশ হাত দূরের জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে ফেলুদা বলল, 'আজ চা বাগানের গিলমোর সাহেব দার্জিলিং-এ এসেছে। প্লান্টারস ক্লাবে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। লামার প্রাসাদের আসল ঘন্টা একটাই আছে, আর সেটা গিলমোরের কাছে। রাজেনবাবুরটা নকল। অবনী ঘোষাল সেটা জানে।'

'তাহলে রাজেনবাবুর ঘন্টা তেমন মূল্যবান নয়?'

'না।...আর অবনী ঘোষাল কাল রাত্রে একটা পার্টিতে প্রবীর মজুমদারের সঙ্গে রাত ন'টা থেকে ভোর তিনটে অবধি মাতলামি করেছে।'

'ও। আর মুখোশ পড়া লোকটা এসেছিল বারোটার কিছু পরেই।'

'হ্যাঁ।'

আমার বুকের ভেতরটা কেমন খালি খালি লাগছিল। বললাম, 'তাহলে?'

ফেলুদা কিছু না বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খাট থেকে উঠে পড়ল। ওর ভুরু দুটো যে এতোটা কুঁচকাতে পারে তা আমার জানাই ছিল না।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন ভেবে ফেলুদা বৈঠকখানার দিকে চলে গেল। যাবার সময় বলল, 'একটু একা থাকতে চাই। ডিস্‌টার্ব করিস না।'

কী আর করি। এবার ওর জায়গায় আমি বিছানায় শুলাম।

সন্ধে হয়ে আসছে। ঘরের বাতিটা আর জ্বালাতে ইচ্ছে করল না। খোলা জানালা দিয়ে অবজারভেটরি হিলের দিকটায় অন্যান্য বাড়ির আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। বিকেলে ম্যাল থেকে একটা গোলমালের শব্দ পাওয়া যায়। এখন সেটা মিলিয়ে আসছে। একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলাম। দূর থেকে কাছে এসে আবার মিলিয়ে গেল।

সময় চলে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে শহরের আলো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। বোধহয় কুয়াশা হচ্ছে। ঘরের ভিতরটা এখন যেন আরো অন্ধকার। একটা ঘুম ঘুম ভাব আসছে মনে হল।

চোখের পাতা দুটো কাছাকাছি এসে গেছে এমন সময় মনে হল কে যেন ঘরে ঢুকছে।

মনে হতেই এমন ভয় হল যে, যেদিক থেকে লোকটা আসছে সেদিকে না তাকিয়ে আমি জোর করে নিশ্বাস বন্ধ করে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু লোকটা যে আমার দিকেই আসছে—আর আমার সামনেই এসে দাঁড়ালো যে!

জানালার বাইরে শহরের দৃশ্যটা ঢেকে দিয়ে একটা অন্ধকার কী যেন এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে।

তারপর সেই অন্ধকার জিনিসটা নিচু হয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল।

এইবার তার মুখটা আমার মুখের সামনে, আর সেই মুখে একটা—মুখোশ!

আমি যেই চীৎকার করতে যাবো অমনি অন্ধকার শরীরটার একটা হাত উঠে গিয়ে মুখোশটা খুলতেই দেখি—ফেলুদা!

'কি রে—ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি?'

'ও—ফেলুদা—তুমি?'

'তা আমি না তো কে? তুই কি ভেবেছিলি...?'

ফেলুদা ব্যাপারটা বুঝে একটা অট্টহাস্য করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর খাটের পাশটায় বসে বলল, 'রাজেনবাবুর মুখোশগুলো সবকটা পরে দেখছিলাম। তুই এইটে একবার পর তো।'

ফেলুদা আমাকে মুখোশটা পরিয়ে দিল।

'অস্বাভাবিক কিছু লাগছে কি?'

'কই না তো। আমার পক্ষে একটু বড়, এই যা।'

'আর কিচ্ছু না? ভালো করে ভেবে দেখ তো।'

'একটু...একটু যেন...গন্ধ।'

'কিসের গন্ধ ?'

'চুরুট।'

ফেলুদা মুখোশটা খুলে বলল, 'এগজ্যাক্টলি।'

আমার বুকের ভেতরটা আবার ঢিপ ঢিপ করছিল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'তিনকড়িবাবু ?'

ফেলুদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সুযোগের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি ছিল এঁরই। বাংলা উপন্যাস, খবরের কাগজ, ব্লেড, আঠা কোনটারই অভাব নেই। আর তুই লক্ষ্য করেছিলি নিশ্চয়ই—স্টেশনে আজ যেন একটু খোঁড়াচ্ছিলেন। সেটা বোধহয় কাল জানালার বাইরে লাফিয়ে পড়ার দরুন। কিন্তু আসলে যেটা রহস্য, সেটা হল—কারণটা কী ? রাজেনবাবুকে তো মনে হয় রীতিমত সমীহ করতেন ভদ্রলোক। তাহলে কী কারণে, কী উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই চিঠি লিখেছিলেন ? এটার উত্তর বোধহয় আজ জানা যাবে না...কোনদিনও না।'

রাত্রে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।

সকালে খাবার ঘরে বসে রাজেনবাবুর সঙ্গে চা খাচ্ছি, এমন সময় নেপালী চাকরটা একটা চিঠি নিয়ে এল। আবার নীল কাগজ—আর খামের উপর দার্জিলিং পোস্ট মার্ক।

রাজেনবাবু ফ্যাকাশে মুখ করে কাঁপতে কাঁপতে চিঠির ভাঁজ খুলে ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, 'তুমিই পড়। আমার সাহস হচ্ছে না।'

ফেলুদা চিঠিটা নিয়ে জোরে জোরে পড়ল। তাতে লেখা আছে—

'প্রিয় রাজু,

কলকাতায় জ্ঞানেশের কাছ থেকে তোমার ঘরের খবর পেয়ে যখন তোমায় চিঠি লিখি তখনও জানতাম না আসলে তুমি কে। তোমার বাড়িতে এসে তোমার ছেলেবয়সের ছবিখানা দেখেই চিনেছি তুমি সেই পঞ্চাশ বছর আগের বাঁকুড়া মিশনারি স্কুলের আমারই সহপাঠি রাজু!

এতকাল পরেও যে পুরোন আক্রোশ চাগিয়ে উঠতে পারে সেটা আমার জানা ছিল না। অন্যায় ভাবে ল্যাং মেরে তুমি যে শুধু আমায় হাড্রেড ইয়ার্ডস-এর নিশ্চিত পুরস্কার ও রেকর্ড থেকে বঞ্চিত করেছিলে তা নয়—আমাকে রীতিমত জখমও করেছিলে। বাবা বদলি হলেন তখনই, তাই তোমার সঙ্গে বোঝাপড়াও হয়নি, আর তুমিও আমার মন আর শরীরের কষ্টের কথা জানতে পার নি। তিনমাস পায়ে প্লাস্টার লাগিয়ে হাসপাতালে পড়েছিলাম।

এখানে এসে তোমার জীবনের শান্তিময় পরিপূর্ণতার ছবি আমাকে অশান্ত করেছিল। তাই তোমার মনে খানিকটা সাময়িক উদ্বেগের সঞ্চার করে তোমার সেই প্রাচীন অপরাধের শাস্তি দিলাম। শুভেচ্ছা নিও।

ইতি—তিনু

(শ্রী তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়)

প্রো ফে স র হি জি বি জ্ বি জ্

আমার ঘটনাটা কেউ বিশ্বাস করবে বলে বিশ্বাস হয় না। না করুক—তাতে কিছু এসে যায় না। নিজে চোখে না দেখা অবধি অনেকেই অনেক কিছু বিশ্বাস করে না। যেমন ভূত। আমি অবিশ্যি ভূতের কথা লিখতে বসিনি। সত্যি বলতে কি, এটাকে যে কিসের ঘটনা বলা চলে সেটা আমি নিজেই জানি না। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে আর আমার জীবনেই ঘটেছে। তাই আমার কাছে সেটা সত্যি, আর তাই সেটার বিষয় লেখা আমার কাছে খুবই স্বাভাবিক।

আগেই বলে রাখি, যাকে নিয়ে এই ঘটনা তাঁর আসল নামটা আমি জানি না। তিনি বললেন তাঁর কোনো নামই নেই। শুধু তাই না, নাম নিয়ে একটা ছোটখাটো লেকচারই দিয়ে ফেললেন আমাকে। বললেন—

'নাম দিয়ে কী হবে মশাই ? নাম একটা ছিল এককালে। সেটার আর প্রয়োজন নেই বলে বাদ দিয়ে দিয়েছি। আপনি এলেন, আলাপ করলেন, নিজের নামটা বললেন, তাই নামের প্রশ্নটা উঠছে। এমনিতে কেউ ত আসে না, আর তার মানে কারুর আমাকে নাম ধরে ডাকার প্রয়োজনও হয় না। চেনাশোনা কেউ নেই, কাউকে চিঠিপত্র লিখি না, কাগজে লেখা ছাপাই না, ব্যাঙ্কে চেক সই করি না—কাজেই নামের প্রশ্নটাই আসে না। একটা চাকর আছে, সেটাও বোবা। বোবা না হলেও সে নাম ধরে ডাকত না; বলত বাবু। ব্যস্ ফুরিয়ে গেল। এখন কথা উঠতে পারে আপনি কী বলে ডাকবেন। এটা নিয়েই ভাবছেন ত ?....

শেষটায় অবিশ্যি তাকে প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্ বলে ডাকাই ঠিক হল। কেন, সেটা পরে সময় মতো বলছি। আগে একটু গোড়ার কথা বলে নেওয়া দরকার।

ঘটনাটা ঘটে গোপালপুরে। উড়িষ্যার গঞ্জম ডিস্‌ট্রিক্টে বহরমপুর স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে একটি ছোট্ট শহর গোপালপুর। গত তিন বছর আপিসের কাজের চাপে ছুটি নেওয়া হয়নি। এবার তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এই না-দেখা অথচ নাম-শোনা জায়গাটাতেই যাওয়া স্থির করলাম। আপিসের

কাজের বাইরে আমার আরেকটা কাজ আছে, সেটা হলো অনুবাদের কাজ। আজ পর্যন্ত আমার করা সাতখানা ইংরিজি রহস্য উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ বাজারে বেরিয়েছে। প্রকাশক বলেন বইগুলোর কাটতি ভাল। কতকটা তাঁরই চাপে নিতে হয়েছে ছুটিটা। এই তিন সপ্তাহের মধ্যে একটা বই অনুবাদ করার দায়িত্ব আমার স্কন্ধে রয়েছে।

গোপালপুরে আগে কখনো আসিনি। বাছাইটা যে ভালোই হয়েছে সেটা প্রথম দিন এসেই বুঝেছি। এমন নিরিবিলি অথচ মনোরম জায়গা কমই দেখেছি। নিরিবিলি আরো এই জন্যে যে এটা হল অফ্ সীজ্‌ন—এপ্রিল মাস। হাওয়া-বদলের দল এখনো এসে পৌছয়নি। যে হোটেলে এসে উঠেছি, তাতে আমি ছাড়া আছেন আর একটি মাত্র প্রাণী—এক বৃদ্ধ আর্মেনিয়ান—নাম মিস্টার অ্যারাটুন। তিনি থাকেন হোটেলের পশ্চিম প্রান্তের একটা ঘরে, আর আমি থাকি পূর্ব প্রান্তে। হোটেলের লম্বা বারান্দার ঠিক নীচ থেকেই শুরু হয়েছে বালি; একশো গজের মধ্যেই সমুদ্রের ঢেউ এসে সেই বালির উপর আছড়ে পড়ছে। লাল কাঁকড়াগুলো মাঝে মাঝে বারান্দায় উঠে এসে ঘোরাফেরা করে। সন্ধ্যায় ঘন্টা দুয়েকের জন্য কাজ বন্ধ রেখে বালির উপর হাঁটতে বেরোই।

প্রথম দুদিন সমুদ্রের তীর ধরে পশ্চিম দিকটায় গেছি; তৃতীয় দিন মনে হল এবার পূর্ব দিকটাতেও যাওয়া দরকার। বালির ওপর আদ্যিকালের নোনাধরা পোড়া বাড়িগুলো ভারী অদ্ভুত লাগে। মিস্টার অ্যারাটুন বলছিলেন এগুলো নাকি প্রায় তিন-চারশ বছরের পুরোন। এককালে গোপালপুর নাকি ওলন্দাজদের একটা ঘাঁটি ছিল। এ সব বাড়ির বেশির ভাগই নাকি সেই সময়কার। দেয়ালের ইটগুলো চ্যাপটা আর ছোট ছোট, দরজা জানালার বাকি রয়েছে শুধু ফাঁকগুলো, আর ছাত বলতেও ছাউনির চেয়ে ফাঁকটাই বেশি। একটা বাড়ির ভিতর ঢুকে দেখেছি, ভারী থমথমে মনে হয়।

পূর্ব দিকে কিছুদূর গিয়ে দেখলাম এক জায়গায় বালির অংশটা অনেকখানি চওড়া হয়ে গেছে, আর তার ফলে শহরটাও সমুদ্র থেকে অনেকটা পিছিয়ে গেছে। প্রায় সমস্ত জায়গাটা জুড়ে কাত করে শোয়ানো রয়েছে অন্তত শ'খানেক নৌকা। বুঝলাম এইগুলোতেই নুলিয়ারা সকালে সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরোয়। নুলিয়াগুলোকেও দেখলাম এখানে ওখানে বসে জটলা করছে, কিছু বাচ্চা নুলিয়া জলের কাছটাতে গিয়ে কাঁকড়া ধরছে, খানচারেক শুয়োর এদিকে ওদিকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেড়াচ্ছে।

এরই মধ্যে আবার দেখলাম একটা উপুড় করা নৌকার ওপর বসে আছেন দুটি প্রৌঢ় বাঙালি ভদ্রলোক। একজনের চোখে চশমা, তিনি হাতে একটি বাঙলা খবরের কাগজ হাওয়ার মধ্যে ভাঁজ করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন।

আরেকজন বুকের কাছে হাত দুটোকে জড়ো করে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বিড়ি খাচ্ছেন। আমি একটু কাছে যেতে কাগজওয়ালা ভদ্রলোকটি সেধে আলাপ করার ভঙ্গিতে বললেন—

'নতুন এলেন ?'

'হ্যাঁ...এই..দুদিন...'

'সাহেব হোটেলে উঠেছেন ?'

আমি একটু হেসে বললাম, 'আপনারা এখানেই থাকেন ?'

ভদ্রলোক এতক্ষণে কাগজটাকে সামলাতে পেরেছেন। বললেন, 'আমি থাকি। ছাব্বিশ বছর হল গোপালপুরে। নিউ বেঙ্গলিটা আমারই হোটেল। ঘনশ্যামবাবু অবিশ্যি আপনার মতো চেঞ্জে এসেছেন।'

আমি 'আচ্ছা' বলে আলাপ শেষ করে এগোতে যাব এমন সময় ভদ্রলোক আরেকটা প্রশ্ন করে বসলেন—

'ওদিকটায় যাচ্ছেন কোথায় ?'

বললাম, 'এমনি....একটু বেড়াব আর কি।'

'কেন বলুন ত ?'

আচ্ছা মুশকিল ত! বেড়াতে যাচ্ছি কেন সেটাও বলতে হবে ?

ভদ্রলোক ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আলো কমে আসছে। আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা কাল্‌চে নীল মেঘের চাব্‌ড়া জমাট বাঁধছে। ঝড় হবে নাকি ?

ভদ্রলোক বললেন, 'বছরখানেক আগে হলে কিছু বলার ছিল না। যেখানে মন চায় নির্ভয়ে ঘুরে আসতে পারতেন। গত সেপ্টেম্বরে পূর্ব দিকে নুলিয়া বস্তি ছাড়িয়ে মাইলখানেক দূরে একটি প্রাণী এসে আস্তানা গেড়েছেন। ওই পোড়াবাড়িগুলো দেখছেন, ওরই মতন একটা বাড়িতে। আমি অবশ্য নিজে দেখিনি সে বাড়ি। এখানকার পোস্টমাস্টার মহাপাত্র বলছিল দেখেছে।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'সাধু-সন্নাসী গোছের কেউ ?'

'আদপেই না।'

'তবে ?'

'তিনি যে কী সেটা মশাই জানতে পারিনি। মহাপাত্র বললে বাড়িটার ফাটাফুটো নাকি সব তেরপল দিয়ে ঢেকে ফেলেছে। ভেতরে কী হয় কেউ জানে না। তবে ছাতের একটা ফুটো দিয়ে বেগুনি ধোঁয়া বেরোতে দেখা গেছে। বাড়িটা না দেখলেও লোকটাকে আমি নিজে দেখেছি দুবার। আমি ঠিক এইখেনটেতেই বসে, আর ও হেঁটে যাচ্ছিল আমার ঠিক সামনে দিয়েই। পরনে হল্‌দে রঙের কোট প্যান্টুলুন। গোঁফ দাড়ি নেই, মাথায় গুচ্ছের ঝাঁকড়া চুল।

হাঁটবার সময় কী জানি বিড়বিড় করছিল আপন মনে। এমনকি একবার যেন গলা ছেড়ে হাসতেও শুনলাম। কথা বললুম, কথার জবাব দিলে না। হয় অভদ্র নয় পাগল। বোধহয় দুটোই। ওনার আবার একটি চাকরও আছে। তাকে অবিশ্যি সকালের দিকটায় বাজারে দেখা যায়। এমন সণ্ডামার্কা লোক দেখিনি মশাই। মাথায় কদম ছাঁট চুল। ঘাড়েগর্দানে চেহারা। কতকটা ওই শুয়োরের মতোই। লোকটা হয় বোবা নয় মুখ বন্ধ করে থাকে। জিনিস কেনার সময়ও মুখ খোলে না। দোকানদারকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেয়। মনিব যেমন লোকই হোন না কেন, অমন চাকর যে বাড়িতে আছে, তার কাছাকাছি না যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি ?'

ঘনশ্যাম ভদ্রলোকটিও ইতিমধ্যে ওঠে পড়েছেন। বিড়িটাকে বালির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'চলুন মশাই।' দুই ভদ্রলোক তাদের হোটেলের দিকে রওয়ানা দেবার আগে ম্যানেজারবাবুটি জানিয়ে গেলেন যে তাঁর নাম রাধাবিনোদ চাটুজ্যে, এবং আমি একবার তাঁর হোটেলে পায়ের ধুলো দিলে তিনি খুবই খুশী হবেন।

রহস্য গল্প অনুবাদ করে করে রহস্য সম্পর্কে যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আমার মনে গড়ে উঠেছে সেটা ত আর নিউ বেঙ্গলি হোটেলের ম্যানেজারবাবু জানেন না! আমি বাড়ি ফেরার কথা একবারও চিন্তা না করে পূর্বদিকেই আরো এগোতে লাগলাম।

এখন ভাটার সময়। সমুদ্রের জল পিছিয়ে গেছে। ঢেউও অল্প। পাড়ের যেখানে এসে ঢেউ ফেনা কাটছে, তার কাছেই কয়েকটা কাক লাফালাফি করছে, ফেনাগুলো সরসর করে এগিয়ে এসে পিছিয়ে যাচ্ছে, আর তারপরেই ফেনার বুড়বুড়িতে ঠোকর দিয়ে কাকগুলো কী যেন খাচ্ছে। নুলিয়া গ্রাম ছাড়িয়ে মিনিট দশেক হাঁটার পার দূর থেকে ভিজে বালির ওপর একটা চলন্ত লাল চাদর দেখে প্রথমটা বেশ হক্‌চকিয়ে গিয়েছিলাম; কাছে গিয়ে বুঝলাম সেটা একটা কাঁকড়ার পাল, জল সরে যাওয়াতে দলে দলে তাদের বাসায় ফিরে যাচ্ছে।

আর পাঁচ মিনিট পথ যেতেই বাড়িটাকে দেখতে পেলাম। তেরপলের তাপ্পির কথা আগেই শুনেছিলাম, তাই চিনতে অসুবিধা হল না। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি শুধু তেরপল নয়, বাঁশ, কাঠের তক্তা, মর্চে ধরা করুগেটেড টিন, এমনকি পেস্ট বোর্ডের টুকরো পর্যন্ত বাড়ি মেরামতের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। দেখে মনে হল, এক যদি ছাত ভেদ করে বৃষ্টির জল না পড়ে, তাহলে এ বাড়িতে একজন লোকের পক্ষে থাকা এমন কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই লোকটি কোথায় ?

মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে মনে হল, সে যদি সত্যিই ছিটগ্রস্ত হয়, আর তার যদি সত্যিই একটা ষণ্ডামার্কা চাকর থেকে থাকে, তাহলে আমি যেভাবে উঁ

কৌতূহল নিয়ে বাড়িটার দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখছি, সেটা বোধহয় খুব বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে না। তার চেয়ে কিছুটা দূরে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করলে কেমন হয় ? অ্যাদ্দূরে এসে লোকটাকে একবার অন্তত চোখের দেখা না দেখেই ফিরে যাব ?

এই সব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ খেয়াল হল যে বাড়ির সামনের দরজার ফাঁকটার পিছনে অন্ধকারের মধ্যেই কী যেন একটা নড়ে উঠল। আর তারপরই একটি ছোট্টখাট্টো বেঁটে লোক বাইরে বেরিয়ে এলো। বুঝতে বাকি রইল না যে ইনিই বাড়ির মালিক, আর ইনি বেশ কিছুক্ষণ থেকেই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

'আপনার হাতে যে ছ'টা আঙুল দেখছি!—হেঃ হেঃ!' হঠাৎ মিহি গলায় কথা এল।

কথাটা ঠিকই। আমার হাতে বুড়ো আঙুলের পাশে জন্ম থেকেই একটা বাড়তি আঙুল রয়েছে যেটা কোনো কাজ করে না। কিন্তু ভদ্রলোক অতদূর থেকে সেটা বুঝলেন কী করে ?

এবার আরো কাছে এলে পরে তবে বুঝলাম তাঁর হাতে রয়েছে একটা আদ্যিকালের একচোখা দূরবীণ, আর সেইটে দিয়েই নির্ঘাৎ এতক্ষণ তিনি আমাকে স্টাডি করছিলেন।

'অন্যটা নিশ্চয় বুড়ো আঙুল ? তাই নয় কি ? হেঃ হেঃ!'

ভদ্রলোকের গলার স্বর অত্যন্ত মিহি। এত বয়সের লোকের এমন গলা আমি কক্ষনো শুনিনি।

'আসুন না—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?'

কথাটা শুনে আমি রীতিমতো অবাক হলাম। রাধাবিনোদবাবুর কথায় আমার লোকটা সম্পর্কে একেবারে অন্যরকম ধারণা হয়েছিল; এখন দেখছি দিব্যি খোশমেজাজী ভদ্র ব্যবহার।

আমার চেয়ে এখনো হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক। সন্ধ্যার আলোতে তাঁকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলাম না, দেখার ইচ্ছেটাও প্রবল, তাই তাঁর অনুরোধে আপত্তি করলাম না।

'একটু সাবধানে, আপনি লম্বা মানুষ, আমার দরজাটা আবার...'

হেঁট হয়ে মাথা বাঁচিয়ে ভদ্রলোকের আস্তানায় প্রবেশ করা গেল। একটা পুরোন মেটে গন্ধের সঙ্গে স্যাঁতসেঁতে গন্ধ আর আরেকটা কী জানি অচেনা গন্ধ মিশে এই পাঁচমেশালী জোড়াতালি বাড়ির সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেছে।

'বাঁদিকে আসুন। ডানদিকটা আমার—হেঃ হেঃ—কাজের ঘর।'

ডানদিকের দরজার ফাঁকটা দেখলাম একটা বড়ো কাঠের তক্তা দিয়ে বেশ পোক্তভাবেই বন্ধ করা হয়েছে। আমরা বাঁদিকের ঘরে ঢুকলাম। এটাকে বোধহয়

বৈঠকখানা বলা চলে। এক কোণে একটা কাঠের টেবিলের উপর কিছু মোটা মোটা খাতাপত্র, গোটাতিনেক কলম, একটা দোয়াত, একটা আঠার শিশি, একটা বড় কাঁচি। টেবিলের সামনে একটা মর্চে ধরা টিনের চেয়ার, এক পাশে একটা বড় উপুর করা প্যাকিং কেস, আর ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট চেয়ার। এই শেষের আসবাবটি থাকা উচিত ছিলো কোনো রাজবাড়ির বৈঠকখানায়। জাঁদরেল কাঠের উপর জাঁদরেল কারুকার্য, বসবার জায়গায় গাঢ় লাল মখমলের ওপর ফুলকারি।

'আপনি ওই বাক্সটায় বসুন, আমি চেয়ারে বসছি।'

এই প্রথম একটা খট্‌কা লাগল। লোকটা বদ্ধ পাগল না হলেও, একটু বেয়ারা রকমের খামখেয়ালী ত বটেই। তা না হলে একজন বাইরের লোককে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে প্যাকিং বাক্সে বসতে দিয়ে নিজে সিংহাসনে বসে ?

অথচ জানালায় তেরপলের ফাঁক দিয়ে আসা আলোতে ত তাঁর চোখে কোনো পাগলামির লক্ষণ দেখছি না। বরং বেশ একটা ছেলেমানুষী হাসিখুশি ভাব। আর সেই কারণেই লোকটার বেয়াড়া অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর উপর কোনো বিরক্তির ভাব এল না। আমি প্যাকিং কেসটার উপরে বসলাম।

'তারপর বলুন', ভদ্রলোক বললেন।

কী বলব ? আসলে ত কিছুই বলতে আসিনি, শুধু দেখতেই এসেছিলাম, তাই ফস্ করে বলুন বললে বেশ মুশকিলেই পড়তে হয়। শেষটায় আর কিছু ভেবে না পেয়ে নিজের পরিচয়টাই দিয়ে ফেললাম—

'আমি এসেছি ছুটিতে, কলকাতা থেকে। আমি, মানে, একজন লেখক। আমার নাম হিমাংশু চৌধুরী। এদিকে এসেছিলাম বেড়াতে, আপনার বাড়িটা চোখে পড়ল...'

'বেশ বেশ। পরিচয়টা পেয়ে খুশি হলাম। তবে আমার কিন্তু নামটাম নেই।'

আবার খট্‌কা। নাম নেই মানে ? নাম ত একটা সকলেরই থাকে; এনার বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন ?

কথাটা তাঁকে জিগ্যেস করতেই ভদ্রলোক নামের উপর লেকচারটা দিয়ে দিলেন। সেটা শেষ হবার পর আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন, 'আমার কথাগুলো বোধহয় আপনার মনঃপূত হল না। একটা কথা তাহলে বলি আপনাকে—আমি নিজে কিন্তু মনে মনে আমার একটা নাম ঠিক করে রেখেছি। অবিশ্যি নামটা কাউকে বলিনি, কিন্তু আপনার কিনা ছ'টা আঙুল তাই আপনাকে বলতে আপত্তি নেই।'

আমি ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে রইলাম। ঘরে আলো ক্রমশঃ কমে আসছে। চাকরটাকে দেখছি না কেন ? অন্তত একটা মোমবাতি বা কেরোসিনের আলোতে এই সময় ঘরে এনে রাখা উচিত।

ভদ্রলোক এবার হঠাৎ তার মাথাটা একপাশে ঘুরিয়ে বললেন, 'আমার কানটা লক্ষ্য করেছেন কি ?'

এতক্ষণ করিনি, কিন্তু এবার চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম।

মানুষের এরকম কান আমি কক্ষনো দেখিনি। উপর দিকটা গোল না হয়ে ছুঁচোল—ঠিক যেমন শেয়াল কুকুরের হয়। এরকম হল কী করে ?

কান দেখিয়ে আমার দিকে ফিরে ভদ্রলোক হঠাৎ আরেকটা তাজ্জব ব্যাপার করে বসলেন, তাঁর নিজের মাথার চুলটা ধরে দিলেন এক টান, আর তার ফলে সেটা হাতে খুলে এল। অবাক হয়ে দেখি—ব্রহ্মতালুর কাছে আর কানের পাশটাতে ছাড়া সারা মাথার কোথাও এক গাছি চুল নেই। এই নতুন চেহারা, আর তার সঙ্গে মিটিমিটি চাহনিতে দুষ্টু হাসির ভাব দেখে আমার মুখ থেকে আপনা থেকেই একটা নাম বেরিয়ে পড়ল,—'হিজিবিজ্‌বিজ্‌!'

'এক্‌জ্যাক্‌টলি!' ভদ্রলোক হাততালি দিয়ে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলেন। 'আপনি ইচ্ছে করলে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন।'

বললাম, 'দরকার নেই। হিজিবিজ্‌বিজের চেহারা ছেলেবেলা থেকেই মনে গেঁথে আছে।'

'বেশ, বেশ! বেশ আপনি চান ত স্বচ্ছন্দে এ নামটা ব্যবহার করতে পারেন। এমনকি নামটার আগে একটা প্রোফেসর জুড়ে দিলে আরো ভালো হয়। অবশ্য এটা কাউকে বলবেন না। যদি বলেন তাহলে কিন্তু—হেঃ হেঃ হেঃ...'

এই প্রথম যেন আমার একটু ভয় ভয় করতে লাগল। লোকটা নিঃসন্দেহে পাগল। কিম্বা বেয়াড়া রকমের ছিটগ্রস্ত। এ ধরনের লোককে বরদাস্ত করা ভারী কঠিন। সব সময়ই কী করবে ভেবে তটস্থ হয়ে থাকতে হয়।

দুজনের এক সঙ্গে চুপ থাকাটাও ভালো লাগছিল না; তাই বললাম, 'আপনার কানের ছুঁচোল অংশটার রং একটু অন্য রকম বলে মনে হচ্ছে ?'

'তা ত হবেই', ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা ত আর আমার নিজের নয়। জন্মের সময় ত আর আমার এরকম কান ছিল না।'

'তাহলে কি ওটা আপনার চুলের মতোই নকল ? টানলে খুলে আসবে নাকি ?'

ভদ্রলোক আবার সেই খিল্‌খিলে হাসি হেসে বললেন, 'মোটেই না, মোটেই না, মোটেই না!'

নাঃ। লোকটা নির্ঘাৎ পাগল। বললাম, 'তাহলে ওটা কী ?'

'দাঁড়ান! আগে আমার চাকরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। একেও হয়ত আপনি চিনতে পারবেন।'

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি; কোন ফাঁকে জানি আরেকটি লোক পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে একটা কেরোসিনের বাতি। এই সেই চাকর, যার কথা রাধাবিনোদবাবু বলেছিলেন।

ভদ্রলোক হাতছানি দিয়ে ডাকলেন পর সে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর কেরোসিনের বাতিটা রাখল। সত্যিই, এরকম ষণ্ডামার্কা লোক এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। লোকটার গায়ে একটা ডোরাকাটা ফতুয়া আর একটা খাটো করে পরা ধুতি। পায়ের গুলি, হাতের মাস্‌ল, কব্‌জির বেড়, বুকের ছাতি, আর গর্দানের বহর দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। অথচ লম্বায় লোকটা পাঁচ ফুট দু'তিন ইঞ্চির বেশি নয়।

'কারুর কথা মনে পড়ছে কি আমার চাকরকে দেখে ?' জিগ্যেস করলেন হিজিবিজ্‌বিজ্‌।

লোকটা বাতি নামিয়ে রেখেই তার মনিবের দিকে ফিরে আদেশের অপেক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মিনিটখানেক তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মিলটা মনে পড়ে গেল। অবাক হয়ে বললাম, 'আরে, এ যে ষষ্ঠিচরণ!'

'ঠিক ধরেছেন, টিক ধরেছেন!' ভদ্রলোক খুশিতে যেন বসে বসেই নেচে উঠলেন।

'খেলার ছলে ষষ্ঠিচরণ হাতি লোফেন যখন তখন
দেহের ওজন উনিশটি মণ, শক্ত যেন লোহার গঠন....'

অবিশ্যি ওর ওজন ঠিক উনিশ মণ নয়, সাড়ে তিনের একটু বেশি। অন্তত সিক্সটি সেভেনে তাই ছিল। আর হাতি লোফাটার কথা জানি না, কিন্তু এখানে এসে অবধি ও প্রতিদিন সকালে দুটো আস্ত ধেড়ে শুয়োর নিয়ে লোফালুফি করে, এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। এই যে আমার চেয়ারটা, এটা ত ও এক হাতে তুলে নিয়ে এসেছে।'

'কোত্থেকে ?'

'হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ, সেটা আর নাই শুনলেন। যাও ত ষষ্ঠি—দুটো ডাব নিয়ে এস ত আমাদের জন্য।'

ষষ্ঠি আজ্ঞা পালন করতে চলে গেল।

বাইরে মেঘের গর্জন। একটা দম্‌কা হাওয়ায় তেরপলগুলো পট্‌ পট্‌ শব্দে নড়ে উঠল। এইবারে না উঠলে দুর্যোগে পড়তে হতে পারে।

'আমার কানটার কথা জিগ্যেস করছিলেন না ?' ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা আসলে একটা বনবেড়ালের কান আর আমার ওরিজিন্যাল কান মিশিয়ে তৈরি।'

কথাটা শুনে হাসিই পেয়ে গেল। বললাম, 'মেশালেন কী করে ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'কেন—একটা মানুষের হৃৎপিণ্ড আরেকটা শরীরে বসিয়ে দিচ্ছে, আর একটা জানোয়ারের আধখানা মাত্র কান একটা মানুষের কানের ওপর বসিয়ে দেওয়া যাবে না ?'

'আপনি কি আগে ডাক্তারি করতেন ? প্লাস্টিক সার্জারি জাতীয় কিছু ?'

'তা ত বটেই। করতাম কেন—এখনো করি, হেঃ হেঃ। তবে সে যেমন তেমন প্লাস্টিক সার্জারি নয়। এই যেমন ধরুন—আপনার ওই যে বাড়তি বুড়ো আঙুলটা—ওটা যদি আপনার না থাকত, তাহলে প্রয়োজনে ওটা লাগিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে হত জলের মত সোজা।'

লোকটাকে অনেক চেষ্টা করলাম বড় ডাক্তার হিসাবে কল্পনা করতে, কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। অথচ কানটার দিকে চোখ গেলে সত্যিই ভারী অদ্ভুত লাগছিল। কী বেমালুমভাবে জোড়া লাগিয়েছে! বোঝার কোনো উপায় নেই।

ভদ্রলোক বললেন, 'ডাক্তার আর বিজ্ঞানের বই ছাড়া জীবনে কেবল মাত্র দুটি বই পড়েছি আমি—আবোল-তাবোল আর হ-য-ব-র-ল। আর দুটোর মধ্যেই যে ব্যাপারটা আমার সবচেয়ে মনে ধরেছে সেটা হচ্ছে ওই প্রাণীগুলো—যাদের বলা হয় আজগুবি কিম্ভুত। এই যে সাধারণের বাইরে কিছু হলে বা করলে বা বললেই লোকে পাগলামি আর আজগুবি বলে উড়িয়ে দেয়, এটার কোনো মানেই হয় না। আমি ছেলেবেলা মোমবাতি চুষে খেতাম, জানেন। দিব্যি লাগে খেতে। আর মাছি যে কত খেয়েছি ধরে ধরে তার কোনো গোনা গুন্‌তি নেই।'

ষষ্ঠিচরণ ডাব নিয়ে এসেছে, তাই ভদ্রলোককে একটু থামতে হল। কলাইকরা গেলাস টেবিলের উপর রেখে তার উপর একটার পর একটা ডাব ধরে দু'হাতের তেলো দিয়ে চাপ দিতেই সেগুলো মট্‌মট্‌ করে ভেঙে ভেতরের জল পড়ল গিয়ে ঠিক গেলাসের ভেতর। ষষ্ঠিচরণ আমাদের হাতে গেলাস ধরিয়ে দিল।

ডাবের জলে চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ডাক্তারী পড়ে প্লাস্টিক সার্জারিতে স্পেশালাইজ করলাম কেন বলুন ত।'

'কেন ?' আমার কৌতূহল বাড়ছিল। সেটা আর কিছুই না—ভদ্রলোকের কল্পনার দৌড় কদ্দূর সেটা জানবার জন্যে।

হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বললেন, 'কারণ, শুধু ছবি দেখে মন ভরত না। খালি ভাবতাম এমন জানোয়ার যদি সত্যি করে থাকত। কোথাও যে আছেই ওসব প্রাণী, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমি তাদের চাইছিলাম আমার ঘরের মধ্যে, আমার হাতের কাছে, আমার চোখের সামনে—বুঝেছেন ?'

আমি বললাম, 'না মশাই, বুঝিনি। কোন্‌ সব প্রাণীর কথা বলছেন আপনি ?'

'এই ধরুন—কচ্ছপ কি গিরগিটিয়া, কি হাঁসজারু।'

বললাম, 'বুঝেছি। তারপর ?'

'তারপর আর কী। শুরু করলাম গিরগিটিয়া দিয়ে। দুটোই হাতের কাছে ছিল। টিয়ার মুড়ো আর গিরগিটিয়ার ল্যাজ। ঠিক যেমন বইয়ে আছে। প্রথম বাজিতেই কিস্তি মাৎ। বেমালুম জোড়া লেগে গেল। কিন্তু জানেন—'

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'বেশিদিন বাঁচল না। খেতেই চায় না কিচ্ছু! না খেলে বাঁচবে কী করে ? আসলে যা লেখা আছে সেটাই ঠিক—শরীরে শরীরে মিলে গেলেও মনের সন্ধিটা হতে চায় না। তাই এখন ধড়ে-মুড়ো সন্ধিটা ছেড়ে অন্য এক্সপেরিমেন্ট ধরেছি।'

ভদ্রলোক হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। ভাগ্যে ডাব খেতে দিয়েছে! চা বিস্কুট হলে সাহস করে মুখে পোরা যেত না। ষষ্ঠিচরণ কোথায় গেল কে জানে। একটা খুট্‌খাট্‌ শব্দ পাচ্ছি। যেদিন থেকে আসছে, তাতে মনে হয় হয়ত ভদ্রলোক যেটাকে তাঁর কাজের ঘর বললেন, তার দরজাটা খোলা হচ্ছে।

বাইরে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। মেঘের গুড়গুড়ুনিটাও ভালো লাগছে না। আর বসা যায় না। ফিরে গিয়ে কাজে বসতে হবে। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়লাম।

'চললেন ? কিন্তু আপনার কাছে যে একটা জিজ্ঞাস্য ছিল।'

'বলুন—'

'ব্যাপার কী জানেন—সবই জোগাড় হয়েছে—সজারুর কাঁটা, রামছাগলের সিং, সিংহের পেছনের দুটো পা, ভাল্লুকের লোম সব কিছুই। কিন্তু খানিকটা অংশ যে আবার মানুষের—আর সেখানে ত ছবির সঙ্গে মিল থাকা উচিত, তাই নয় কি ? সেরকম মানুষ আপনার চোখে কেউ পড়েছে কিনা জানতে পারলে সুবিধে হত।'

এই বলে ভদ্রলোক তাঁর টেবিলের উপর রাখা খাতাপত্রের নীচ থেকে একটা আদ্যিকালের আবোল-তাবোল বার করে সেটার একটা পাতা খুলে আমার চোখের সামনে ধরলেন। চেনা ছবি অবশ্যই। হাতে মুগুর নিয়ে একটা অদ্ভুত প্রাণী একটি পলায়নরত গোবেচারা মানুষের দিকে কটমট করে চেয়ে আছে—

'ভয় পেয়ো না ভয় পেয়ো না—তোমায় আমি মারব না,
সত্যি বলছি তোমার সঙ্গে কুস্তি করে পারব না...'

'কেমন চমৎকার হবে বলুন তো এমন একটি প্রাণী তৈরি করতে পারলে! কিছুই না—তোড়জোড় সব হয়েই আছে, তলার দিকের খানিকটা জোড়াও লেগে গেছে, এখন দরকার কেবল একটি এই রকম চেহারার মানুষ।'

আমি বললাম, 'অত গোলগোল চোখ কি মানুষের হয়।'

'আলবৎ!' ভদ্রলোক প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। 'চোখ ত গোলই হয়! চোখের পাতা দিয়ে গোলের অনেকটা ঢাকা থাকে বলে অতটা গোল মনে হয় না।'

আমি দরজার দিকে রওনা দিলাম। একে পাগল, তায় নাছোড়বান্দা, তায় আবার কথার ঝুড়ি।

'ঠিক আছে প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্‌, কাউকে নজরে পড়লে জানাব।'

'অতি অবশ্যই জানাবেন। বড্ড উপকার হবে। আমি অবিশ্যি নিজেও খুঁজছি। আপনি কোথায় উঠেছেন সেটা বললেন না ত?'

শেষের প্রশ্নটা না শোনার ভান করে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম। আর বেরিয়েই দৌড়। ভিজতে আপত্তি নেই, কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে যে বালি ওড়ে সেটা নাকে চোখে ঢুকে বড় বিশ্রী অসুবিধার সৃষ্টি করে।

কোনোরকমে হাত দুটো মুখের সামনে ধরে চোখটাকে বাঁচিয়ে হোটেলে যখন ফিরেছি তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে দেখি বাতি জ্বলছে না। বারান্দায় বেরিয়ে হাঁক দিয়ে বেয়ারাকে ডাকতে যাব, কিন্তু সেটার আর প্রয়োজন হল না। বেয়ারা মোমবাতি নিয়ে আমার ঘরের দিকেই আসছে। কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করতে বলল, বেশি ঝড় বৃষ্টি হলে বাতি নিভে যাওয়াটা নাকি গোপালপুরের একটা সাধারণ ঘটনা।

আটটার মধ্যে খাওয়া শেষ করে খাটে বসে টিমটিমে আলোকে লেখার কাজ শুরু করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটছে। মনটা বার বার চলে যাচ্ছে প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজের দিকে। তিনশো বছরের পুরোনো ঝুরঝুরে বাড়িতে জোড়াতালি দিয়ে (এখানেও সেই আবোল-তাবোলের থুড়থুড়ে বুড়িটার কথাই মনে পড়ে!) কীভাবে রয়েছে লোকটা। বদ্ধ পাগল না হলে কি কেউ এরকম করে? আর ষষ্ঠিচরণ? কোত্থেকে এমন এক ষাঁড়ের মতো চাকর জোগাড় করলেন তিনি? আর সত্যিই কি তিনি এই পূর্বদিকের বন্ধ ঘরটায় একটা অদ্ভুত কিছু করছেন? লোকটার কথা কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে? পুরোটাকেই অবশ্য পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু গোলমাল করছে ওর ওই কান দুটো। ওগুলো যে শুধু বেমালুম জোড়া হয়েছে তা নয়; আসবার সময় কেরোসিনের আলোতে লক্ষ্য করেছি একটা কানের ছুঁচোল অংশটাতে আবার একটা ফোস্‌কা পড়েছে। তার মানে সে কান শরীরেরই অংশ, আর শরীরের অন্য সব জায়গার মতো সেখানেও শিরা আছে, স্নায়ু আছে, রক্ত চলাচল আছে, সবই আছে।

সত্যি যতই ভাবছি মনে হচ্ছে যে ওই কানটা না থাকলে যেন অনেকটা নিশ্চিত হতে পারতাম।

পরদিন সকালে সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে দেখি রাতারাতি মেঘ কেটে গেছে। চা খেতে বসে হিজিবিজ্‌বিজের কথা মনে হতে হাসি পেল। ব্যাপারটা

আর কিছুই না—আবছা অন্ধকারে কেরোসিনের আলোয় অর্ধেক দেখেছি, অর্ধেক কল্পনা করেছি। হোটেলে ফিরে এসেও পেয়েছি সেই একই অন্ধকার, তাই মন থেকে খট্‌কার ভাবটা কাটবার সুযোগ পায়নি। আজ বালির উপর সকালের রোদ আর শান্ত সমুদ্রের চেহারা দেখে মনে হল লোকটা খ্যাপা ছাড়া আর কিছুই না।

পায়ের তলায় গোড়ালির কাছে একটা চিন্‌চিনে ব্যথা অনুভব করছিলাম। পরীক্ষা করে দেখলাম একটা জায়গায় ছোট্ট একটা কাটার দাগ। বুঝলাম কাল অন্ধকারে বালির উপর দিয়ে দৌড়ে আসার সময় ঝিনুক জাতীয় কিছুর আঁচড় লেগেছে। সঙ্গে ডেটল আয়োডিন কিছুই আনিনি, তাই ন'টা নাগাৎ একবার বাজারের দিকে গেলাম।

বাজারে যাবার রাস্তাটা নিউ বেঙ্গলি হোটেলের সামনে দিয়ে গেছে। হোটেলের সামনেই বারান্দায় কালকের ঘনশ্যামবাবুকে দেখলাম একজন ফেরিওয়ালার কাছ থেকে একটা প্রবাল নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখছেন। আমার পায়ের আওয়াজ শুনে ভদ্রলোক মুখ তুললেন, আর তুলতেই আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করে উঠল।

এ যে সেই আবোল-তাবোলের মুখ—যে মুখের খোঁজ করেছেন ওই উন্মাদ প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্!

কোনো সন্দেহ নেই। সেই থ্যাবড়া নাকের নীচে দুপাশে ছিট্‌কে থাকা লম্বা পাকা গোঁফ, লম্বা গলার দুপাশে ঠিক ছবির মতো করে বেরিয়ে থাকা শিরা, এমনকি চ্যাপ্টা থুৎনির নীচে কয়েক গোছা মাত্র চুলের ছাগ্‌লা দাড়িটা পর্যন্ত। আসলে কাল কেন জানি লোকটার হাবভাব পছন্দ হয়নি বলে ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকাইনি। আজকে চোখাচোখিটা হল বটে, আর আমি একটা নমস্কারও করলাম, কিন্তু ভদ্রলোক দেখলাম সেটা গ্রাহ্যই করলেন না। ভারী অভদ্র।

কিন্তু তাও লোকটার জন্য দুশ্চিন্তা হল। ওই পাগলের খপ্পরে কখনই পড়তে দেওয়া যায় না—হিজিবিজ্‌বিজ্ বা তার চাকর যদি একে দেখে, তাহলে নির্ঘাৎ বগলদাবা করে নিয়ে যাবে ওই ঝুরঝুরে বাড়িতে। আর তারপর যে কী করবে সেটা মা গঙ্গাই জানেন।

ঠিক করলাম বাজার ফেরতা একবার রাধাবিনোদবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ব্যাপারটা খুলে বলব। তাঁকে সাবধান করে দেবো তাঁর হোটেলের একমাত্র অতিথিকে যেন তিনি একটু চোখে চোখে রাখেন।

কিন্তু ডেটল কিনতে কিনতেই আমার সঙ্কল্পটা যেন আপনা থেকেই বাতিল হয়ে গেল। রাধাবিনোদবাবুকে যে সব উদ্ভট কথা আমাকে বলতে হবে, সেগুলো

কি তিনি বিশ্বাস করবেন ? মনে হয় না। এমন কি সে সব শুনে শেষটায় হয়ত আমাকেই পাগল ঠাউরাবেন। তাছাড়া আমি যে তাঁর নিষেধ অগ্রাহ্য করে হিজিবিজ্‌বিজের বাড়ি গেছি, সেটাও নিশ্চয় তাঁর মনঃপূত হবে না।

ফেরার পথে আরেকবার ঘনশ্যামবাবুকে দেখে মনে হল—আমার চোখে যাকে ওই ছবির মতো মনে হচ্ছে, হিজিবিজ্‌বিজের চোখে সেটা নাও হতে পারে। সুতরাং যতটা ভয়ের কারণ আছে বলে ভাবছি, আসলে হয়ত ততটা নেই। কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে এদের কিছু না বলা, আর প্রোফেসরকেও ঘনশ্যামবাবু সম্বন্ধে কিছু না বলা। এবার থেকে শুধু পশ্চিম দিকটায় বেড়াতে যাব, আর বাকি সময়টা হোটেলের ঘরে বসে লেখার কাজ করব।

হোটেলে ফিরতেই বেয়ারা বলল একজন ভদ্রলোক আমার খোঁজে এসেছিলেন। আমাকে না পেয়ে তিনি নাকি একটা চিঠি রেখে গেছেন।

অত্যন্ত খুদে খুদে প্রায় পিঁপড়ের মতো অক্ষরে লেখা চিঠিটা হচ্ছে এই—

প্রিয় ষড়াঙ্গুল মহাশয়,

আজ সন্ধ্যাবেলা অবশ্যই একবার আমার গৃহে আসিবেন। সিংহের পশ্চাৎভাগের সহিত সজারুর কাঁটা এবং ভল্লুকের লোম নিখুঁতভাবে জোড়া লাগিয়াছে। মুদ্‌গরও একটি তৈয়ার হইয়াছে চমৎকার। শৃঙ্গ তিনটি মস্তকের অপেক্ষায় আছে। এখন শুধু মাত্র মস্তক ও হস্তদ্বয় সংগ্রহ হইলেই হয়। ষষ্ঠিচরণ জনৈক ব্যক্তির সন্ধান আনিয়াছে; মূল চিত্রের সহিত তাহার নাকি যথেষ্ট সাদৃশ্য। আশা করি আজই আমার পরীক্ষা সফল হইবে। অতএব সন্ধ্যায় একবার কিংকর্তব্যবিমূঢ়ে পদার্পণ করিলে যারপরনাই আহ্লাদিত হইব।

ইতি ভবদীয়

এইচ. বি. বি

মনে পড়ল বাড়ির নাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাখার কথাটা হ-য-ব-র-লতে হিজিবিজ্‌বিজ্‌ই বলেছিল। চিঠিটা পড়ে মনে আবার দুশ্চিন্তা দেখা দিল, কারণ মন বলছে ষষ্ঠিচরণ হয়ত ঘনশ্যামবাবুকেই দেখেছে।

সারা দুপুর যতদূর সম্ভব মন দিয়ে লেখার কাজ করলাম। বিকেলের দিকে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসে সমুদ্রের দিকে দেখতে মনটা অনেকটা হালকা হয়ে এল। উত্তর-পশ্চিম থেকে হাওয়া এসে এগিয়ে আসা ঢেউগুলোর গায়ে লাগছে, আর তার ফলে ঢেউয়ের মাথায় ফেনাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। বেশ লাগছে দেখতে।

ছ'টা নাগাৎ হঠাৎ দেখি রাধাবিনোদবাবু কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব নিয়ে বালির উপর দিয়ে হন্তদন্ত আমাদের বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছেন। ভদ্রলোক কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন,—

'আমার সেই গেস্টটিকে কি এদিক দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছেন ?'

'কে, ঘনশ্যামবাবু ?'

'আরে হ্যাঁ মশাই। কাল যেখানে ছিলুম আমরা, সেখানেই ওয়েট করার কথা আমার জন্য। এখন এসে দেখছি নেই। কাছাকাছির মধ্যে একটা লোক নেই যাকে জিগ্যেস করি। এদিকে আমার হোটেলেও হ্যাঙ্গামা—আমার সোনার ঘড়িটি চুরি গেছে—চাকরটাকে জেরা করতে দেরি হয়ে গেল। আপনার এদিক দিয়ে যায়নি বোধ হয় ?'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম।

'না, এদিক দিয়ে যায়নি', আমি বললাম, 'তবে একটা সন্দেহ হচ্ছে আমার। একটা জায়গায় গেলে হয়ত খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। আপনার হাতের লাঠিটা বেশ মজবুত ত ?'

রাধাবিনোদবাবু থমথত খেয়ে বললেন, 'লাঠি ? হ্যাঁ...তা...লাঠি ত আমার সেই ঠাকুরদার...কাজেই...'

আমার সঙ্গে আর কিছুই নেই—একটা করাত মাছের দাঁত কিনেছিলাম প্রথমদিন এসেই, সেইটে সঙ্গে নিয়ে নিলাম। অন্য হাতে নিলাম আমার টর্চটা।

পূর্বদিকে যাচ্ছি দেখে রাধাবিনোদবাবু ধরা গলায় বললেন, 'নুলিয়া বস্তি ছাড়িয়ে যাবেন কি ?'

'হ্যাঁ। তবে বেশি দূর নয়—মাইল খানেক।'

সারা রাস্তা রাধাবিনোদবাবু শুধু একটি কথাই বার তিনেক বললেন,—'কিছুই বুঝতে পারছি না মশাই।'

প্রায় দেড় মাইল পথ এক পৌঢ়কে সঙ্গে নিয়ে বালির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে লেগে গেল ঘণ্টাখানেক। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বালির কাছ অবধি না যাওয়া পর্যন্ত তাতে কেউ আছে কি না বোঝা অসম্ভব। বাড়িটার দিকে যতই এগোচ্ছি ততই দেখছি রাধাবিনোদবাবুর উৎসাহ কমে আসছে। শেষটায় দশ হাত দূরে পৌছে হঠাৎ একেবারে থেমে গিয়ে বললেন, 'আপনার মতলবটা কী বলুন ত ?'

বললাম, 'অ্যাদ্দূরই যখন এলেন, তখন আর মাত্র দশটা হাত যেতে আপত্তি কিসের ?'

অগত্যা ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন আমার পেছন পেছন।

বাড়ির সামনে এসে টর্চ জ্বালাতে হল, কারণ ভিতরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কালকের কেরোসিনের বাতি এতক্ষণে জ্বলে যাবার কথা, কিন্তু জ্বলেনি।

সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে টর্চের আলোতে প্রথমেই দেখলাম একটা লোক মাটিতে হুমড়ি দিয়ে পড়ে আছে। লোকটি মরেনি, কারণ তার বিশাল বুকটা নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ওঠানামা করছে।

'এ যে সেই চাকরটা!' ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠলেন রাধাবিনোদবাবু।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ষষ্ঠিচরণ।'

'আপনি নামটাও জানেন নাকি?'

এ কথার উত্তর না দিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলাম। ঘর খালি। প্রোফেসরের কোন চিহ্নই নেই। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম কাজের ঘরের দিকে।

দরজাটা অর্ধেক খোলাই ছিল। ষষ্ঠিচরণকে ডিঙ্গিয়ে তবে ভেতরে ঢুকতে হল। বৈঠকখানার মতোই ঘরের আয়তন। একদিকে টেবিলের ওপর স্তুপীকৃত সরঞ্জাম—শিশি বোতল কাঁটাছুরি ওষুধপত্র ইত্যাদি। একটা উগ্র গন্ধে ঘরটা ভরে রয়েছে। এ গন্ধ আমি চিনি। ছোটবেলায় চিড়িয়াখানায় জন্তুর খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে এ গন্ধ পেয়েছি।

'আরে—সে লোকটার পাঞ্জাবীটা রয়েছে দেখছি এখানে!' রাধাবিনোদবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

আজ সকালে পাঞ্জাবীটা আমিও দেখেছি। তিন কোয়ার্টার হাতা ব্রাউন রঙের পাঞ্জাবী, বুকে সাদা বোতাম। এটা যে ঘনশ্যামবাবুরই পাঞ্জাবী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আর এই পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে এই ছমছম অবস্থাতেও রাধা বিনোদবাবু চম্‌কে উঠে হাঁপ ছাড়লেন। তিনি তাঁর সোনার ঘড়ি ফিরে পেয়েছেন।

'কিন্তু এখানে এসব কী হচ্ছে বলুন তো। কিসের সরঞ্জাম ওগুলো? পাঞ্জাবী রয়েছে, পকেটে ঘড়ি রয়েছে, কিন্তু সে ব্যাটা মানুষটা গেল কোথায়? আর সে বুড়োটাই বা কোথায় গেল?'

বললাম, 'বাড়ির ভেতর তো নেই সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। চলুন বাইরে।'

ষষ্ঠিচরণ এখনো অজ্ঞান। তাকে আবার ডিঙ্গিয়ে পেরিয়ে আমরা বাড়ির বাইরে বালির উপর এলাম। এবারে সমুদ্রের দিকে চাইতেই আবছা অন্ধকারে একটা মানুষকে দেখতে পেলাম। সে এই দিকেই আসছে। আরেকটু কাছে আসতে হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে তার উপর ফেললাম। প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্‌।

'ষড়াঙ্গুল মশাই কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি হিমাংশু চৌধুরী।'

'আরেকটু আগে এলেন না!' ভদ্রলোক যেন গভীর আক্ষেপের সঙ্গে কথাটা বললেন।

'কেন বলুন ত?' জিগ্যেস করলাম।

'ও ত চলে গেল! ছবির মতো মানুষ পেলাম। এক ঘন্টায় জোড়া লেগে গেল, দিব্যি চলে ফিরে বেড়াল, পরিষ্কার কথা বলল, ষষ্ঠিচরণ ভয় পাচ্ছিল বলে

ওর মাথায় মুগুরের বাড়ি মারল, আর তারপর চলে গেল সোজা সমুদ্রের দিকে। একবার ভাবলুম ডাকি, কিন্তু নাম ত নেই, কী বলে ডাকব!...মানুষের মাথা, সিংহের পা, সজারুর পিঠ, রামছাগলের সিং...অথচ জলে যে গেল কেন সেটা বুঝতেই পারলাম না...'

কথাটা বলতে বলতে ভদ্রলোক তাঁর অন্ধকার বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন। আমার হাতের টর্চটা এতক্ষণ তাঁর উপর ফেলা ছিল, এখন হাতটা নীচে নামতে চোখে পড়ল বালির উপর পায়ের ছাপ। টাট্‌কা পায়ের ছাপ। পা ত নয়, থাবা।

ছাপ ধরে আলো ফেলে এগিয়ে গেলাম। ক্রমে ভিজে বালি এলো, তাতে ছাপ আরো গভীর। কাঁকড়ার গর্তের পাশ দিয়ে, অজস্র ঝিনুকের ওপর দিয়ে থাবার ছাপ ক্রমে জলের দিকে গিয়ে সমুদ্রে হারিয়ে গেছে।

এতক্ষণে রাধাবিনোদবাবু কথা বললেন।

'সবই ত বুঝলাম। ইনি ত বদ্ধ পাগল, আপনি হয়ত হাফ-পাগল, কিন্তু আমার হোটেলের বাসিন্দা ওই বাটপাড়টা গেল কোথায় ?'

হাত থেকে করাত মাছের দাঁতটা জলে ফেলে দিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়িয়ে বললাম, 'সেটা না হয় পুলিশকে তদন্ত করতে বলুন। পাঞ্জাবীটা যখন এখানে পাওয়া গেছে, তখন এখানেই দেখতে বলুন। তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে রহস্যের কূলকিনারা করতে গিয়ে পুলিশবাবাজীরও শেষটায় না আমার দশাই হয়—অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ়।'

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বঙ্কুবাবুর বন্ধু

বঙ্কুবাবুকে কেউ কোনদিন রাগতে দেখেনি। সত্যি বলতে কি, তিনি রাগলে যে কী রকম ব্যাপারটা হবে, কী যে বলবেন বা করবেন তিনি, সেটা আন্দাজ করা ভারি শক্ত।

অথচ রাগবার যে কারণ ঘটে না তা মোটেই নয়। আজ বাইশ বছর তিনি কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি ইস্কুলে ভূগোল ও বাংলা পড়িয়ে আসছেন; এর মধ্যে কত ছাত্র এল গেল, কিন্তু বঙ্কুবাবুর পিছনে লাগা-ব্লাকবোর্ডে তাঁর ছবি আঁকা, তাঁর বসবার চেয়ারে গাবের আঠা মাখিয়ে রাখা, কালীপূজোর রাত্রে তাঁর পিছনে ছুঁচোবাজি ছেড়ে দেওয়া—এসবই এই বাইশ বছর ধরে ছাত্র-পরম্পরায় চলে আসছে।

বঙ্কুবাবু কিন্তু কখনো রাগেন নি। কেবল মাঝে মাঝে গলা খাঁকরিয়ে বলেছেন—ছিঃ!

এর একটা কারণ অবিশ্যি এই যে তিনি যদি রাগটাগ করে মাস্টারি ছেড়ে দেন তো তাঁর মত গরিব লোকের পক্ষে এই বয়সে আর-একটা মাস্টারি বা চাকরি খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত হবে। আর-একটা কারণ হল, ক্লাসভর্তি দুষ্টু ছেলের মধ্যে দু-একটি করে ভালো ছাত্র প্রতিবারেই থাকে; বঙ্কুবাবু তাদের সঙ্গে ভাব করে তাদের পড়িয়ে এত আনন্দ পান যে তাতেই তাঁর মাস্টারি সার্থক হয়ে যায়। এই সব ছাত্রদের তিনি কখনো কখনো নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। তারপর বাটি করে মুড়কি খেতে দিয়ে গল্পচ্ছলে দেশ-বিদেশের আশ্চর্য ঘটনা শোনান। আফ্রিকার গল্প, মেরু আবিষ্কারের গল্প, ব্রেজিলের মানুষখেকো মাছের গল্প, সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়া আটলান্টিক মহাদেশের গল্প, এসবই বঙ্কুবাবু চমৎকার করে বলতে পারেন।

শনি-রবিবার সন্ধ্যাবেলাটা বঙ্কুবাবু যান গ্রামের উকিল শ্রীপতি মজুমদারের আড্ডায়। অনেকবার ভেবেছেন আর যাবেন না, এই শেষবার, আর না। কারণ ছাত্রদের টিটকিরি গা-সওয়া হয়ে গেলেও, বুড়োদের পিছনে লাগাটা যেন

কিছুতেই বরদাস্ত হয় না। এই বৈঠকে তাঁকে নিয়ে যে ধরনের ঠাট্টা-তামাশা চলে সেটা সত্যিই মাঝে মাঝে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

এই তো সেদিন, দুমাসও হয় নি, ভূতের কথা হচ্ছিল। বঙ্কুবাবু সচরাচর মুখ খোলেন না। সেদিন কী জানি হল, হঠাৎ বলে ফেললেন যে তাঁর ভূতের ভয় নেই। আর যায় কোথা! এমন সুযোগ কি এসব লোকে ছাড়ে ? রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে বঙ্কুবাবুকে যাচ্ছে তাই ভাবে নাজেহাল হতে হল। মিত্তিরদের তেঁতুলগাছটার তলায় কে এক লিকলিকে লম্বা লোক ভুশোটুশো মেখে অন্ধকারে তাঁর পিঠের উপর পড়ল ঝাঁপিয়ে। এই আড্ডারই কারো চক্রান্ত আর কি।

ভয় অবিশ্যি পাননি বঙ্কুবাবু তবে চোট লেগেছিল। তিনদিন ঘাড়ে ব্যথা ছিল। আর সবচেয়ে যেটা বিশ্রী—তাঁর নতুন পাঞ্জাবীটা কালিটালি লেগে ছিঁড়েটিড়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ঠাট্টার এ কী রকম রে বাপু!

এ ছাড়া ছোটখাটো পিছনে লাগার ব্যাপার তো লেগেই আছে। এই যেমন ছাতাটা জুতোটা লুকিয়ে রাখা, পানে আসল মসলার পরিবর্তে মাটির মসলা দিয়ে দেওয়া, জোর করে ধরে-বেঁধে গান গাওয়ানো ইত্যাদি।

কিন্তু তাও আড্ডায় আসতে হয়। না এলে শ্রীপতিবাবু কী ভাববেন। একে তো তিনি গায়ের গণ্যমান্য লোক, দিনকে রাত করতে পারেন এমন ক্ষমতা তাঁর, তার উপরে আবার তাঁর বঙ্কুবাবু না হলে চলেই না। তিনি বলেন, একজন লোক থাকবে যাকে নিয়ে বেশ রসিয়ে রগড় করা চলবে, নইলে আর আড্ডা ? ডাকো বঙ্কুবিহারীকে।

আজকের আড্ডার সুর ছিল উচ্চগ্রামের; অর্থাৎ স্যাটিলাইট নিয়ে কথা হচ্ছিল। আজই সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার কিছুক্ষণ পরেই উত্তর দিকের আকাশে একটি চলন্ত আলো দেখা গেছে। মাস তিনেক আগেও একবার ওই রকম আলো দেখা দিয়েছিল এবং তাই আড্ডায় বিস্তর গবেষণা চলেছিল। পরে জানা যায় ওটা একটা রাশিয়ান স্যাটিলাইট। খট্‌কা না ফোসকা এই গোছের কী একটা নাম। সেটা নাকি ৪০০ মাইল ওপর দিয়ে বনবন করে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এবং তার থেকে নাকি বৈজ্ঞানিকরা অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছেন।

আজকের আলোটা বঙ্কুবাবু প্রথম দেখেছিলেন। তারপর তিনিই সেটা নিধু মোক্তারকে ডেকে দেখান।

কিন্তু আড্ডায় এসে বঙ্কুবাবু দেখলেন যে নিধুবাবু অম্লানবদনে প্রথম দেখার ক্রেডিটটা নিজেই নিয়েছেন, এবং সেই নিয়ে খুব বড়াই করছেন। বঙ্কুবাবু কিচ্ছু বললেন না।

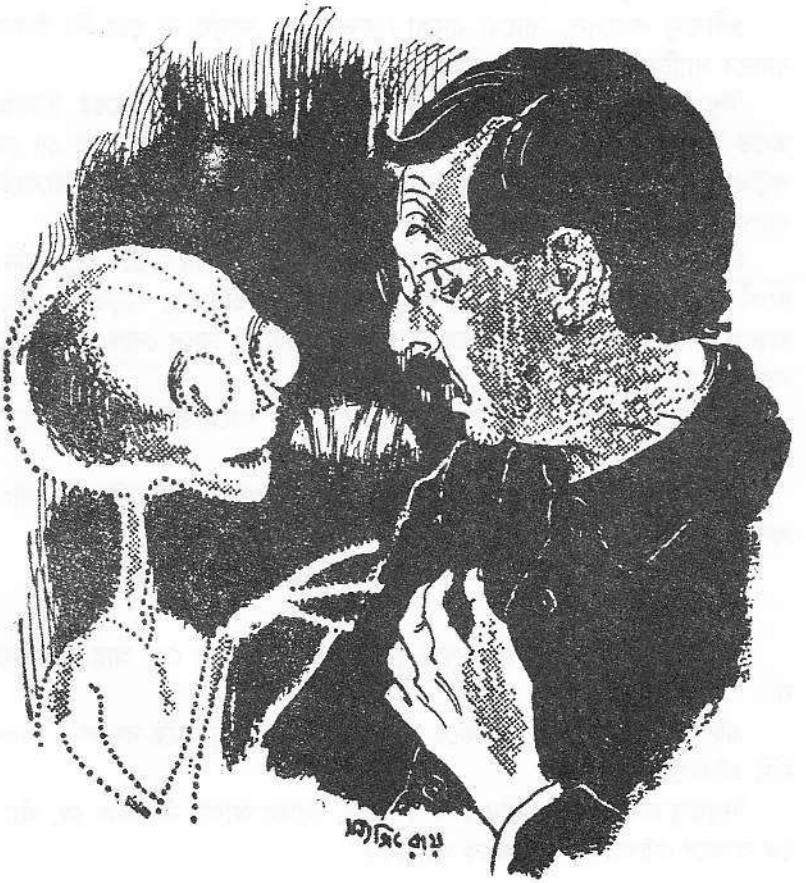

স্যাটিলাইট সম্বন্ধে এখানে কেউই বিশেষ কিছু জানেন না, তবে এসব কথা বলতে তো আর টিকেট লাগে না, বা বললে পুলিসেও ধরে না, তাই সবাই ফোড়ন দিচ্ছেন।

চণ্ডীবাবু বললেন, 'যাই বল বাপু, এসব স্যাটিলাইট-ফ্যাটিলাইট নিয়ে খামখা মাথা ঘামানো আমাদের শোভা পায় না। আমাদের কাছে ও-ও যা, সাপের মাথার মণিও তাই। কোথায় আকাশের কোন্ কোণে আলোর ফুটকি দেখছ, তাই নিয়ে খবরের কাগজে লিখছে, আর তাই পড়ে তুমি বৈঠকখানায় বসে পান চিবুতে চিবুতে বাহবা দিচ্ছ। যেন তোমারই কীর্তি, তোমারই গৌরব। হাততালিটা যেন তোমারই পাওনা। হুঁ।'

রামকানাই-এর বয়সটা কম। সে বলল, 'আমার না হোক, মানুষের তো। সবার উপরে মানুষ সত্য।'

চণ্ডীবাবু বললেন, 'রাখো রাখো। যত সব....মানুষ না তো কি বাঁদরে বানাবে স্যাটিলাইট ? মানুষ ছাড়া আর আছে কী ?'

নিধু মোক্তার বললেন, 'আচ্ছা বেশ। স্যাটিলাইটের কথা ছেড়েই দিলাম। তাতে না-হয় লোকটোক নেই, কেবল একটা যন্তর পাক খাচ্ছে। তা সে তো লাট্টুও পাক খায়। সুইচ টিপলে পাখাও ঘোরে। যাকগে। কিন্তু রকেট ? রকেটের ব্যাপারটা তো নেহাত ফেলনা নয় ভায়া।'

চণ্ডীবাবু নাক সিঁটকে বললেন, 'রকেট! রকেট ধুয়ে কোন্ জলটা খাবে শুনি ? রকেট! তাও বুঝতাম যদি হ্যাঁ, এই আমাদের দেশেই তৈরি হয়, গড়ের মাঠ থেকে ছাড়লে সেটা চাঁদে-টাঁদে তাগ করে, আমরা গিয়ে টিকিট কিনে দেখে এলুম, তাও একটা মানে হয়।'

রামকানাই বলল, 'ঠিক বলেছেন। আমাদের কাছে রকেটও যা ঘোড়ার ডিমও তাই।'

ভৈরব চক্কোত্তি বললেন, 'ধর যদি অন্য গ্রহ-ট্রহ থেকে একটা কিছু পৃথিবীতে এল...'

'এলেই বা কী ? তুমি আমি তো আর সেটাকে দেখতে পাব না।'

'তা বটে।'

আড্ডার সবাই চায়ের পেয়ালায় মুখ দিলেন। এর পর তো আর কথা চলে না!

এই অবসরে বঙ্কুবাবু খুক করে একটু কেশে নিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'ধরুন যদি এইখানেই আসে।'

নিধুবাবু অবাক হবার ভান করে বললেন, 'ব্যাঁকা আবার কী বলছ হে, অ্যাঁ ? কে আসবে এইখানে ? কোত্থেকে আসবে ?'

বঙ্কুবাবু আবার মৃদুস্বরে বললেন, 'অন্য গ্রহ থেকে কোন লোকটোক...'

ভৈরব চক্কোত্তি তাঁর অভ্যাসমত বঙ্কুবাবুর পিঠে একটা অভদ্র চাপড় মেরে দাঁত বার করে বললেন, 'বাঃ। অন্য গ্রহ থেকে লোক আসবে এইখানে ? এই গণ্ডগ্রামে ? লন্ডন নয়, মস্কো নয়, নিউইয়র্ক নয়, মায় কলকাতাও নয়—একেবারে এই কাঁকুড়গাছি ? তোমার তো শখ কম নয়!'

বঙ্কুবাবু চুপ করে গেলেন। কিন্তু তাঁর মন বলতে লাগল, সেটা আর এমন অসম্ভব কী ? বাইরে থেকে যারা আসবে, তাদের তো পৃথিবীতে আসা নিয়ে কথা। অত যদি হিসেব করে না-ই আসে ? কাঁকুড়গাছিতে না-আসা যেমন সম্ভব আসাও তো ঠিক তেমনি সম্ভব।

শ্রীপতিবাবু এতক্ষণ কিছু বলেন নি। এবার তিনি নড়েচড়ে বসতেই সকলে তাঁর মুখের দিকে চাইল। তিনি চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বিজ্ঞের মত ভারী গলায় বললেন, 'দেখ, বাইরের গ্রহ থেকে যদি লোক আসেই, তবে এটা জেনে রেখো যে তারা এই পোড়া দেশে আসবে না। তাদের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই! আর অত বোকা তারা নয়। আমার বিশ্বাস তারা সাহেব, এবং এসে নামবে ওই সাহেবদেরই দেশে, পশ্চিমে। বুঝেছো ?'

এ কথায় এক বঙ্কুবাবু ছাড়া সকলেই একবাক্যে সায় দিলেন।

চণ্ডীবাবু নিধু মোক্তারের কোমরে খোঁচা মেরে ইশারায় বঙ্কুবাবুকে দেখিয়ে ন্যাকা-ন্যাকা গলায় বললেন, 'আমার কিন্তু বাবা মনে হয় যে বঙ্কু ঠিকই বলেছে। বঙ্কুবিহারীর মত লোক যেখানে আছে সেখানে আসাই তো তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কি বল হে নিধু ? ধর যদি একটা স্পেসিমেন নিয়ে যেতে হয়, তাহলে বঙ্কুর মত দ্বিতীয় মানুষ কোথায় পাচ্ছে শুনি ?'

নিধু মোক্তার সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক ঠিক। বুদ্ধি বল, চেহারা বল, যাই বল, ব্যাঁকা একেবারে আইডিয়াল।'

রামকানাই বলল, 'একেবারে জাদুঘরে রাখার মত। কিংবা চিড়িয়াখানায়।'

বঙ্কুবাবু মনে মনে বললেন, 'স্পেসিমেন যদি বলতে হয় তো এঁরাই বা কী কম ? ওই তো শ্রীপতিবাবু—উটের মত থুতনি। আর ওই ভৈরব চক্কোত্তি—কচ্ছপের মত চোখ, ওই নিধু মোক্তার ছুঁচো, রামকানাই ছাগল, চণ্ডীবাবু—চামচিকে। চিড়িয়াখানায় যদি রাখতে হয় তো...

বঙ্কুবাবুর চোখে জল এল। তিনি উঠে পড়লেন। আজ অন্তত আড্ডাটা ভাল লাগবে ভেবেছিলেন। হল না। মনটা ভারী হয়ে গেছে। আর থাকা চলে না।

'সে কী, উঠলে না কি হে ?' শ্রীপতিবাবু যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'হ্যাঁ, রাত হল।'

'কই রাত ? কাল তো ছুটি! বোসো, চা খাও।'

'না, আজ আসি। পরীক্ষার খাতা আছে কিছু। নমস্কার।'

রামকানাই বলল, 'দেখবেন বঙ্কুদা। আজ আবার অমাবস্যা। মঙ্গলবার মানুষ কিন্তু ভূতেরও বাড়া।'

বঙ্কুবাবু আলোটা দেখতে পেলেন পঞ্চা ঘোষের বাঁশবাগানের মাঝ বরাবর এসে। তাঁর নিজের হাতে আলো ছিল না। শীতকাল, তাই সাপের ভয় নেই; তাছাড়া পথও খুব ভালো ভাবেই চেনা। এ পথে এমনিতে বড় একটা কেউ আসে না, কিন্তু বঙ্কুবাবুর শর্ট কাট হয় বলেই তিনি এই পথে যান।

কিছুক্ষণ থেকেই তাঁর কেমন জানি খট্‌কা লাগছিল। অন্যদিনের চেয়ে কী জানি একটা অন্য রকম ভাব। কিন্তু সেটা যে কী তা বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ খেয়াল হল যে বাঁশবনে আজ ঝিঁঝিঁ ডাকছে না। একদম না। সেইটেই তফাত। অন্যদিন যতই বনের ভিতর ঢোকেন ততই ঝিঁঝিঁর ডাক বাড়ে। আজ ঠিক তার উলটো। তাই এমন থমথমে ভাব। ব্যাপার কী ? ঝিঁঝিঁগুলো সব ঘুমোচ্ছে নাকি ?

ভাবতে ভাবতে হাত বিশেক গিয়ে পূব দিকে চোখ যেতেই আলোটা দেখতে পেলেন।

প্রথমে মনে হল বুঝি আগুন লেগেছে। বনের মধ্যিখানের ফাঁকটায় যেখানে ডোবাটা রয়েছে তার চারপাশের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে গাছের ডালে ও পাতায় একটা গোলাপী আভা। আর নিচে, ডোবার সমস্ত জায়গাটা জুড়ে উজ্জ্বল গোলাপী আলো। কিন্তু আগুন নয়, কারণ, আলোটা স্থির।

বঙ্কুবাবু এগোতে লাগলেন।

কানের মধ্যে একটা শব্দ আসছে। কিন্তু সেটা যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। হঠাৎ কানে তালা লাগলে যেমন শব্দ হয়—রী রী রী রী রী রী—এ যেন ঠিক সেই রকম।

বঙ্কুবাবুর গা একটু ছমছম করে থাকলেও একটা অদম্য কৌতূহলবশে তিনি এগিয়ে চললেন।

ডোবার থেকে ত্রিশ হাত দূরে বড় বাঁশঝাড়টা পেরোতেই তিনি জিনিসটা দেখতে পেলেন। একটা অতিকায় উপুড়-করা কাঁচের বাটির মত জিনিস সমস্ত ডোবাটাকে আচ্ছন্ন করে পড়ে আছে এবং তার প্রায় স্বচ্ছ ছাউনির ভিতর থেকে একটা তীব্র অথচ স্নিগ্ধ গোলাপী আলো বিচ্ছুরিত হয়ে চতুর্দিকের বনকে আলো করে দিচ্ছে।

এমন অদ্ভুত দৃশ্য বঙ্কুবাবু স্বপ্নেও কখনো দেখেন নি।

অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বঙ্কুবাবু লক্ষ্য করলেন যে জিনিসটা স্থির হলেও যেন নির্জিব নয়। অল্প অল্প স্পন্দনের আভাস পাওয়া

যাচ্ছে। নিশ্বাসপ্রশ্বাসে মানুষের বুক যেমন ওঠে নামে, কাঁচের ঢিবিটা তেমনি উঠছে নামছে।

বঙ্কুবাবু ভালো করে দেখবার জন্য আর হাত চারেক এগিয়ে যেতেই হঠাৎ যেন তাঁর শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। আর তার পরমুহূর্তেই তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর হাত-পা যেন কোন অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলা হয়েছে। তাঁর শরীরে আর শক্তি নেই। তিনি 'না' পারেন এগোতে না পারেন পেছোতে।

কিছুক্ষণ এভাবে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বঙ্কুবাবু দেখলেন যে জিনিসটার স্পন্দন আস্তে আস্তে থেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল সেই অদ্ভুত কানে-তালা লাগার শব্দটা। তারপর হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে, কতকটা মানুষের মত কিন্তু অত্যন্ত মিহি গলায় চীৎকার এল, মিলিপিপ্পিং খ্রুক, মিলিপিপ্পিং খ্রুক!

বঙ্কুবাবু চমকে গিয়ে থ। এ আবার কী ভাষা রে বাবা! আর যে বলছে সেই বা কোথায় ?

দ্বিতীয় চীৎকার শুনে বঙ্কুবাবুর বুকটা ধড়াস করে উঠল।

'হু আর ইউ ? হু আর ইউ ?'

এ যে ইংরেজি! হয়তো তাঁকেই জিজ্ঞেস করা হচ্ছে প্রশ্নটা।

বঙ্কুবাবু ঢোক গিলে বলে উঠলেন, 'আই অ্যাম বঙ্কুবিহারী দত্ত, স্যার—বঙ্কুবিহারী দত্ত।'

প্রশ্ন এল, 'আর ইউ ইংলিশ ? আর ইউ ইংলিশ ?'

বঙ্কুবাবু চেঁচিয়ে বললেন, 'নো, স্যার। বেঙ্গলি কায়স্থ, স্যার।'

একটুক্ষণ চুপচাপের পর পরিষ্কার উচ্চারণে কথা এল, 'নমস্কার।'

বঙ্কুবাবু হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'নমস্কার।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর হাত-পায়ের অদৃশ্য বাঁধনগুলো যেন আপনা থেকেই আলগা হয়ে গেল। তিনি ইচ্ছে করলেই পালাতে পারেন, কিন্তু পালালেন না। কারণ তিনি দেখলেন, সেই অতিকায় কাঁচের ঢিবির একটা অংশ আস্তে আস্তে দরজার মতো খুলে যাচ্ছে।

সেই দরজা দিয়ে প্রথমে বেরিয়ে এল একটা মসৃণ বলের মত মাথা, তারপর একটা অদ্ভুত প্রাণীর সমস্ত শরীরটা।

লিকলিকে শরীরের মাথা বাদে সমস্তটাই একটা চকচকে গোলাপী পোশাকে ঢাকা। মুখের মধ্যে কান ও নাকের জায়গায় দুটো করে এবং ঠোঁটের জায়গায় একটা ফুটো। লোম বা চুলের লেশমাত্র নেই। হলদে গোলগাল চোখ দুটো এমনই উজ্জ্বল যে দেখলে মনে হয় আলো জ্বলছে।

লোকটা আস্তে আস্তে বঙ্কুবাবুর দিকে এগিয়ে এসে তাঁর তিন হাত দূরে থেকে তাঁকে একদৃষ্টে দেখতে লাগল। বঙ্কুবাবুর হাত দুটো আপনা থেকেই জোড় হয়ে এল।

প্রায় এক মিনিট দেখার পর লোকটা সেই রকম বাঁশির মত মিহি গলায় বলল, 'তুমি মানুষ ?'

বঙ্কুবাবু বললেন, 'তুমি মানুষ ?'

লোকটা বলল, 'এটা পৃথিবী ?'

বঙ্কুবাবু বললেন, 'হুঁ'।

'ঠিক ধরেছি—যন্ত্রপাতিগুলো গোলমাল করছে। যাবার কথা ছিল প্লুটোয়। একটা সন্দেহ ছিল মনে, তাই তোমাকে প্রথম প্লুটোর ভাষায় প্রশ্ন করলাম। যখন দেখলাম তুমি উত্তর দিলে না তখন বুঝতে পারলাম যে পৃথিবীতেই এসে পড়েছি। পণ্ডশ্রম হল। ছি-ছি-ছি, এতদূর এসে আরেকবার এরকম হয়েছিল। বুধ যেতে বৃহস্পতি গিয়ে পড়েছিলাম। একদিনের তফাত আর কি, হেঃ হেঃ হেঃ।'

বঙ্কুবাবু কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। তাছাড়া ওঁর এমনিতেই অসোয়াস্তি লাগছিল। কারণ লোকটা সরু সরু আঙুল দিয়ে ওঁর হাত-পা টিপে টিপে দেখতে আরম্ভ করেছে।

টেপা শেষ করে লোকটা বলল, 'আমি ক্রেনিয়াস গ্রহের অ্যাং। মানুষের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের প্রাণী।'

এই লিকলিকে চার ফুট লোকটা মানুষের চেয়ে উচ্চস্তরের প্রাণী ? বললেই হল ? বঙ্কুবাবুর হাসি পেল।

লোকটা কিন্তু আশ্চর্যভাবে বঙ্কুবাবুর মনের কথা বুঝে ফেলল। সে বলল, 'অবিশ্বাস করার কিছু নেই! প্রমাণ আছে।...তুমি ক'টা ভাষা জান ?'

বঙ্কুবাবু মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'বাংলা, ইংরিজি, আর ইয়ে..... হিন্দিটা...মানে...'

'মানে আড়াইটে।'

'হ্যাঁ...'

'আমি জানি চোদ্দ হাজার! তোমাদের সৌরজগতে এমন ভাষা নেই যা আমি জানি না। তাছাড়া আরো একত্রিশটি বাইরের গ্রহের ভাষা আমার জানা আছে। এর পঁচিশটি গ্রহে আমি গিয়েছি। তোমার বয়স কত ?'

'পঞ্চাশ'।

'আমার আটশ তেত্রিশ। তুমি জানোয়ার খাও ?'

বঙ্কুবাবু এই সেদিন কালীপূজোয় পাঁঠার মাংস খেয়েছেন—না বলেন কী করে।

অ্যাং বলল, 'আমরা খাই না। বেশ কয়েকশ' বছর হল ছেড়ে দিয়েছি। আগে খেতাম। হয়তো তোমাকেও খেতাম।'

বঙ্কুবাবু ঢোক গিললেন।

'এই জিনিসটা দেখছ ?'

অ্যাং একটা নুড়িপাথরের মত ছোট জিনিস বঙ্কুবাবুর হাতে দিল। সেটা হাতে ঠেকতেই বঙ্কুবাবুর সর্বাঙ্গে আবার এমন একটা শিহরণ খেলে গেল যে তিনি তৎক্ষণাৎ ভয়ে পাথরটা ফেরত দিলেন।

অ্যাং হেসে বলল, 'এটা আমার হাতে ছিল বলে তুমি তখন এগোতে পার নি। কেউ পারে না। শত্রুকে জখম না করে অক্ষম করার মত এমন জিনিস আর নেই।'

বঙ্কুবাবু এবার সত্যিই অবাক হতে শুরু করেছেন।

অ্যাং বলল, 'এমন কোন জায়গা বা দৃশ্য আছে যা তোমার দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু হয়ে ওঠে না ?'

বঙ্কুবাবু ভাবলেন, সারা পৃথিবীটাই তো দেখা বাকি। ভূগোল পড়ান, অথচ বাংলাদেশের গুটিকতক গ্রাম ও শহর ছাড়া আর কী দেখেছেন তিনি ? বাংলাদেশেরই বা কী দেখেছেন ? হিমালয়ের বরফ দেখেন নি, দীঘার সমুদ্র দেখেন নি, সুন্দরবনের জঙ্গল দেখেন নি, কক্সবাজার সী-বিচ দেখেন নি, এমন কি শিবপুরের গানের সেই বটগাছটা পর্যন্ত দেখেন নি।

মুখে বললেন, 'অনেক কিছুই তো দেখি নি। ধরুন গরম দেশের মানুষ, তাই নর্থ পোলটা দেখতে খুব ইচ্ছে করে।'

অ্যাং একটা ছোট কাঁচ-লাগানো নল বার করে বঙ্কুবাবুর মুখের সামনে ধরে বলল, 'এইটেয় চোখ লাগাও।'

চোখ লাগাতেই বঙ্কুবাবুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এও কী সম্ভব ? তাঁর চোখের সামনে ধূ ধূ করছে অন্তহীন বরফের মরুভূমি, তার মাঝে মাঝে মাথা উঁচিয়ে আছে পাহাড়ের মত এক-একটা বরফের চাঁই। উপরে গাঢ় নীল আকাশে রামধনুর রঙে রঙীন বিচিত্র নক্‌শা সব ক্ষণে ক্ষণে রূপ পাল্টাচ্ছে—অরোরা বোরিয়ালিস। ওটা কী ? ইগলু! ওই পোলার বেয়ারের সারি। ওই পেঙ্গুইনের দল। ওটা কোন্ বীভৎস জানোয়ার ? ভালো করে দেখে বঙ্কুবাবু চিনলেন—সিন্ধুঘোটক। একটা নয়, দুটো—প্রচণ্ড লড়াই চলছে। মূলোর মত জোড়া দাঁত একটা আর একটার গায়ে বসিয়ে দিল। শুভ্র বরফের গায়ে লাল রক্তের স্রোত!...

পৌষ মাসের শীতে বরফের দৃশ্য দেখে বঙ্কুবাবুর ঘাম ঝরতে শুরু করল।

অ্যাং বলল, 'ব্রেজিলে যেতে ইচ্ছে করে না ?'

বঙ্কুবাবুর মনে পড়ে গেল—সেই মাংসখেকো পিরান্‌হা মাছ। আশ্চর্য। লোকটা তাঁর মনের কথা টের পায় কী করে ?

বঙ্কুবাবু আবার চোখ লাগালেন।

গভীর জঙ্গল। দুর্ভেদ্য অন্ধকারে লতাপাতার ফাঁক দিয়ে গলে আসা ইতস্তত রোদের ছিটেফোঁটা, একপাশে একটা প্রকাণ্ড গাছ, তা থেকে ঝুলছে ওটা কী ? সর্বনাশ! এত বড় সাপ বঙ্কুবাবু জীবনে কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল কোথায় যেন পড়েছেন ব্রেজিলের অ্যানাকন্ডা। অজগরের বাবা। কিন্তু মাছ কই ? ওই যে একটা খাল। দু'পাশে ডাঙ্গায় কুমির রোদ পোয়াচ্ছে। সার সার কুমির—তার একটা নড়ে ওঠে। জলে নামবে। ওই নেমে গেল সড়াত—বঙ্কুবাবু যেন শব্দটাও শুনতে পেলেন। কিন্তু এ কী ব্যাপার ? কুমিরটা এমন বিদ্যুদ্বেগে জল ছেড়ে উঠে এল। কেন ? কিন্তু এ কী সেই কুমির ? বঙ্কুবাবু বিস্ফারিত চোখে দেখলেন যে কুমিরটার তলার অংশটায় মাংস বলে প্রায় কিছুই নেই, খালি হাড়। আর শরীরের বাকী অংশটা গোগ্রাসে গিলে চলেছে পাঁচটি দাঁতালো রাক্ষুসে মাছ। পিরান্‌হা মাছ!

বঙ্কুবাবু আর দেখতে পারলেন না। তাঁর হাত-পা কাঁপছে, মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

অ্যাং বলল, 'এখন বিশ্বাস হয় আমরা শ্রেষ্ঠ ?'

বঙ্কুবাবু জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন, 'তা তো বটেই। নিশ্চয়ই। বিলক্ষণ। একশোবার।'

অ্যাং বলল, 'বেশ। তোমায় দেখে এবং তোমার হাত-পা টিপে মনে হচ্ছে যে তুমি নিকৃষ্ট প্রাণী হলেও, মানুষ হিসেবে খারাপ নও। তবে তোমার দোষ হচ্ছে যে তুমি অতিরিক্ত নিরীহ, তাই তুমি জীবনে উন্নতি করনি। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা বা নীরবে অপমান সহ্য করা এসব শুধু মানুষ কেন, কোন প্রাণীরই শোভা পায় না। যাক, তোমার সঙ্গে আলাপ হবার কথা ছিল না, হয়ে ভালোই লাগল। তবে পৃথিবীতে বেশি সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি বরং আসি।'

বঙ্কুবাবু বললেন, 'আসুন অ্যাংবাবু। আমিও আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব...'

বঙ্কুবাবুর কথা আর শেষ হল না, চক্ষের পলকে কখনও যে অ্যাং রকেটে উঠে পড়ল, এবং কখন যে সেই রকেট পঞ্চা ঘোষের বাঁশবন ছেড়ে উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল, তা যেন বঙ্কুবাবু টেরই পেলেন না। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল যে আবার ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করেছে। রাত হয়ে গেল অনেক।

বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে বঙ্কুবাবু তাঁর মনে একটা আশ্চর্য ভাব অনুভব করলেন। কত বড় একটা ঘটনা যে তাঁর জীবনে ঘটে গেল, এই কিছুক্ষণ আগেও তিনি সেটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি। কোথাকার কোন্

সৌরজগতের এক গ্রহ, তার নামও হয়তো কেউ শোনে নি, তারই একজন লোক—লোক তো নয়, অ্যাং—তাঁর সঙ্গে এসে আলাপ করে গেল। কী আশ্চর্য। কী অদ্ভুত। সারা পৃথিবীতে আর কারো সঙ্গে নয়, কেবল তাঁর সঙ্গে। তিনি, শ্রীবঙ্কুবিহারী দত্ত, কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি ইস্কুলে ভূগোল ও বাংলার শিক্ষক। আজ, এই এখন থেকে, অন্তত একটা অভিজ্ঞতায়, তিনি সারা পৃথিবীতে এক ও অদ্বিতীয়।

বঙ্কুবাবু দেখলেন, তিনি আর হাঁটছেন না, নাচছেন।

পরদিন রবিবার। শ্রীপতিবাবুর বাড়িতে জোর আড্ডা। কালকের আলোর খবরটা আজ কাগজে বেরিয়েছে, তবে নেহাতই নগণ্যের পর্যায়ে। বাংলাদেশের মাত্র দু-একটা জায়গা থেকে আলোটা দেখতে পাওয়ার খবর এসেছে। তাই সেটাকে ফ্লাইং সসার বা উড়ন্ত পিরিচের মত গুজবের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আজ পঞ্চ ঘোষও আড্ডায় এসেছেন। তাঁর চল্লিশ বিঘের বাঁশবাগানের মধ্যে যে ডোবাটা আছে, তার চারপাশের দশটা বাঁশঝাড় নাকি রাতারাতি একেবারে নেড়া হয়ে গেছে। শীতকালে বাঁশের শুকনো পাতা ঝরে বটে, কিন্তু এইভাবে হঠাৎ নেড়া হয়ে যাওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক, এই বিষয়েই কথা হচ্ছিল, এমন সময় ভৈরব চক্কোত্তি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আজ বঙ্কুর দেরী কেন?'

তাই তো, এতক্ষণ কারো খেয়াল হয় নি।

নিধু মোক্তার বললেন, 'ব্যাঁকা কি আর সহজে এমুখো হবে? কাল মুখ খুলতে গিয়ে যা দাবড়ানি খেয়েছে।'

শ্রীপতিবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তা বললে চলবে কেন? বঙ্কুকে যে চাই। রামকানাই, তুমি একবার যাও তো দেখি ধরে নিয়ে আসতে পার কিনা।'

রামকানাই 'চা-টা খেয়েই যাচ্ছি' বলে সবে পেয়ালায় চুমুক দিতে গেছে এমন সময় বঙ্কুবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন।

ঢুকলেন বললে অবিশ্যি কিছুই বলা হল না। একটা ছোটখাট বৈশাখী ঝড় যেন একটি বেঁটেখাটো মানুষের বেশে প্রবেশ করে সবাইকে থমথমিয়ে দিল।

তারপর ঝড়ের খেলা। প্রথমে পুরো এক মিনিট ধরে বঙ্কুবাবু অট্টহাসি হাসলেন—সে হাসি এর আগে কেউ কোনদিন শোনে নি, তিনি নিজেও শোনেন নি।

তারপর হাসি থামিয়ে একটা প্রচণ্ড গলা-খাঁকরানি দিয়ে গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলেন, 'বন্ধগণ! আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আজ এই আড্ডায় আমার শেষদিন। আপনাদের দলটি ছাড়ার আগে আমি কয়েকটি কথা আপনাদের বলে যেতে চাই এবং তাই আজ এখানে আসা। এক নম্বর—সেটা সকলের সম্বন্ধেই খাটে—আপনারা সবাই বড্ড বাজে বকেন। যে বিষয়ে জানেন

না, সে বিষয়ে বেশি কথা বললে লোকে বোকা বলে। দুই নম্বর—এটা চণ্ডীবাবুকে বলছি---আপনাদের বয়সে পরের ছাতা-জুতো লুকিয়ে রাখা শুধু অন্যায় নয়, ছেলেমানুষী। দয়া করে আমার ছাতাটা ও খয়েরি ক্যাম্বিসের জুতোটা কালকের মধ্যে আমার বাড়িতে পৌঁছে দেবেন। নিধুবাবু আপনি যদি আমাকে ব্যাঁকা বলে ডাকেন তবে আমি আপনাকে ছ্যাঁদা বলে ডাকব, আপনাকে সেইটেই মেনে নিতে হবে। আর শ্রীপতিবাবু—আপনি গণ্যমান্য লোক, আপনার মোসাহেবের প্রয়োজন হবে বই কি। কিন্তু জেনে রাখুন যে আজ থেকে আমি আর ও-দলে নেই; যদি বলেন তো আমার পোষা হুলোটাকে পাঠিয়ে দিতে পারি—ভালো পা চাটতে পারে।...ওহো, পঞ্চাবাবুও এসেছেন দেখছি—আপনাকেও খবরটা দিয়ে রাখি—কাল রাত্রে ক্রেনিয়াস গ্রহ থেকে একটি অ্যাং এসে আপনার বাঁশবাগানের ডোবাটির মধ্যে নেমেছিল। আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে। লোকটি—থুড়ি, অ্যাংটি—ভারি ভালো।'

এই বলে বঙ্কুবাবু তাঁর বাঁ হাত দিয়ে ভৈরব চক্কোত্তির পিঠে একটা চাপর মেরে বিষম খাইয়ে সদর্পে শ্রীপতিবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই রামকানাই-এর হাত থেকে চা-ভর্তি পেয়ালাটা পড়ে গিয়ে সব্বাই-এর কাপড়ে-চোপড়ে গরম চা ছিটিয়ে চুরমার হয়ে গেল।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

ফ্রি ৎ স

জয়ন্তর দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকে তাকে প্রশ্নটা না করে পারলাম না। 'তোকে আজ যেন কেমন মনমরা মনে হচ্ছে ? শরীর-টরীর খারাপ নয় ত ?' জয়ন্ত তার অন্যমনস্ক ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে একটা ছেলেমানুষী হাসি হেসে বলল, 'না! শরীর ত খারাপ নয়ই, বরং অলরেডি অনেকটা তাজা লাগছে। জায়গাটা সত্যিই ভালো।'

'তোর তো চেনা জায়গা। আগে জানতিস না ভালো ?

'প্রায় ভুলে গেস্‌লাম।' জয়ন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'অ্যাদ্দিন বাদে আবার ক্রমে ক্রমে মনে পড়ছে। বাংলোটা ত'মনে হয় ঠিক আগের মতোই আছে। ঘরগুলোরও বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। ফার্নিচারও কিছু কিছু সেই পুরনো আমলেরই রয়েছে বলে মনে হয়। যেমন এই বেতের টেবিল আর চেয়ারগুলো।'

বেয়ারা ট্রেতে চা আর বিস্কুট দিয়ে গেল। সবে চারটে বাজে, কিন্তু এর মধ্যেই রোদ পড়ে এসেছে। টি-পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে জিগ্যেস করলাম, 'কদ্দিন বাদে এলি ?'

জয়ন্ত বলল, 'একত্রিশ বছর। তখন আমার বয়স ছিল ছয়।'

আমরা যেখানে বসে আছি সেটা বুন্দি শহরের সার্কিট হাউসের বাগান। আজ সকালেই এসে পৌঁছেছি। জয়ন্ত আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমরা এক ইস্কুলে ও এক কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। এখন ও একটা খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি করে, আর আমি করি ইস্কুল মাস্টারি। চাকুরি জীবনে দু'জনের মধ্যে ব্যবধান এসে গেলেও বন্ধুত্ব টিকে আছে ঠিকই। রাজস্থান ভ্রমণের প্ল্যান আমাদের অনেক দিনের। দু'জনের এক সঙ্গে ছুটি পেতে অসুবিধা হচ্ছিল, অ্যাদ্দিনে সেটা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ লোকেরা রাজস্থান গেলে আগে জয়পুর-উদয়পুর-চিতোরটাই দেখে—কিন্তু জয়ন্ত প্রথম থেকেই 'বুন্দি'র উপর জোর দিচ্ছিল। আমিও আপত্তি করিনি, কারণ ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'বুন্দির কেল্লা' নামটার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল, সে কেল্লা এতদিনে চাক্ষুষ দেখার

সুযোগ হবে সেটা ভাবতে মন্দ লাগছিল না। বুন্দি অনেকেই আসে না; তবে তার মানে এই নয় যে এখানে দেখার তেমন কিছুই নেই। ঐতিহাসিক ঘটনার দিক দিয়ে বিচার করলে উদয়পুর-যোধপুর-চিতোরের মূল্য হয়ত অনেক বেশি, কিন্তু সৌন্দর্যের বিচারে বুন্দি কিছু কম যায় না।

জয়ন্ত বুন্দি সম্পর্কে এত জোর দিয়ে বলাতে প্রথমে একটু অদ্ভুত লেগেছিল; ট্রেনে আসতে আসতে কারণটা জানতে পারলাম। সে ছেলেবেলায় একবার নাকি বুন্দিতে এসেছিল, তা সেই পুরোন স্মৃতির সঙ্গে নতুন করে জায়গাটাকে মিলিয়ে দেখার একটা ইচ্ছে তার মনে অনেকদিন থেকেই ঘোরা-ফেরা করছে। জয়ন্তর বাবা অনিমেষ দাশগুপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগে কাজ করতেন, তাই তাঁকে মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক জায়গাগুলোতে ঘুরে বেড়াতে হত। এই সুযোগেই জয়ন্তর বুন্দি দেখা হয়ে যায়।

সার্কিট হাউসটা সত্যিই চমৎকার। বৃটিশ আমলের তৈরি, বয়স অন্তত শ'খানেক বছর ত বটেই। একতলা বাড়ি, টালি বসানো ঢালু ছাত, ঘরগুলো উঁচু উঁচু, উপর দিকে স্কাইলাইট দড়ি দিয়ে টেনে ইচ্ছেমতো খোলা বা বন্ধ করা যায়। পূব দিকে বারান্দা। তার সামনে প্রকাণ্ড কম্পাউন্ডে কেয়ারি করা বাগানে গোলাপ ফুটে রয়েছে। বাগানের পিছন দিকটায় নানারকম বড় বড় গাছে অজস্র পাখির জটলা। টিয়ার ত ছড়াছড়ি। ময়ূরের ডাকও মাঝে মাঝে শোনা যায়, তবে সেটা কম্পাউন্ডের বাইরে থেকে।

আমরা সকালে পৌঁছেই আগে একবার শহরটা ঘুরে দেখে এসেছি। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বসানো বুন্দির বিখ্যাত কেল্লা। আজ দূর থেকে দেখেছি, কাল একেবারে ভিতরে গিয়ে দেখব। শহরে ইলেকট্রিক পোস্টগুলো না থাকলে মনে হত যেন আমরা সেই প্রাচীন রাজপুত আমলে চলে এসেছি। পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা, বাড়ির সামনের দিকে দোতলা থেকে ঝুলে পড়া অদ্ভুত সব কারুকার্য করা বারান্দা, কাঠের দরজাগুলোতে নিপুণ হাতের নক্‌শা—দেখে মনেই হয় না যে আমরা যান্ত্রিক যুগে বাস করছি।

এখানে এসে অবধি লক্ষ্য করেছি জয়ন্ত সচরাচর যা বলে তার চেয়ে একটু কম কথা বলছে। হয়ত অনেক পুরোন স্মৃতি তার মনে ফিরে আসছে। ছেলেবেলার কোনো জায়গা অনেকদিন পরে ফিরে এলে মনটা উদাস হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। আর জয়ন্ত যে সাধারণ লোকের চেয়ে একটু বেশি ভাবুক সেটা ত সকলেই জানে।

চায়ের পেয়ালা হাত থেকে নামিয়ে রেখে জয়ন্ত বলল, 'জানিস শঙ্কর, ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত। প্রথমবার যখন এখানে আসি, মনে আছে এই চেয়ারগুলিতে আমি পা তুলে বাবু হয়ে বসতাম। মনে হত যেন একটা সিংহাসনে

বসে আছি। এখন দেখছি চেয়ারগুলো আয়তনেও বড় না, দেখতেও অতি সাধারণ। সামনের যে ড্রয়িংরুম, সেটা দ্বিগুণ বড় বলে মনে হত। যদি এখানে ফিরে না আসতুম, তাহলে ছেলেবেলার ধারণাটাই কিন্তু টিকে যেত।'

আমি বললাম, 'এটাই ত স্বাভাবিক। ছেলেবেলায় আমরা থাকি ছোট; সেই অনুপাতে আশেপাশের জিনিসগুলোকে বড় মনে হয়। আমরা বয়সের সঙ্গে বাড়ি, কিন্তু জিনিসগুলো ত বাড়ে না!'

চা খাওয়া শেষ করে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে জয়ন্ত হঠাৎ হাঁটা থামিয়ে বলে উঠল,—'দেবদারু।'

কথাটা শুনে আমি একটু অবাক হয়ে তার দিকে চাইলাম। জয়ন্ত আবার বলল, 'একটা দেবদারু গাছ—ওই ওদিকটায় থাকার কথা।'

এই বলে সে দ্রুতবেগে গাছপালার মধ্যে দিয়ে কম্পাউন্ডের কোণের দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ একটা দেবদারু গাছের কথা জয়ন্ত মনে রাখল কেন?

কয়েক সেকেন্ড পরেই জয়ন্তর উল্লসিত কণ্ঠস্বর পেলাম, 'আছে! ইট্‌স হিয়ার! ঠিক যেখানে ছিল সেখানেই—'

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'গাছ যদি থেকে থাকে ত সে যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। গাছ ত আর হেঁটে চলে বেড়ায় না!'

জয়ন্ত একটু বিরক্ত ভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'সেখানেই আছে মানে এই নয় যে আমি ভেবেছিলাম এই ত্রিশ বছরে গাছটা জায়গা পরিবর্তন করেছে। সেখানেই মানে আমি যেখানে গাছটা ছিল বলে অনুমান করেছিলাম, সেখানেই।'

'কিন্তু একটা গাছের কথা হঠাৎ মনে পড়ল কেন তোর?'

জয়ন্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে গাছের গুঁড়ির দিকে চেয়ে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, 'সেটা এখন আর কিছুতেই মনে পড়ছে না। কী একটা কারণে জানি গাছটার কাছে এসেছিলাম—কী একটা করেছিলাম। একটা সাহেব...'

'সাহেব?'

'না, আর কিছু মনে পড়ছে না। মেমোরির ব্যাপারটা সত্যিই ভারি অদ্ভুত...'

এখানে বাবুর্চির রান্নার হাত ভালো। রাত্রে ডাইনিংরুমে ওভাল শেপের টেবিলটায় বসে খেতে খেতে জয়ন্ত বলত 'তখন যে বাবুর্চিটা ছিল, তার নাম ছিল দিল্‌ওয়ার! তার বাঁ গালে একটা কাটা দাগ ছিল—ছুরির দাগ—আর চোখ দুটো সব সময় জবাফুলের মতো লাল হয়ে থাকত। কিন্তু রান্না করত খাসা।'

খাবার পরে ড্রয়িংরুমের সোফাতে বসে জয়ন্তর ক্রমে আরও পুরোনো কথা মনে পড়তে লাগল। তার বাবা কোন সোফাতে বসে চুরুট খেতেন, মা কোথায় বসে উল বুনতেন, টেবিলের উপর কী কী ম্যাগাজিন পড়ে থাকত—সবই তার মনে পড়ল।

আর এইভাবেই শেষে তার পুতুলের কথাটাও মনে পড়ে গেল।

পুতুল বলতে মেয়েদের ডল পুতুল নয়। জয়ন্তর এক মামা সুইটজারল্যান্ড থেকে এনে দিয়েছিলেন দশ-বারো ইঞ্চি লম্বা সুইসদেশীয় পোশাক পরা একটা বুড়ো মূর্তি। দেখতে নাকি একেবারে একটি খুদে জ্যান্ত মানুষ। ভেতরে যন্ত্রপাতি কিছু নেই, কিন্তু হাত পা আঙুল কোমর আছে এমনভাবে তৈরি যে ইচ্ছেমতো ব্যাঁকানো যায়। মুখে একটা হাসি লেগেই আছে। মাথার উপর ছোট্ট হল্‌দে পালক গোঁজা সুইস পাহাড়ী টুপি। এছাড়া পোশাকের খুঁটিনাটিতেও নাকি কোনরকম ভুল নেই—বেল্ট বোতাম পকেট কলার মোজা—এমনকি জুতোর বক্‌লসটা পর্যন্ত নিখুঁত।

প্রথমবার বুন্দিতে আসার কয়েকমাস আগেই জয়ন্তর মামা বিলেত থেকে ফেরেন, আর এসেই জয়ন্তকে পুতুলটা দেন। সুইটজারল্যান্ডের কোন এক বুড়োর কাছ থেকে পুতুলটা কেনেন তিনি। বুড়ো নাকি ঠাট্টা করে বলে দিয়েছিল, 'এর নাম ফ্রিৎস। এই নামে ডাকবে একে। অন্য নামে ডাকলে কিন্তু জবাব পাবে না।'

জয়ন্ত বলল, 'আমি ছেলেবেলায় খেলনা অনেক পেয়েছি। বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে ছিলাম বলেই বোধহয় তাঁরা এই ব্যাপারে আমাকে কখনো বঞ্চিত করেননি। কিন্তু মামার দেওয়া এই ফ্রিৎস-কে পেয়ে কি যে হল—আমি আমার অন্য সমস্ত খেলনার কথা একেবারে ভুলে গেলাম। রাত দিন ওকে নিয়েই পড়ে থাকতাম; এমনকি শেষে একটা সময় এলো যখন আমি ফ্রিৎস-এর সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা দিব্যি আলাপ চালিয়ে যেতাম। এক তরফা আলাপ অবিশ্যি, কিন্তু ফ্রিৎস-এর মুখে এমন একটা হাসি, আর ওর চোখে এমন একটি চাহনি ছিল, যে মনে হত যেন আমার কথা ও বেশ বুঝতে পারছে। এক এক সময় আমাদের আলাপটা হয়ত একতরফা না হয়ে দু'তরফা হত। এখন ভাবলে ছেলেমানুষী পাগলামী বলে মনে হয়, কিন্তু তখন আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল ভীষণ 'রিয়েল'। বাবা-মা বারণ করতেন অনেক, কিন্তু আমি কারুর কথা শুনতাম না। তখনও আমি ইস্কুলে যেতে শুরু করিনি, কাজেই ফ্রিৎস-কে দেবার জন্য সময়ের অভাব ছিল না আমার।'

এই পর্যন্ত বলে জয়ন্ত চুপ করল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি রাত সাড়ে ন'টা—বুন্দি শহর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আমরা সার্কিট হাউসের বৈঠকখানায় একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসে আছি।

আমি বললাম, 'পুতুলটা কোথায় গেল ?'

জয়ন্ত এখনও যেন কী ভাবছে। উত্তরটা এত দেরিতে এলো যে আমার মনে হচ্ছিল প্রশ্নটা বুঝি ওর কানেই যায়নি।

'পুতুলটা বুন্দিতে নিয়ে এসেছিলাম। এখানে নষ্ট হয়ে যায়।'

'নষ্ট হয়ে যায় ?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'কী ভাবে ?'

জয়ন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'একদিন বাইরে বাগানে বসে চা খাচ্ছিলাম আমরা। পুতুলটাকে পাশে ঘাসের উপর রেখেছিলাম। কাছে কতগুলো কুকুর জটলা করছিল। তখন আমার যা বয়স, তাতে চা খাবার কথা নয়, কিন্তু জেদ করে চা নিয়ে খেতে খেতে হঠাৎ পেয়ালাটা কাত হয়ে খানিকটা গরম চা আমার প্যান্টে পড়ে যায়। বাংলোয় এসে প্যান্ট বদল করে বাইরে ফিরে গিয়ে দেখি পুতুলটা নেই। খোঁজাখুঁজির পর দেখি আমার ফ্রিৎসকে নিয়ে দুটো রাস্তার কুকুর দিব্যি টাগ-অফ-ওয়ার খেলছে। জিনিসটা খুবই মজবুত ছিল তাই ছিঁড়ে আলগা হয়ে যায়নি। তবে চোখমুখ ক্ষত বিক্ষত হয়ে জামা কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ আমার কাছে ফ্রিৎস-এর আর অস্তিত্বই ছিল না। হি ওয়াজ ডেড।'

'তারপর ?' ভারি আশ্চর্য লাগছিল জয়ন্তর এই কাহিনী।

'তারপর আর কি ? যথাবিধি ফ্রিৎস-এর সৎকার করি!'

'তার মানে ?'

'ওই দেবদারু গাছটার নীচে ওকে কবর দিই। ইচ্ছে ছিল কফিন জাতীয় একটা কিছু জোগাড় করা—সাহেব ত! একটা বাক্স থাকলেও কাজ চলত, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিছুই পেলাম না। তাই শেষটায় এমনিই পুঁতে ফেলি।'

এতক্ষণে দেবদারু গাছের রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হল।

দশটা নাগাৎ ঘুমোতে চলে গেলাম।

একটা বেশ বড় বেডরুমে দুটো আলাদা খাটে আমাদের বিছানা। কলকাতায় হাঁটার অভ্যেস নেই, এমনিতেই বেশ ক্লান্ত লাগছিল, তার উপর বিছানায় ডানলোপিলো। বালিশে মাথা দেবার দশ মিনিটের মধ্যেই ঘুম এসে গেল।

রাত তখন ক'টা জানি না, একটা কিসের শব্দে জানি ঘুমটা ভেঙে গেল। পাশ ফিরে দেখি জয়ন্ত সোজা হয়ে বিছানার উপর বসে আছে। আর পাশের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে, আর সেই আলোয় তার চাহনিতে উদ্বেগের ভাবটা স্পষ্ট ধরা পড়ছে। জিগ্যেস করলাম, 'কী হল ? শরীর খারাপ লাগছে নাকি ?'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে আমাকে একটা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'সার্কিট হাউসে বেড়াল বা ইঁদুর জাতীয় কিছু আছে নাকি ?'

বললাম, 'থাকাটা কিছুই আশ্চর্য না। কিন্তু কেন বল ত ?'

'বুকের উপর দিয়ে কি যেন একটা হেঁটে গেল। তাই ঘুমটা ভেঙে গেল।'

আমি বললাম, 'ইঁদুর জিনিসটা সচরাচর নর্দমা-টর্দমা দিয়ে ঢোকে। আর খাটের উপর ইঁদুর ওঠে বলে ত জানা ছিল না।'

জয়ন্ত বলল, 'এর আগেও একবার ঘুমটা ভেঙেছিল, তখন জানালার দিক থেকে একটা খচখচ শব্দ পাচ্ছিলাম।'

'জানালায় যদি আওয়াজ পেয়ে থাকিস তাহলে বেড়ালের সম্ভাবনাটাই বেশি।'

'কিন্তু তাহলে...'

জয়ন্তর মন থেকে যেন খট্‌কা যাচ্ছে না। বললাম, 'বাতিটা জ্বালার পর কিছু দেখতে পাসনি?'

'নাথিং। অবিশ্যি ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই বাতিটা জ্বালিনি। প্রথমটা বেশ হকচকিয়ে গেসলাম। সত্যি বলতে কি, একটু ভয়ই করছিল, আলো জ্বালার পর কিছুই দেখতে পাইনি।'

'তার মানে যদি কিছু এসে থাকে তাহলে সেটা ঘরের মধ্যেই আছে?'

'তা দরজা যখন দুটোই বন্ধ...'

আমি চট করে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের আনাচে কানাচে, খাটের তলায় সুটকেসের পিছনে একবার খুঁজে দেখে নিলাম। কোথাও কিছু নেই। বাথরুমের দরজাটা ভেজানো ছিল; সেটার ভেতরেও গেছি, এমন সময় জয়ন্ত চাপা গলায় ডাক দিল।

'শঙ্কর!'

ফিরে এলাম ঘরে। জয়ন্ত দেখি তার লেপের সাদা ওয়াড়টার দিকে চেয়ে আছে। আমি তার দিকে এগিয়ে যেতে সে লেপের একটা অংশ ল্যাম্পের দিকে এগিয়ে বলল, 'এটা কী দ্যাখ তো।'

কাপড়টার উপর ঝুঁকে পড়ে দেখি তাতে হাল্‌কা খয়েরি রঙের ছোট ছোট গোল গোল কিসের ছাপ পড়েছে। বললাম, 'বিড়ালের থাবা হলেও হতে পারে।'

জয়ন্ত কিছু বলল না। বেশ বুঝতে পারলাম কী কারণে জানি সে ভারি চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এদিকে রাত আড়াইটা বাজে। এত কম ঘুমে আমার ক্লান্তি দূর হবে না, তাছাড়া কালকেও সারাদিন ঘোরাঘোরি আছে। তাই, আমি পাশে আছি, কোন ভয় নেই, ছাপগুলো আগে থেকেই থাকতে পারে, ইত্যাদি বলে কোনরকমে তাকে আশ্বাস দিয়ে বাতি নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। আমার কোন সন্দেহ ছিল না যে জয়ন্ত যে অভিজ্ঞতার কথাটা বলল সেটা আসলে তার স্বপ্নের অন্তর্গত। বুন্দিতে এসে পুরোন কথা মনে পড়ে ও একটা মানসিক উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে, আর তার থেকেই বুকে বেড়াল হাঁটার স্বপ্নের উদ্ভব হয়েছে।

রাত্রে আর কোন ঘটনা ঘটে থাকলেও আমি সে বিষয়ে কিছু জানতে পারিনি, আর জয়ন্তও সকালে উঠে নতুন কোন অভিজ্ঞতার কথা বলে নি। তবে তাকে

দেখে এটুকু বেশ বুঝতে পারলাম যে রাত্রে তার ভালো ঘুম হয়নি। মনে মনে স্থির করলাম যে আমার কাছে যে ঘুমের বড়িটা আছে, আজ রাত্রে শোবার আগে জয়ন্তকে খাইয়ে দেব।

আমার প্ল্যান অনুযায়ী আমরা ব্রেকফাষ্ট সেরে ন'টার সময় বুন্দির কেল্লা দেখতে গেলাম। গাড়ির ব্যবস্থা করা ছিল আগে থেকেই। কেল্লায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে হয়ে গেল প্রায় সাড়ে ন'টা।

এখানে এসেও দেখি জয়ন্তর সব ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে তার সঙ্গে তার পুতুলের কোন সম্পর্ক নেই। সত্যি বলতে কি, জয়ন্তর ছেলেমানুষী উল্লাস দেখে মনে হচ্ছিল সে বোধহয় পুতুলের কথাটা ভুলেই গেছে। একেকটা জিনিস দেখে আর চেঁচিয়ে ওঠে,—'ওই যে গেটের মাথায় সেই হাতি! ওই সে সেই গম্বুজ! এই সেই রূপোর খাট আর সিংহাসন! ওই যে দেয়ালে আঁকা ছবি!...'

কিন্তু ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই তার ফূর্তি কমে এলো। আমি নিজে এত তন্ময় ছিলাম যে প্রথমে সেটা বুঝতে পারিনি। একটা লম্বা ঘরের ভিতর দিয়ে হাঁটছি আর সিলিং-এর দিকে চেয়ে ঝাড় লণ্ঠনগুলো দেখছি, এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হল জয়ন্ত আমার পাশে নেই। কোথায় পালাল সে?

আমাদের সঙ্গে একজন গাইড ছিল, সে বলল বাবু বাইরে ছাতের দিকটায় গেছে।

দরবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখি জয়ন্ত বেশ খানিকটা দূরে ছাতের উল্টো দিকে পাঁচিলের পাশে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে আপন চিন্তায় এমনই মগ্ন যে আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতেও তার অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। শেষটায় আমি নাম ধরে ডাকতে সে চমকে উঠল। বললাম, 'কী হয়েছে তোর ঠিক করে বলত। এমন চমৎকার জায়গায় এসেও তুই মুখ ব্যাজার করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবি---এ আমার বরদাস্ত হচ্ছে না।'

জয়ন্ত শুধু বলল, 'তোর দেখা শেষ হয়েছে কি? তাহলে এবার...'

আমি একা হলে নিশ্চয়ই আরো কিছুক্ষণ থাকতাম কিন্তু জয়ন্তর ভাবগতিক দেখে সার্কিট হাউসে ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম।

পাহাড়ের গা দিয়ে বাঁধানো রাস্তা শহরের দিকে গিয়েছে। আমরা দুজনে চুপচাপ গাড়ির পিছনে বসে আছি। জয়ন্তকে সিগারেট অফার করতে সে নিল না। তার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করলাম যেটা প্রকাশ পাচ্ছিল তার হাত দুটোর অস্থিরতায়। হাত একবার গাড়ির জানালায় রাখছে, একবার কোলের উপর, পরক্ষণেই আবার আঙুল মটকাচ্ছে, না হয় নখ কামড়াচ্ছে। জয়ন্ত এমনিতে শান্ত মানুষ। তাকে এভাবে ছটফট করতে দেখে আমার ভারি অসোয়াস্তি লাগছিল।

মিনিট দশেক এই ভাবে চলার পর আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, 'তোর দুশ্চিন্তার কারণটা বললে হয়ত তোর কিছুটা উপকার হতে পারে।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল, 'বলে লাভ নেই, কারণ তুই বিশ্বাস করবি না।'

'বিশ্বাস না করলেও, বিষয়টা নিয়ে অন্তত তোর সঙ্গে আলোচনা করতে পারব।'

'কাল রাত্রে ফ্রিৎস আমাদের ঘরে এসেছিল। লেপের উপর ছাপগুলো সব ফ্রিৎসের পায়ের ছাপ।'

একথার পর অবিশ্যি জয়ন্তর কাঁধ ধরে দুটো ঝাঁকুনি দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছু করার থাকে না। যার মাথায় এমন একটা প্রচণ্ড আজগুবি ধারণা আশ্রয় নিয়েছে, তাকে কি কিছু বলে বোঝানো যায়? তবু বললাম, 'তুই নিজের চোখে ত দেখিস নি কিছুই।'

'না—তবে বুকের উপর যে জিনিসটা হাঁটছে সেটা সে চারপেয়ে নয়, দু পেয়ে, সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম।'

সার্কিট হাউসে এসে গাড়ি থেকে নামার সময় মনে মনে স্থির করলাম জয়ন্তকে একটা নার্ভ টনিক গোছের কিছু দিতে হবে। শুধু ঘুমের বড়িতে হবে না। ছেলেবেলার সামান্য একটা স্মৃতি একটা সাঁইত্রিশ বছরের জোয়ান মানুষকে এত উদ্ব্যস্ত করে তুলবে—এ কিছুতেই হতে দেওয়া চলে না।

ঘরে এসে জয়ন্তকে বললাম, 'বারোটা বাজে, স্নানটা সেরে ফেললে হত না?'

জয়ন্ত 'তুই আগে যা' বলে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

স্নান করতে করতে আমার মাথায় ফন্দি এল। জয়ন্তকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার বোধহয় এই একমাত্র রাস্তা।

ফন্দিটা এই—ত্রিশ বছর আগে যদি পুতুলটাকে একটা বিশেষ জায়গায় মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়ে থাকে, আর সেই জায়গাটা কোথায় তা যদি জানা থাকে, সেখানে মাটি খুঁড়লে আস্ত পুতুলটাকে আগের অবস্থায় না পেলেও, তার কিছু অংশ এখনো নিশ্চয়ই পাবার সম্ভাবনা আছে। কাপড় জামা মাটির তলায় ত্রিশ বছর থেকে যেতে পারে না; কিন্তু ধাতুর জিনিস যেমন ফ্রিৎসের বেল্টের বকলস বা কোটের পেতলের বোতাম—এসব জিনিসগুলো টিকে থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়। জয়ন্তকে যদি দেখানো যায় যে তার সাধের পুতুলের শুধু ওই জিনিসগুলোই অবিশিষ্ট আছে, আর সব মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তাহলে হয়ত তার মন থেকে এই উদ্ভট ধারণা দূর হবে। এ না করলে প্রতিরাত্রেই সে আজগুবি স্বপ্ন দেখবে আর সকালে উঠে বলবে, ফ্রিৎস আমার বুকের উপর হাঁটাহাঁটি করছিল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তার মাথাটা বিগড়ে যাওয়া অসম্ভব না।

জয়ন্তকে ব্যাপারটা বলতে তার ভাব দেখে মনে হল ফন্দিটা তার মনে ধরেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে সে বলল, 'খুঁড়বে কে ? কোদাল কোথায় পাব ?'

আমি হেসে বললাম, 'এত বড় বাগান যখন রয়েছে তখন মালীও একটা নিশ্চয়ই আছে। আর মালী থাকা মানেই কোদালও আছে। লোকটাকে কিছু বকশিস দিলে সে মাঠের এক প্রান্তে একটা গাছের গুঁড়ির পাশে খানিকটা মাটি খুঁড়ে দেবে না—এটা বিশ্বাস করা কঠিন।'

জয়ন্ত তৎক্ষণাৎ রাজী হল না। আমিও আর কিছু বললাম না। আরো দু'একবার হুম্‌কি দেবার পর সে স্নানটা সেরে এল। এমনিতে খাইয়ে লোক হলেও, দুপুরে সে মাত্র দুখানা হাতের রুটি আর সামান্য মাংসের কারি ছাড়া আর কিছুই খেল না। খাওয়া সেরে বাগানের দিকের বারন্দায় গিয়ে বেতের চেয়ারে বসে রইলাম দুজনে। আমরা ছাড়া সার্কিট হাউসে আর কেউ নেই। দুপুরটা থমথমে। ডানদিকে নুড়ি ফেলা রাস্তার ওপাশে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছে হনুমান বসে আছে, মাঝে মাঝে তাদের হুপ্ হুপ্ ডাক শোনা যাচ্ছে।

তিনটে নাগাদ একটা পাগড়ি পরা লোক হাতে একটা ঝারি নিয়ে বাগানে এল। লোকটার বয়স হয়েছে। চুল গোঁফ গালপাট্টা সবই ধপধপে সাদা।

'তুমি বলবে, না আমি ?'

জয়ন্তর প্রশ্নটা শুনে আমি তার দিকে আশ্বাসের ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে ইশারা করে চেয়ার ছেড়ে উঠে সোজা চলে গেলাম মালীটার দিকে।

মাটি খোঁড়ার প্রস্তাবে মালী প্রথমে কেমন জানি অবাক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। বোঝা গেল এমন প্রস্তাব তাকে এর আগে কেউ কোনদিন করেনি। তার 'কাহে বাবু ?' প্রশ্নতে আমি তার কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় বললাম, 'কারণটা না হয় নাই জানলে। পাঁচ টাকা বকশিস দেব—যা বলছি করে দাও।'

বলা বাহুল্য মালী তাতে শুধু রাজীই হল না, দন্ত বিকশিত করে সেলাম-টেলাম ঠুকে এমন দেখালো যেন সে আমাদের চিরকালের কেনা গোলাম।

বারান্দায় বসা জয়ন্তকে হাতছানি দিয়ে ডাকলাম। সে চেয়ার ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। কাছে এলে বুঝলাম তার মুখ অস্বাভাবিক রকম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আশা করি খোঁড়ার ফলে পুতুলের কিছুটা অংশ অন্তত পাওয়া যাবে।

মালী ইতিমধ্যে কোদাল নিয়ে এসেছে। আমরা তিনজনে দেবদারু গাছটার দিকে এগোলাম।

গাছের গুঁড়িটার থেকে হাত দেড়েক দূরে একটা জায়গার দিকে হাত দেখিয়ে জয়ন্ত বলল, 'এইখানে।'

'ঠিক মনে আছে ত তোর ? আমি জিগ্যেস করলাম।

জয়ন্ত মুখে কিছু না বলে কেবল মাথাটা একবার নাড়িয়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিল।

'কতটা নিচে পুঁতেছিলি ?'

'এক বিঘত ত হবেই।'

মালী আর দ্বিরুক্তি না করে মাটিতে কোপ দিতে শুরু করল। লোকটার রসবোধ আছে। খুঁড়তে খুঁড়তে একবার জিগ্যেস করল মাটির নিচে ধনদৌলত আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহলে তার থেকে ভাগ দেওয়া হবে কিনা। একথা শুনে আমি হাসলেও জয়ন্তর মুখে কোন হাসির আভাস দেখা গেল না। অক্টোবর মাসে বুন্দিতে গরম নেই, কিন্তু কলারের নিচে জয়ন্তর সার্ট ভিজে গেছে। সে এক দৃষ্টে মাটির দিকে চেয়ে রয়েছে। মালী কোদালের কোপ মেরে চলেছে। এখনো পুতুলের কোন চিহ্ন দেখা গেল না কেন ?

একটা ময়ূরের তীক্ষ্ম ডাক শুনে আমি মাথাটা একবার ঘুরিয়েছি, এমন সময় জয়ন্তর গলা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ পেয়ে আমার চোখটা তৎক্ষণোৎ তার দিকে চলে গেল। তার নিজের চোখ যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে। পরক্ষণেই তার কম্পমান ডান হাতটা সে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দিয়ে তর্জনীটাকে সোজা করে গর্তটার দিকে নির্দেশ করল। আঙুলটাকেও স্থির রাখতে পারছে না সে।

তারপর এক অস্বাভাবিক শুকনো ভয়ার্ত স্বরে প্রশ্ন এলো,—

'ওটা কী!'

মালীর হাত থেকে কোদালটা মাটিতে পড়ে গেল।

মাটির দিকে চেয়ে যা দেখলাম তাতে ভয়ে, বিস্ময়ে ও অবিশ্বাসে আপনা থেকেই আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল।

দেখলাম, গর্তের মধ্যে ধুলোমাখা অবস্থায় চিৎ হয়ে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে একটি দশ-বারো ইঞ্চি ধপধপে সাদা নিখুঁত নরকঙ্কাল!

www.alorpathsala.org

বি পি ন চৌ ধু রী র স্মৃ তি ভ্র ম

নিউ মার্কেটের কালীচরণের দোকান থেকে প্রতি সোমবার আপিস-ফেরতা বই কিনে বাড়ি ফেরেন বিপিন চৌধুরী। যত রাজ্যের ডিটেকটিভ বই, রহস্যের বই, আর ভূতের গল্প। এক সঙ্গে অন্তত খান পাঁচেক বই না কিনলে তাঁর এক সপ্তাহের খোরাক হয় না। বাড়িতে তিনি একা মানুষ। লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা তাঁর ধাতে আসে না, আড্ডার বাতিক নেই, বন্ধুপরিজনের সংখ্যাও কম। সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে যেসব কাজের লোক আসেন, তাঁরা কাজের কথা সেরে উঠে চলে যান। যাঁরা ওঠেন না বা উঠতে চান না, বিপিনবাবু তাঁদের সোয়া আটটা বাজলেই বলেন,—'আমার ডাক্তারের আদেশ আছে, সাড়ে আটটায় খাওয়া সারতে হবে। কিছু মনে করবেন না...।' খাওয়ার পর আধঘণ্টা বিশ্রাম তারপর গল্পের বই হাতে নিয়ে সোজা বিছানায়। এই নিয়ম যে কতদিন ধরে চলেছে বিপিনবাবুর নিজেরই তার হিসাব নেই।

আজ কালীচরণের দোকানে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে বিপিনবাবুর খেয়াল হল আরেকটি লোক যেন তাঁর পাশে কিছুক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে। বিপিনবাবু মুখ তুলে দেখেন একটি গোলগাল অমায়িক চেহারার ভদ্রলোক তাঁরই দিকে চেয়ে হাসছেন।

'আমায় চিনতে পারছেন না বোধহয় ?'

বিপিনবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত বোধ করলেন। কই, এঁর সঙ্গে তো কোনদিন আলাপ হয়েছে বলে তাঁর মনে পড়ে না। এমন মুখও তো মনে পড়ছে না তাঁর।

'অবিশ্যি আপনি কাজের মানুষ। অনেক রকম লোকের সঙ্গে দেখা হয় তো, রোজ—তাই বোধহয়...'

'আমার কি আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে এর আগে ?' বিপিনবাবু জিগ্যেস করলেন।

ভদ্রলোক যেন এবার একটু অবাক হয়েই বললেন,—'আজ্ঞে সাতদিন দু'বেলা সমানে দেখা হয়েছে। আমি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলুম—সেই গাড়িতে

আপনি 'হুড্রু ফল্‌স' দেখতে গেলেন। সেই নাইনটিন ফিফ্‌টি এইটে—রাঁচিতে! আমার নাম পরিমল ঘোষ।'

'রাঁচি ?' বিপিনবাবু এবার বুঝলেন যে ভুল তাঁর হয়নি, হয়েছে এই লোকটিরই। কারণ বিপিনবাবু কোনদিন রাঁচি যান নি। যাবার কথা হয়েছে অনেকবার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এবার বিপিনবাবু একটু হেসে বললেন, 'আমি কে তা আপনি জানেন কি ?'

ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে জিভ কেটে বললেন, 'আপনি কে তা জানব না ? বলেন কি ? বিপিন চৌধুরীকে কে না জানে ?'

বিপিনবাবু এবার বইয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'কিন্তু তাও আপনার ভুল হয়েছে। ওরকম হয় মাঝে মাঝে। আমি রাঁচি যাইনি কখনো।'

ভদ্রলোক এবার বেশ জোরে হেসে উঠলেন।

'কী বলছেন মিস্টার চৌধুরী ? ঝরনা দেখতে গিয়ে পাথরে হোঁচট খেয়ে আপনার হাঁটু ছড়ে গেল। আমিই শেষটায় আয়োডিন এনে দিলুম। পরদিন নেতারহাট যাবার জন্য আমি গাড়ি ঠিক করেছিলুম—আপনি পায়ের ব্যথার জন্য যেতে পারলেন না। কিচ্ছু মনে পড়ছে না ? আপনার চেনা আরেকজন লোকও তো গেস্‌লেন সেবার—দীনেশ মুখুজ্যে। আপনি ছিলেন একটা বাংলো ভাড়া করে—বললেন হোটেলের খাবার আপনার ভালো লাগে না—তার চেয়ে বাবুর্চি দিয়ে রান্না করিয়ে নেওয়া ভালো। দিনেশ মুখুজ্যে ছিলেন তাঁর বোনের বাড়িতে। আপনাদের দুজনের সেই তর্ক লেগেছিল একদিন চাঁদে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে—মনে নেই ? সব ভুলে গেলেন ? আরো বলছি—আপনার কাঁধে একটা ঝোলান ব্যাগ ছিল—তাতে গল্পের বই থাকত। বাইরে গেলে নিয়ে যেতেন। কেমন—ঠিক কিনা ?'

বিপিনবাবু এবার গম্ভীর সংযত গলায় বললেন, 'আপনি ফিফ্‌টি এইটের কোন্ মাসের কথা বলছেন বলুন তো ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'মহালয়ার ঠিক পরেই। হয় আশ্বিন, নয় কার্তিক।'

বিপিনবাবু বললেন, 'আজ্ঞে না। পুজোয় সে বছর আমি ছিলাম কানপুরে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। আপনি ভুল করছেন। নমস্কার।'

কিন্তু ভদ্রলোক গেলেন না। অবাক অপলক দৃষ্টিতে বিপিনবাবুর দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলে যেতে লাগলেন,—'কী আশ্চর্য! একদিন সন্ধ্যাবেলা আপনার বাংলোয় বসে চা খেলুম। আপনি আপনার ফ্যামিলির কথা বললেন—বললেন, আপনার ছেলেপিলে নেই, আপনার স্ত্রী বারো তেরো বছর আগে মারা গেছেন। একমাত্র ভাই পাগল ছিলেন, তাই আপনি পাগলা গারদ দেখতে যেতে চাইলেন না। বললেন, ভাইয়ের কথা মনে পড়ে যায়...'

বিপিনবাবু যখন বইয়ের দামটা দিয়ে দোকান থেকে বেরোচ্ছেন তখনও ভদ্রলোক তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন।

বারট্রাম স্ট্রীটে লাইটহাউস সিনেমার গায়ে বিপিন চৌধুরীর বুইক গাড়িটা লাগানো ছিল। তিনি গাড়িতে পৌঁছে ড্রাইভারকে বললেন, 'একটু গঙ্গার ধারটা ঘুরে চলো তো সীতারাম।' চলন্ত গাড়িতে বসে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হতেই বিপিনবাবুর আফসোস হল। বাজে ভণ্ড লোকটাকে এতটা সময় কেন মিছিমিছি দিলেন তিনি! রাঁচি তো তিনি যাননি, কখনই যেতে পারেন না। মাত্র ছ'সাত বছর আগেকার স্মৃতি মানুষে অত সহজে ভুলতে পারে না, এক যদি না—

বিপিনবাবুর মাথা হঠাৎ বন্ করে ঘুরে গেল।

এক যদি না তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে।

কিন্তু তাই বা হয় কী করে ? তিনি তো দিব্যি আপিসে কাজ করে যাচ্ছেন। এত বিরাট আপিস—এত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। কোথাও তো কোন ত্রুটি হচ্ছে বলে তিনি জানেন না। আজও তো একটা জরুরী মিটিং-এ আধঘণ্টার বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি। আশ্চর্য! অথচ—

অথচ লোকটা তাঁর এত খবর রাখল কী করে ? এ যে একেবারে নাড়ী নক্ষত্র জেনে বসে আছে। বইয়ের ব্যাগ, স্ত্রীর মৃত্যু, ভাইয়ের মাথা খারাপ! ভুল করেছে কেবল ওই রাঁচির ব্যাপারে। ভুল কেন—জেনেশুনে মিথ্যে বলছে। আটান্ন সালের পুজোয় তিনি রাঁচি যান নি; গিয়েছিলেন কানপুরে, তাঁর বন্ধু হরিদাস বাগচির বাড়িতে। হরিদাসকে লিখলেই—না, হরিদাসকে লেখার উপায় নেই।

বিপিনবাবুর হঠাৎ খেয়াল হল হরিদাস বাগচি আজ মাসখানেক হল সস্ত্রীক জাপানে গেছেন তাঁর ব্যবসার ব্যাপারে। জাপানের ঠিকানা বিপিনবাবু জানেন না। কাজেই চিঠি লিখে প্রমাণ আনানোর রাস্তা বন্ধ।

কিন্তু প্রমাণের প্রয়োজনটাই বা কোথায়। এমন যদি হত যে উনিশ শ' আটান্ন সালের আশ্বিন মাসে রাঁচিতে কোন খুনের জন্য পুলিশ তাঁকে দায়ী করার চেষ্টা করছে, তখনই তাঁর চিঠির প্রয়োজন হত হরিদাস বাগচির কাছ থেকে। এখন তো প্রমাণের কোন দরকার নেই। তিনি নিজে জানেন তিনি রাঁচি যান নি। ব্যাস, ল্যাঠা চুকে গেল।

গঙ্গার হাওয়াতে বিপিন চৌধুরীর মাথা অনেক ঠাণ্ডা হলেও, মনের মধ্যে একটা খট্‌কা, একটা অসোয়াস্তিবোধ যেন থেকেই গেল!

হেস্‌টিংস-এর কাছাকাছি এসে বিপিনবাবু তাঁর প্যান্টের কাপড়টা গুটিয়ে উপরে তুলে দেখলেন যে ডান হাঁটুতে একটা এক ইঞ্চি লম্বা কাটা দাগ রয়েছে। সেটা কবেকার দাগ তা বোঝবার কোন উপায় নেই। ছেলেবেলা কি কখনও হোঁচট খেয়ে হাঁটু ছড়ে নি বিপিন বাবুর ? অনেক চেষ্টা করেও সেটা তিনি মনে করতে পারলেন না।

চড়কডাঙার মোড়ের কাছাকাছি এসে তাঁর দীনেশ মুখুজ্যের কথাটা মনে পড়ল। লোকটা বলছিল দীনেশ মুখুজ্যে ছিল রাঁচিতে ওই একই সময়ে। তাহলে দীনেশকে জিগ্যেস করলেই তো হয়। সে থাকে কাছেই—বেণীনন্দন স্ট্রীট। এখনই যাবেন কি তার কাছে ? কিন্তু যদি রাঁচি যাওয়ার ব্যাপারটা মিথ্যেই হয়—তাহলে দীনেশকে সে সম্বন্ধে কিছু জিগ্যেস করতে গেলে তো সে বিপিনবাবুকে পাগল ঠাওরাবে। না না—এ ছেলেমানুষী তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। নিজেকে সেধে সেধে এইভাবে বোকা বানানো কোনমতেই চলতে পারে না। আর দীনেশের বিদ্রুপ যে কত নির্মম হতে পারে তার অভিজ্ঞতা বিপিনবাবুর আছে।...

বাড়ি এসে ঠাণ্ডা ঘরে বসে ঠাণ্ডা শরবত খেয়ে বিপিনবাবুর উদ্বেগটা অনেক কম বলে মনে হল। যত সব বাউণ্ডুলের দল! নিজেদের কাজকর্ম নেই, তাই কাজের লোকদের ধরে ধরে বিব্রত করা।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে নতুন বইটা পড়তে পড়তে বিপিনবাবু নিউমার্কেটের ভদ্রলোকটির কথা ভুলেই গেলেন।

পরদিন আপিসে কাজ করতে করতে বিপিনবাবু লক্ষ্য করলেন যে, যতই সময় যাচ্ছে ততই যেন গতকালের ঘটনাটা তাঁর স্মৃতিতে আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে আসছে। সেই গোলগাল মুখ, সেই ঢুলুঢুলু অমায়িক চাহনি, আর সেই হাসি। তাঁর এত ভেতরের খবরই যদি লোকটা নির্ভুল জেনে থাকে, তবে রাঁচির ব্যাপারটায় সে এত ভুল করল কী করে ?

লাঞ্চের ঠিক আগে— অর্থাৎ একটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময়—বিপিনবাবু আর থাকতে না পেরে টেলিফোনের ডিরেক্টরিটা খুলে বসলেন। দীনেশ মুখুজ্যেকে ফোন করতে হবে একটা। ফোনই ভালো। অপ্রস্তুত হবার সম্ভাবনাটা কম।

টু-থ্রি-ফাইভ-সিক্স-ওয়ান-সিক্স।

বিপিনবাবু ডায়াল করলেন।

'হ্যালো।'

'কে, দীনেশ ? আমি বিপিন কথা বলছি।'

'কী খবর ?'

'ইয়ে—ফিফ্‌টি এইটের একটা ঘটনা তোমার মনে আছে কিনা জানবার জন্য ফোন করছি।'

'ফিফ্‌টি এইট ? কী ঘটনা ?'

'সে বছরটা কি তুমি কলকাতাতেই ছিলে ? আগে সেইটে আমার জানা দরকার।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। ফিফ্‌টি এইট—আটান্ন—দাঁড়াও, আমার ডায়েরি দেখি। একটু ধরো।'

একটুক্ষণ চুপচাপ। বিপিনবাবু তাঁর বুকের ভেতর একটা দুরুদুরু কাঁপনি অনুভব করলেন। প্রায় এক মিনিট পরে আবার দীনেশ মুখুজ্যের গলা পাওয়া গেল।

'হ্যাঁ, পেয়েছি। আমি বাইরে গেস্‌লাম—দু'বার।'

'কোথায় ?'

'একবার গেস্‌লাম ফেব্রুয়ারিতে—কাছেই—কেষ্টনগর—আমার এক ভাগনের বিয়েতে। আরেকবার—ও, এটা তো তুমি জানই। সেই রাঁচি। সেই যে যেবার তুমিও গেলে। ব্যস্‌। কিন্তু কেন বলো তো ?'

'না। একটা দরকার ছিল । ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক ইউ...'

বিপিনবাবু টেলিফোনটা রেখে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর কান ভোঁ ভোঁ করছে, হাত পা যেন সব কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সঙ্গে টিফিনের বাক্সে স্যান্ডউইচ ছিল, সেটা আর তিনি খেলেন না। খাবার কোন ইচ্ছেই হল না। তাঁর খিদে চলে গেছে।

লাঞ্চ টাইম শেষ হয়ে যাবার পর বিপিনবাবু বুঝতে পারলেন, এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে আপিসে বসে কাজ করা অসম্ভব। তাঁর পঁচিশ বছরের কর্মজীবনে এর আগে এরকম কখনো হয় নি। নিরলস কর্মী বলে বিপিনবাবুর একটা খ্যাতি ছিল। কর্মচারীরা তাঁকে বাঘের মতো ভয় করত। যত বিপদই আসুক, যত বড় সমস্যারই সামনে পড়তে হোক, বিপিনবাবুর কোনদিন মতিভ্রম হয় নি। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করে সব বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন তিনি।

আজ কিন্তু তাঁর সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে!

আড়াইটের সময় বাড়ি ফিরে, শোবার ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে মনটাকে প্রকৃতিস্থ করে, কী করা উচিত সেটা ভাববার চেষ্টা করলেন বিপিনবাবু। মানুষ তার মাথায় চোট খেলে বা অন্য কোনরকম অ্যাকসিডেন্টের ফলে মাঝে মাঝে পূর্বস্মৃতি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু তাঁর সব মনে আছে, শুধু একটা বিশেষ ঘটনা মনে নেই—এর কোন উদাহরণ তিনি আর কখনও পান নি। রাঁচি যাবার ইচ্ছে তাঁর অনেক দিন থেকেই ছিল। সেই রাঁচিই গেছেন, অথচ গিয়ে ভুলে গেলেন, এ একেবারে অসম্ভব।

বাইরে কোথাও গেলে বিপিনবাবু তাঁর বেয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু এখন যে বেয়ারাটা আছে সে নতুন লোক। সাত বছর আগে তাঁর বেয়ারা ছিল

রামস্বরূপ। তিনি রাঁচি গিয়ে থাকলে সেও নিশ্চয় যেত, কিন্তু এখন সে আর নেই, তিন বছর হল নেই।

সন্ধ্যা পর্যন্ত বিপিনবাবু একাই কাটালেন তাঁর ঘরে। মনে মনে স্থির করলেন আজ কেউ এলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন না।

সাতটা নাগাদ চাকর এসে খবর দিল তাঁর সঙ্গে ব্যবসায়ী শেঠ গিরিধারিপ্রসাদ দেখা করতে এসেছেন। জাঁদরেল লোক গিরিধারিপ্রসাদ। কিন্তু বিপিনবাবুর মানসিক অবস্থা তখন এমনই যে তিনি বাধ্য হয়ে চাকরকে বলে দিলেন যে, তাঁর পক্ষে নীচে নামা সম্ভব নয়। চুলোয় যাক গিরিধারিপ্রসাদ।

সাড়ে সাতটায় আবার চাকরের আগমন। বিপিনবাবুর তখন সবে একটু তন্দ্রার ভাব এসেছে, একটা দুঃস্বপ্নের গোড়াটা শুরু হয়েছে, এমন সময় চাকরের ডাকে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। আবার কে এল ? চাকর বলল, চুনিবাবু! বলেছে ভীষণ জরুরী দরকার।

দরকার যে কী তা বিপিনবাবু জানেন। চুনি তাঁর ইস্কুলের সহপাঠী। সম্প্রতি দূরবস্থায় পড়েছে, ক'দিন থেকেই তাঁর কাছে আসছে একটা কোন চাকরির আশায়। বিপিনবাবুর পক্ষে তার জন্য কিছু করা সম্ভব নয়, তায় প্রতিবারই তিনি তাকে না বলে দিয়েছেন, আচ্ছা নাছোড়বান্দা লোক তো চুনি!

বিপিনবাবু অত্যন্ত বিরক্তভাবে চাকরটাকে দিয়ে বলে পাঠালেন যে, শুধু আজ নয়—বেশ কিছুদিন তাঁর পক্ষে চুনির সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না।

চাকর ঘর থেকে যেতেই বিপিনবাবুর খেয়াল হল যে চুনির হয়তো আটান্নর ঘটনা কিছুটা মনে থাকতে পারে। তাকে একবার জিগ্যেস করাতে দোষ কী ?

বিপিনবাবু তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বৈঠকখানায় হাজির হলেন। চুনি যাবার জন্যে উঠে পড়েছিল, বিপিনবাবুকে নেমে আসতে দেখে সে যেন একটু আশান্বিত হয়েই ঘুরে দাঁড়াল।

বিপিনবাবু ভণিতা না করে বললেন, 'শোনো চুনি, তোমার কাছে একটা—মানে, একটু বেখাপ্পা প্রশ্ন আছে। তোমার তো স্মরণশক্তি বেশ ভাল ছিল বলে জানি—আর আমার বাড়িতে তো তুমি অনেক বছর ধরেই মাঝে মাঝে যাতায়াত করছ। ভেবে দেখো তোমার মনে পড়ে কিনা—আমি কি আটান্ন সালে রাঁচি গিয়েছিলাম ?'

চুনি বলল, 'আটান্ন ? আটান্নই তো হবে। নাকি উনষাট ?'

'রাঁচি যাওয়াটা নিয়ে তোমার কোন সন্দেহ নেই ?'

চুনি এবার রীতিমত অবাক হয়ে গেল।

'তোমার কি যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়েই সন্দেহ হচ্ছে ?'

'আমি গিয়েছিলাম ? তোমার ঠিক মনে আছে ?'

চুনি সোফা থেকে উঠেছিল, সেটাতেই আবার বসে পড়ল। তারপর সে বিপিন চৌধুরীর দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, 'বিপিন তুমি কি নেশাটেশা ধরেছ নাকি আজকাল ? এদিকে তো তোমার কোন বদনাম ছিল না! তুমি কড়া মেজাজের লোক, পুরোনো বন্ধুদের প্রতি তোমার সহানুভূতি নেই—এসবই তো জানতুম! কিন্তু তোমার তো মাথাটা পরিষ্কার ছিল; অন্তত কিছুদিন আগে অবধি ছিল!'

বিপিনবাবু কম্পিত স্বরে বললেন, 'তোমার মনে আছে আমার যাবার কথা ?'

চুনি এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটা পালটা প্রশ্ন করে বসল। সে বলল,—

'আমার শেষ চাকরী কি ছিল মনে আছে তোমার ?'

'বিলক্ষণ। তুমি হাওড়া স্টেশনে বুকিং ক্লার্ক ছিলে।'

'তোমার সেটা মনে আছে, আর আমিই যে তোমার রাঁচির বুকিং করে দিলাম সেটা মনে নেই ? তোমার যাবার দিন তোমার কামরায় গিয়ে দেখা করলাম, ডাইনিং কারে বলে তোমার খাবারের ব্যবস্থা করে দিলাম, তোমার কামরায় পাখা চলছিল না—সেটা লোক ডেকে চালু করে দিলাম—এসব তুমি ভুলে গেছ ? তোমার হয়েছে কী ?'

বিপিনবাবু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধপ্ করে সোফায় বসে পড়লেন।

চুনি বলল, 'তোমার কি অসুখ করেছে ? তোমার চেহারা তো ভালো দেখছি না।'

বিপিনবাবু বললেন, 'তাই মনে হচ্ছে। ক'দিন কাজের চাপটা একটু বেশি পড়েছিল। দেখি একটা স্পেশালিস্ট-টেশালিস্ট...'

বিপিনবাবুর অবস্থা দেখেই বোধহয় চুনি আর চাকরির উল্লেখ না করে আস্তে আস্তে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে গেল।

পরেশ চন্দ্রকে ইয়াং ডাক্তার বলা চলে, চল্লিশের নীচে বয়স, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বিপিনবাবুর ব্যাপার শুনে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিপিনবাবু তাঁকে মরিয়া হয়ে বললেন, 'দেখুন ডক্টর চন্দ্র, আমার এ ব্যারাম আপনাকে সারিয়ে দিতেই হবে। আপিস কামাই করার ফলে যে কী ক্ষীতি হচ্ছে আমার ব্যবসার তা আমি বোঝাতে পারব না। আজকাল তো অনেক ওষুধ বেরিয়েছে। আমার এ ব্যারামের জন্য কি কিছুই নেই ? আমি যত টাকা লাগে দেব। যদি বিদেশ থেকে আনাবার দরকার হয় তাও ব্যবস্থা করব। কিন্তু এ রোগ আপনাকে সারাতেই হবে।

ডাক্তার একটু ভেবেচিন্তে মাথা নেড়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন মিস্টার

চৌধুরী ? আমার কাছে এ রোগ একেবারে নতুন জিনিস; আমার অভিজ্ঞতার একেবারে বাইরে। তবে একটা মাত্র উপায় আমি বলতে পারি। ফল হবে কিনা জানি না, কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই।'

বিপিনবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসলেন।

ডাক্তার বললেন, 'আমার যতদূর মনে হচ্ছে—এবং আমার বিশ্বাস আপনারও এখন তাই ধারণা—যে আপনি সত্যিই রাঁচি গিয়েছিলেন, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, এই যাওয়ার ব্যাপারটা আপনি বেমালুম ভুলে গেছেন। আমি সাজেস্ট করছি যে আপনি আরেকবার রাঁচি যান। তাহলে হয়তো জায়গাটা দেখে আপনার আগের ট্রিপ-এর কথাটা মনে পড়ে যাবে। এটা অসুখ নয়। আজ এই মুহূর্তে তো বেশি কিছু করা সম্ভব নয়! আমি আপনাকে একটি বড়ি লিখে দিচ্ছি—সেটা খেলে হয়তো ঘুমটা হবে। ঘুমটা দরকার, তা নাহলে আপনার অশান্তি এবং তার সঙ্গে আপনার অসুখটাও বেড়ে যাবে। আপনি একটা কাগজ দিন, আমি ওষুধটা লিখে দিচ্ছি।'

বড়ির জন্যেই হোক, বা ডাক্তারের পরামর্শের জন্যেই হোক, বিপিনবাবু পরদিন সকালে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করলেন।

প্রাতঃকালীন জলযোগ সেরে আপিসে টেলিফোন করে কিছু ইনস্ট্রাকশন দিয়ে সেই দিনই রাত্রের জন্যে রাঁচির টিকিট কিনলেন।

পরদিন রাঁচি স্টেশনে নেমেই তিনি বুঝলেন এ জায়গায় তিনি কস্মিনকালেও আসেননি।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা গাড়ি করে এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরে বুঝলেন যে এখানের রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, প্রাকৃতিক দৃশ্য, মোরাবাদি পাহাড়, হোটেল, বাংলো, কোনটার সঙ্গেই তাঁর বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই। 'হুড্রু ফল্‌স' কি তিনি চিনতে পারবেন ? জলপ্রপাতের দৃশ্য দেখলেই কি তাঁর পুরোনো কথা সব মনে পড়ে যাবে ?

নিজে সে কথা বিশ্বাস না করলেও, পাছে কলকাতায় ফিরে অনুতাপ হয় তাই একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে দুপুরের দিকে হুড্রু ফল্‌সে'-র দিকে রওনা দিলেন।

সেই দিনই বিকেল পাঁচটার সময় হুড্রুতে একটি পিকনিকের দলের দুটি গুজরাটি ভদ্রলোক বিপিনবাবুকে অজ্ঞান অবস্থায় একটি পাথরের টিবির পাশে আবিষ্কার করল। এই দুই ভদ্রলোকের শুশ্রূষার ফলে জ্ঞান ফিরে পেতেই বিপিনবাবু প্রথম কথা বললেন,—'আমি রাঁচি আসিনি। আমার সব গেল! আর কোন আশা নেই....'

পরদিন সকালে বিপিন চৌধুরী কলকাতায় ফিরে এলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে যদি না তিনি এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে পারেন, তবে তাঁর আর সত্যিই

কোন আশা নেই। তাঁর কর্মক্ষমতা, তাঁর আত্মবিশ্বাস, তাঁর উৎসাহ, বুদ্ধি বিবেচনা সবই তিনি ক্রমে ক্রমে হারাবেন। শেষে কি তাহলে তাঁকে সেই রাঁচির... ?

এর পরে আর বিপিনবাবু ভাবতে পারেন না, ভাবতে চান না।...

বাড়ি ফিরে কোনরকমে স্নান করে মাথায় বরফের থলি চাপা দিয়ে বিপিন চৌধুরী শয্যা নিলেন। চাকরকে বললেন ডাক্তার চন্দ্রকে ডেকে নিয়ে আসতে। চাকর যাবার আগে তার হাতে একটা চিঠি দিয়ে বললেন, কে জানি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে গেছে। সবুজ খাম, তার উপর লাল কালিতে লেখা,—

'শ্রী বিপিনবিহারী চৌধুরী। জরুরী, একান্ত ব্যক্তিগত।'

অসুস্থতা সত্ত্বেও বিপিনবাবুর কেন জানি মনে হল যে চিঠিটা তাঁর পড়া দরকার। খাম খুলে দেখেন এই চিঠি—

প্রিয় বিপিন,—

হঠাৎ বড়লোক হওয়ার কুফল যে তোমার মধ্যে এভাবে দেখতে পাব তা আশা করিনি। একজন দুঃস্থ বাল্যবন্ধুর জন্য একটা উপায় করে দেওয়া কি সত্যিই তোমার পক্ষে এত অসম্ভব ছিল ? আমার টাকা নেই, তাই ক্ষমতা সামান্যই। যে জিনিসটা আছে আমার সেটা হল কল্পনাশক্তি। তারই সামান্য কিছুটা খরচ করে তোমার উপর সামান্য প্রতিশোধ নিলাম।

নিউমার্কেটের সেই ভদ্রলোক আমার প্রতিবেশী; বেশ ভালো অভিনেতা। দীনেশ মুখুজ্যে তোমার প্রতি সদয় নন, তাই তাকে হাত করতে কোন অসুবিধা হয়নি। হাঁটুর দাগটার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে—সেই চাঁদপাল ঘাটে আছাড় খাওয়া—উনিশ শ ছত্রিশ সনে ?...

আর কী ? এবার সেরে উঠবে। আমার একটি উপন্যাস এক প্রকাশকের পছন্দ হয়েছে। কয়েকটা মাস তাতেই কোনরকমে চালিয়ে দেব। ইতি।

'তোমার বন্ধু চুনিলাল।'

ডাক্তার চন্দ্র আসতেই বিপিনবাবু বললেন, 'ভালো আছি। রাঁচি স্টেশনে নেমেই সব মনে পড়ে গেল।'

ডাক্তার বললেন, 'ভেরি স্ট্রেঞ্জ! আপনার কেসটা একটা ডাক্তারি জার্নালে ছাপিয়ে দেব ভাবছি।'

বিপিনবাবু বললেন, 'আপনাকে যেই জন্য ডাকা—দেখুন তো, আমার কোমরের হাড়টাড় ভাঙল কিনা। রাঁচিতে হোঁচট খেয়েছিলাম। টনটন করছে।'

ব্রা উ ন সা হে বে র বা ড়ি

ব্রাউন সাহেবের ডায়রিটি হাতে আসার পর থেকে ব্যাঙ্গালোর যাবার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম। সেটা এলো বেশ অপ্রত্যাশিতভাবে। আমাদের বালিগঞ্জ ইস্কুলের বাৎসরিক রি-ইউনিয়নে দেখা হয়ে গেল আমার পুরোন সহপাঠী অনীকেন্দ্র ভৌমিকের সঙ্গে। অনীক বলল সে ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে চাকরি করছে। 'একবার ঘুরে যা না এসে আমার বাড়িতে। দ্য বেস্ট প্লেস ইন ইন্ডিয়া! একটা বাড়তি ঘরও আছে আমার বাড়িতে। আসবি ?'

অনীক ইস্কুলে থাকতে আমার খুবই বন্ধু ছিল। তারপর যা হয় আর কি। কলেজ হয়ে গেল দুজনের আলাদা। তাছাড়া ও বিজ্ঞান আর আমি আর্টস। দুজনে প্রায় উল্টোমুখো রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করলাম। মাঝে ও আবার চলে গেল বিলেতে। ফলে ক্রমে দুজনের বন্ধুত্বের মধ্যেও অনেকটা ব্যবধান এসে পড়ল। আর আজ প্রায় বারো বছর পর তার সঙ্গে দেখা। বললাম, 'গিয়ে পড়তে পারি। কোন্ সময়টা ভালো ?'

'এনি টাইম। ব্যাঙ্গালোরে গরম নেই। সাধে কি জায়গাটা সাহেবদের এত প্রিয় ? তুই যখনই আসতে চাস আসিস। তবে সাতদিনের নোটিশ পেলে ভালো হয়।'

যাক্, তাহলে ব্রাউন সাহেবের বাড়িটা দেখার সৌভাগ্য হলেও হতে পারে। কিন্তু তার আগে সাহেবের ডায়রিটার কথা বলা দরকার।

আমি হলাম যাকে বলে পুরোন বইয়ের পোকা। ব্যাঙ্কে কাজ করে প্রতি মাসে যা রোজগার হয় তার অন্তত অর্ধেক টাকা পুরোন বই কেনার পেছনে খরচ হয়। ভ্রমণকাহিনী, শিকারের গল্প, ইতিহাস, আত্মজীবনী, ডায়রি—কত রকম বই না গত পাঁচ বছরে জমে উঠেছে আমার। পোকায় কাটা পাতা, বার্ধক্যে ঝুরঝুরে হয়ে যাওয়া পাতা, ড্যাম্পে বিবর্ণ হওয়া পাতা—এইসব আমার কাছে অতি পরিচিত এবং অতি প্রিয় জিনিস। আর পুরোন বই-এর গন্ধ! প্রথম বৃষ্টির পরে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ আর পুরোন বইয়ের পাতার গন্ধ—এর জুড়ি নেই।

অগুরু কস্তুরী গোলাপ হাসনাহানা—মায় ফরাসী সেরা পারাফিউমের সুবাস এই দুটো গন্ধর কাছে হার মেনে যায়।

এই পুরোন বই কেনাই আমার একমাত্র নেশা, আর পুরোন বই কিনতে গিয়েই পাওয়া ব্রাউন সাহেবের ডায়রিটা। বলে রাখি এ ডায়রি কিন্তু ছাপা ডায়রি নয়—যদিও সেরকম ডায়রিও আমার আছে। এ ডায়রি একেবারে খাগের কলমে লেখা আসল ডায়রি। লাল চামড়ায় বাঁধানো সাড়ে তিনশো পাতার রুলটানা খাতা। ছ' ইঞ্চি বাই সাড়ে চার ইঞ্চি। মলাটের চারপাশে সোনার জলের নকশা করা বর্ডার, তার মাঝখানে সোনার ছাপার অক্ষরে লেখা সাহেবের নাম—*'জন মিডল্‌টন ব্রাউন'*। মলাট খুললে প্রথম পাতায় সাহেবের নিজের হাতে নাম সই, তার নিচে সাহেবের ঠিকানা—*'এভারগ্রীন লজ'* ফ্রেজার টাউন, ব্যাঙ্গালোর—আর তার নিচে লেখা—জানুয়ারী ১৮৫৮। অর্থাৎ এ ডায়রির বয়স হল একশো তেরো। এই ব্রাউন সাহেবের নাম লেখা অন্য আরো খানকতক বইয়ের সঙ্গে ছিল এই লাল চামড়ায় বাঁধানো খাতাটা। নাম করা বইয়ের তুলনায় দাম খুবই কম। মকবুল চাইল কুড়ি, আমি বললাম দশ, শেষটায় বারো টাকার বিনিময়ে বইটা আমার সম্পত্তি হয়ে গেল। ব্রাউন যদি নামকরা কেউ হতেন তাহলে এই বইয়ের দাম হাজার টাকা হতে পারত।

ডায়রিটাতে তখনকার দিনের ভারতবর্ষে সাহেবদের দৈনন্দিন জীবনের বাইরে আর কিছু জানতে পাবো এমন আশা করিনি। সত্যি বলতে কি, প্রথম শ' খানেক পাতা পড়ে তার বেশি পাইও নি। ব্রাউন সাহেবের পেশা ছিল ইস্কুল মাস্টারি। ব্যাঙ্গালোরের কোনো একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সাহেব নিজের কথাই বেশি বলেছেন, মাঝে মাঝে ব্যাঙ্গালোর শহরের বর্ণনা করেছেন। এক জায়গায় তখনকার বড়লাটের গিন্নী লেডি ক্যানিং-এর ব্যাঙ্গালোর আসার ঘটনা বলেছেন, ব্যাঙ্গালোরের ফুল-ফল গাছপালা ও তাঁর নিজের বাগানের কথা বলেছেন। এক এক জায়গায় আবার ইংল্যান্ডের সাসেক্স অঞ্চলে তাঁর পৈতৃক বাড়ি, আর তাঁর পিছনে ফেলে-আসা আত্মীয়স্বজনদের কথা বলেছেন। তার স্ত্রী এলিজাবেথের কথা উল্লেখও আছে, তবে স্ত্রীটি কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন।

সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে সাইমন নামে কোনো এক ব্যক্তির বারম্বার উল্লেখ। এই সাইমন যে কে ছিলেন—তাঁর ছেলে না ভাই না ভাগ্নে না বন্ধু না কী—সেটা বোঝার কোনো উপায় ডায়রিতে নেই। তবে সাইমনের প্রতি ব্রাউন সাহেবের যে একটা গভীর টান ছিল সেটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। সাইমনের বুদ্ধি, সাইমনের সাহস, সাইমনের রাগ অভিমান দুষ্টুমি খাম-খেয়ালিপনা ইত্যাদির কথা বার বার আছে ডায়রিতে। সাইমন অমুক চেয়ারটায়

বসতে ভালোবাসে, আজ সাইমনের শরীরটা ভালো নেই, সাইমনকে আজ সারাদিন দেখতে পাইনি বলে মন খারাপ—এই ধরনের সব খুঁটিনাটি খবরও আছে। আর আছে সাইমনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর। ২২শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাৎ বজ্রাঘাতে সাইমনের মৃত্যু হয়। পরের দিন ভোর বেলা ব্রাউন সাহেবের বাগানে একটা বাজে ঝলসে যাওয়া ইউক্যালিপটাস গাছের পাশে সাইমনের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

এরপর থেকে একটা মাস ডায়রিতে প্রায় আর কিছুই লেখা হয়নি। যেটুকু হয়েছে তার মধ্যে শোক আর হতাশার কথা ছাড়া আর কিছু নেই। ব্রাউন সাহেব দেশে ফিরে যাবার কথা ভেবেছেন—কিন্তু সাইমনের আত্মা থেকে দূরে সরে যেতে তাঁর মন চায়নি। সাহেবের স্বাস্থ্যও যেন অল্প অল্প ভেঙে পড়েছে। 'আজও, স্কুলে গেলাম না' কথাটা পাঁচ জায়গায় বলা হয়েছে। লুকাস বলে একজন ডাক্তারের উল্লেখও আছে। তিনি ব্রাউন সাহেবকে পরীক্ষা করে ওষুধ বাৎলে গেছেন।

তারপর হঠাৎ—২রা নভেম্বর—ডায়রিতে এক আশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ; এবং এই ঘটনাই আমার কাছে ডায়রির মূল্য হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্রাউন সাহেব এ ঘটনাটা লিখেছেন রোজকার নীলের বদলে লাল কালিতে। তাতে বলেছেন (আমি বাঙলায় অনুবাদ করছি)— *'আজি এক অভাবনীয় আশ্চর্য ঘটনা! আমি বিকালে লালবাগে গিয়েছিলাম গাছপালার সান্নিধ্যে আমার মনটাকে একটু শান্ত করার জন্য। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাৎ বাড়ি ফিরে বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখি—সাইমন ফায়ারপ্লেসের পাশে তার প্রিয় হাই-ব্যাক্‌ড চেয়ারটিতে বসে আছে। সাইমন! সত্যিই সাইমন! আমি ত দেখে আনন্দে আত্মহারা। আর শুধু বসে আছে তা নয়—সে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে তার স্নেহমাখানো চোখ দুটি দিয়ে। এদিকে ঘরে বাতি নেই। আমার ফাঁকিবাজ খানসামা টমাস এখনো ল্যাম্প জ্বালেনি। তাই সাইমনকে আরেকটু ভালো করে দেখব বলে আমি পকেট থেকে দেয়াশলাই বার করলাম। কাঠি বার করে বাক্সের গায়ে ঘষতেই আলো জ্বলে উঠল—কিন্তু কী আফসোস! এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সাইমন উধাও! অবিশ্যি সাইমনকে যে কোনোদিন আবার দেখতে পাবো সেটাই ত আশা করিনি! এভাবে ভূত অবস্থাতেও যদি মাঝে মাঝে সে দেখা দিয়ে যায়, তাহলে আমার মন থেকে সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। সত্যি আজ এক অপূর্ব আনন্দের দিন। সাইমন মরে গিয়েও আমাকে ভোলেনি; এমনকি তার প্রিয় চেয়ারটিকেও সে ভোলেনি। দোহাই সাইমন—মাঝে মাঝে দেখা দিও—আর কিছু চাই না আমি তোমার কাছে। এইটুকু পেলেই আমি বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে পারব।'*

এর পরে ডায়রি আর বেশিদিন চলেনি। যেটুকু আছে তার মধ্যে কোন দুঃখের ছাপ নেই, কারণ সাইমনের সঙ্গে ব্রাউন সাহেবের প্রতিদিনই একবার করে দেখা হয়েছে। সাইমনের ভূত সাহেবকে হতাশ করেনি।

ডায়রির শেষ পাতায় লেখা আছে—'যে আমাকে ভালোবাসে, আর মৃত্যুর পরেও যে তার সে-ভালোবাসা অটুট থাকে, এই জ্ঞান লাভ করে আমিও পরম শান্তি পেয়েছি।'

ব্যাস্ এই শেষ। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে—ব্রাউন সাহেবের এই বাড়ি-ব্যাঙ্গালোরের ফ্রেজার টাউনের এভারগ্রীন লজ—এখনো আছে কি ? আর সেখানে এখনো সন্ধ্যাকালে সাইমন সাহেবের ভূতের আগমন হয় কি ? আর সে ভূত কি অচেনা লোককে দেখা দেয় ? আমি যদি সে-বাড়িতে গিয়ে একটা সন্ধ্যা কাটাই—তাহলে সাইমনের ভূতকে দেখতে পাব কি ?

ব্যাঙ্গালোরে এসে প্রথম দিন অনীককে এসব কিছুই বলিনি। সে আমাকে তার অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে করে সমস্ত ব্যাঙ্গালোর শহর ঘুরিয়ে দেখিয়েছে—এমন কি ফ্রেজার টাউনও। ব্যাঙ্গালোর সত্যিই সুন্দর জায়গা, তাই শহরটা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে আমার কোনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়নি। শুধু সুন্দর নয়—কলকাতার পর এমন একটা শান্ত কোলাহলশূন্য শহরকে প্রায় একটা অবাস্তব স্বপ্নরাজ্যের মতো মনে হয়।

দ্বিতীয় দিন ছিল রবিবার। সকালে অনীকের বাগানে রঙীন ছাতার তলায় বসে চা খেতে খেতে প্রথম ব্রাউন সাহেবের প্রসঙ্গটা তুললাম। ও শুনেটুনে হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে বেতের টেবিলের উপর রেখে বলল, 'দ্যাখ রঞ্জন—যে বাড়ির কথা বলছিস সে বাড়ি হয়ত থাকলেও থাকতে পারে, একশ বছর আর এমন কী বেশি। তবে সেখানে গিয়ে যদি ভূতটূত দেখার লোভ থেকে থাকে তোর, তাহলে আমি ওর মধ্যে নেই। কিছু মনে করিসনি ভাই—আমি চিরকালই একটু অতিরিক্ত সেন্‌সিটিভ। এমনি দিব্যি আছি—আজকের দিনের শহরের কোনো উপদ্রব নেই এখানে—ভূতের পেছনে ছোটা মানে সাধ করে উপদ্রব ডেকে আনা। ওর মধ্যে আমি নেই!'

অনীকের কথা শুনে বুঝলাম এই বারো বছরে ও বিশেষ বদলায়নি। ইস্কুলে ভীতু বলে ওর বদনাম ছিল বটে। মনে পড়ল একবার আমাদের ক্লাসেরই জয়ন্ত আর আরো কয়েকটি ডানপিটে ছেলে ওকে এক সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের রাইডিং ইস্কুলের কাছটাতে আপাদমস্তক সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে ভয় দেখিয়েছিল। অনীক এই ঘটনার পর দুদিন ইস্কুলে আসেনি, এবং অনীকের বাবা নিজে হেড মাস্টার বীরেশ্বর বাবুর কাছে এসে ব্যাপারটা নিয়ে কমপ্লেন করেছিলেন।

আমি এ বিষয়ে কিছু বলার আগেই অনীক হঠাৎ বলে উঠল, 'তবে নেহাৎই যদি তোর যেতে হয়, তাহলে সঙ্গীর অভাব হবে না। আসুন মিস্টার ব্যানার্জি।'

পিছন ফিরে দেখি একটি বছর পঁয়তাল্লিশের ভদ্রলোক অনীকের বাগানের গেট দিয়ে ঢুকে হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, প্রায় ছ'ফুট হাইট, পরনে ছাই রঙের হ্যান্ডলুমের প্যান্টের উপর গাঢ় নীল টেরিলিনের বুশ সার্টের গলায় সাদা-কালো বাটিকে ছোপ মারা সিল্কের মাফলার।

অনীক পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার বন্ধু রঞ্জন সেনগুপ্ত—মিস্টার হৃষিকেশ ব্যানার্জি।'

ভদ্রলোক শুনলাম ব্যাঙ্গালোরে এয়ারক্রাফ্‌ট ফ্যাক্টরীতে কাজ করেন, বহুদিন বাংলাদেশ ছাড়া, তাই কথার মধ্যে একটা অবাঙালি টান এসে পড়েছে, আর অজস্র ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করেন।

অনীক বেয়ারাকে ডেকে আর এক পেয়ালা চায়ের কথা বলে দিয়ে একেবারে সোজাসুজি ব্রাউন সাহেবের বাড়ির কথাটা পেড়ে বসল। কথাটা শুনে ভদ্রলোক এমন অট্টহাস্য করে উঠলেন যে কিছুক্ষণ থেকে যে কাঠবিড়ালিটাকে দেখছিলাম আমাদের টেবিলের আশেপাশে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করছে, সেটা ল্যাজ উঁচিয়ে একটা দেবদারু গাছের গুঁড়ি বেয়ে সটান একেবারে মগডালে পৌঁছে গেল।

'গোস্ট্‌স ? গোস্ট্‌স ? ইউ সিরিয়াসলি বিলীভ ইন গোস্ট্‌স ? আজকের দিনে ? আজকের যুগে ?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'একটা কৌতূহল থাকতে ক্ষতি কি ? এমনও ত হতে পারে যে ভূতেরও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, যেটা দশ বছরের মধ্যে জানা যাবে।'

ব্যানার্জির হাসি তবুও থামে না। লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোকের দাঁতগুলো ভারি ঝকঝকে ও মজবুত।

অনীক বলল, 'যাই হোক মিস্টার ব্যানার্জি—গোস্ট অর নো গোস্ট—এমন বাড়ি যদি একটা থেকেই থাকে, আর রঞ্জনের যদি একটা উদ্ভট খেয়াল হয়েই থাকে—একটা সন্ধ্যাবেলা ওকে নিয়ে খানিকটা সময়ের জন্য ওবাড়িতে কাটিয়ে আসতে পারেন কিনা সেইটে বলুন। ও কলকাতা থেকে এসেছে, আমার গেস্ট—ওকে ত আর আমি একা যেতে দিতে পারি না সেখানে। আর সত্যি বলতে কি—আমি নিজে মানুষটা একটু অতিরিক্ত, যাকে বলে, সাবধানী। আমি যদি নিয়ে যাই তাহলে বোধহয় ওর সুবিধের চেয়ে অসুবিধাই হবে বেশি।'

মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর সার্টের পকেট থেকে একটা ব্যাঁকা পাইপ বার করে তার মধ্যে তামাক গুঁজতে গুঁজতে বললেন, 'আমার আপত্তি নেই—তবে আমি

যেতে পারি কেবল একটা কন্ডিশনে—আমি সঙ্গে শুধু একজনকে নেব না, দুজনকেই নেব।'

কথাটা শেষ করে ব্যানার্জি আবার হাসলেন, আর তার ফলে এবার আশেপাশের গাছ থেকে চার-পাঁচ রকম পাখির চিৎকার ও ডানা-ঝাপটানির আওয়াজ শোনা গেল। অনীকের মুখ কিঞ্চিৎ ফ্যাকাসে দেখালেও, সে আপত্তি করতে পারল না।

'কী নাম বললেন বাড়িটার ?' ব্যানার্জি জিগ্যেস করলেন।

'এভারগ্রীন লজ।'

'ফ্রেজার টাউনে ?'

'তাই ত বলছে ডায়রিতে।'

'হুঁ...' ভদ্রলোক পাইপে টান দিলেন। 'ফ্রেজার টাউনে সাহেবদের কিছু পুরোন বাড়ি আছে বটে, কটেজ টাইপের। এনিওয়ে—যেতেই যদি হয় ত দেরি করে লাভ কী ? হোয়াট অ্যাবাউট আজ বিকেল ? এই ধরুন চারটে নাগাৎ ?'

ইঞ্জিনিয়ার হলে কী হবে—মেজাজটা একেবারে পুরোদস্তুর মিলিটারি এবং সাহেবী। ঘড়ি ধরে চারটের সময় হৃষিকেশ ব্যানার্জি তাঁর মরিস মাইনর গাড়িটি নিয়ে হাজির। গাড়িতে যখন উঠছি তখন ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন, 'সঙ্গে কী কী নিলেন ?'

অনীক ফিরিস্তি দিল—'একটা পাঁচসেলের টর্চ, ছ'টা মোমবাতি, ফাস্টএড বক্স, একটা বড় ফ্লাস্‌ক ভর্তি গরম কফি, এক বাক্স হ্যাম স্যান্ডউইচ, এক প্যাকেট তাস, মাটিতে পাতবার চাদর, মশা তাড়ানোর জন্য এক টিউব ওডোমস।'

'আর অস্ত্রশস্ত্র ?' ব্যানার্জি জিগ্যেস করলেন।

'ভূতকে কি অস্ত্র দিয়ে কিছু করা যায় ? কি রে রঞ্জন—তোর সাইমনের ভূত কি সলিড নাকি ?'

'যাই হোক্', মিস্টার ব্যানার্জি গাড়ির দরজা বন্ধ করে বললেন, 'আমার কাছে একটি ছোটখাট আগ্নেয়াস্ত্র আছে, সুতরাং সলিড-লিকুইড নিয়ে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই।'

গাড়ি ছাড়ার পর ব্যানার্জি বললেন, 'এভারগ্রীন লজে'-র ব্যাপারটা একেবারে কাল্পনিক নয়।'

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, 'আপনি কি এর মধ্যেই খোঁজ নিয়েছেন নাকি ?'

ব্যানার্জি রীতিমত কসরতের সঙ্গে দুটো সাইকেল চালককে পর পর পাশ কাটিয়ে বললেন, 'আই অ্যাম এ ভেরি মেথডিক্যাল ম্যান, মিস্টার সেনগুপ্ত। যেখানে যাচ্ছি, সে জায়গাটা অ্যাট অল আছে কিনা সেটার সম্বন্ধে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রাখা উচিত নয় কি ? ও দিকটায় শ্রীনিবাস দেশমুখ থাকে—আমরা একসঙ্গে গল্‌ফ খেলি—অনেকদিনের আলাপ। সকালে এখান থেকে ওর বাড়িতেই গেস্‌লাম। বলল এভারগ্রীন লজ বলে একটা একতলা কটেজ নাকি প্রায় পঞ্চাশ বছর থেকে খালি পড়ে আছে। বাড়ির বাইরের বাগানে বছর দশেক আগে পর্যন্ত লোকে পিকনিক করতে যেতো, এখন আর যায় না। খুব নিরিবিলি জায়গায় বাড়িটা। আগেও নাকি একটানা বেশিদিন কেউ ও বাড়িতে থাকেনি। তবে 'হন্টেড হাউস' বলে কেউ কোনদিন অপবাদ দেয়নি বাড়িটার। বাড়ির ফার্নিচার সব বহুদিন আগেই নিলাম হয়ে গেছে। তার কিছু নাকি কর্ণেল মার্সারের বাড়িতে আছে। রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। তিনিও ফ্রেজার টাউনেই থাকতেন। সব শুনেটুনে বুঝেছেন মিস্টার সেনগুপ্ত, মনে হচ্ছে আমাদেরও এই পিকনিক জাতীয়ই একটা কিছু করে ফেরত আসতে হবে। অনীকেন্দ্র তাসটা এনে ভালোই করেছে।'

ব্যাঙ্গালোরের পরিষ্কার প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে বারবারই মনে হচ্ছিল যে শহরটা এতই অভূতুড়ে যে, এখানে হানাবাড়ির অস্তিত্ব কল্পনা করাই কঠিন।

কিন্তু তার পরেই আবার মনে পড়ে যাচ্ছিল ব্রাউন সাহেবের ডায়রির কথা। লোকে নেহাৎ পাগল না হলে ডায়রিতে আজগুবি কথা বানিয়ে লিখবে কেন ? সাইমনের ভূত ব্রাউন নিজে দেখেছেন। একবার নয়, অনেকবার। সে ভূত কি আমাদের জন্য একবার দেখা দেবে না ?

বিলেতে আমি যাইনি, কিন্তু বিলেতের কটেজের ছবি বইয়ের পাতায় ঢের দেখেছি। এভারগ্রীন লজের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল সত্যিই যেন ইংল্যান্ডের কোন গ্রামাঞ্চলের একটা পুরোন পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে এসে পড়েছি।

কটেজের সামনেই ছিল বাগান। সেখানে ফুলের কেয়ারির বদলে এখন শুধু ঘাস আর আগাছা। একটা ছোট্ট কাঠের গেট (যাকে ইংরেজীতে বলে wicket) দিয়ে বাগানে ঢুকতে হয়। সেই গেটের গায়ে একটা ফলকে খোদাই করে এখনো লেখা রয়েছে বাড়ির নামটা। তবে হয়ত কোনো চড়ুইভাতির দলেরই কেউ রসিকতা করে এভারগ্রীন কথাটার আগে একটা 'N' জুড়ে দিয়ে সেটাকে নেভারগ্রীন করে দিয়েছে।

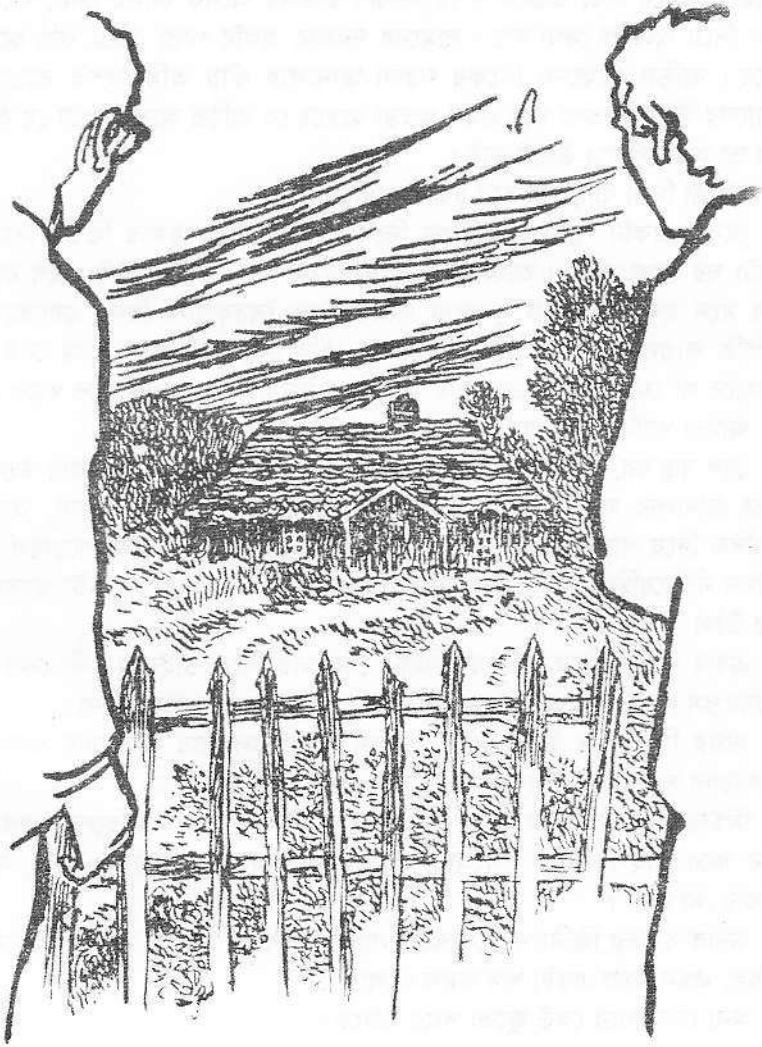

আমরা গেট দিয়ে ঢুকে বাড়ির দিকে এগোলাম। চারিদিকে অজস্র গাছপালা। ইউক্যালিপটাসও গোটা তিনেক রয়েছে দেখলাম। আর যা গাছ আছে তার অনেকগুলোরই নাম আমার জানা নেই, চোখেও দেখিনি এর আগে কোনদিন। ব্যাঙ্গালোরের জলমাটির নাকি এমনই গুণ যে সেখানে যে-কোনো দেশের যে-কোনো গাছই বেঁচে থাকে।

কটেজের সামনে একটা টালির ছাউনি দেওয়া পোর্টিকো, তার ব্যাঁকা থামগুলো বেয়ে লতা উঠেছে ওপর দিকে। ছাউনির অনেক টালিই নেই, ফলে ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায়। সামনের দরজার একটা পাল্লা ভেঙে কাৎ হয়ে আছে। বাড়ির সামনের দিকের দরজা-জানালার কাঁচ অধিকাংশই ভাঙা। দেয়ালের উপর শেওলা ধরে এমন অবস্থা হয়েছে যে বাড়ির আসল রংটা যে কী ছিল তা আর বোঝার উপায় নেই।

দরাজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম আমরা।

ঢুকেই একটা প্যাসেজ। পিছন দিকে একটা ভাঙা দরজার ভিতর দিয়ে একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। আমাদের ডাইনে-বাঁয়েও ঘর। ডাইনেরটাই বেশি বড় বলে মনে হল। আন্দাজে বুঝলাম এটাই হয়ত বৈঠকখানা ছিল। মেঝেতে বিলিতি কায়দায় কাঠের তক্তা বসানো—তার কোনটাই প্রায় আস্ত নেই। সাবধানে পা ফেলতে হয়, এবং প্রতি পদক্ষেপে খুটখাট খচখচ শব্দ হতে থাকে।

আমরা ঘরটাতে ঢুকলাম।

বেশ বড় ঘর, ফার্নিচার না থাকাতে আরো খাঁ খাঁ করছে। পশ্চিম আর উত্তর দিকে জানালার সারি। একদিকের জানালা দিয়ে গেট সমেত বাগান, আর অন্যদিক দিয়ে গাছের সারি দেখা যাচ্ছে। এরই একটাতে কি বাজ পড়েছিল ? সাইমন দাঁড়িয়েছিল সেই গাছের নিচে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। ভাবতে গা-টা ছমছম করে উঠল।

এবার দক্ষিণ দিকের জানালাবিহীন দেয়ালের দিকে চাইলাম। বাঁ কোণে ফায়ারপ্লেস। এই ফায়ারপ্লেসের পাশেই ছিল সাইমনের প্রিয় চেয়ারখানা।

ঘরের সিলিং-এর দিকে চাইতে চোখে পড়ল ঝুল আর মাকড়সার জাল। এককালের সুদৃশ্য এভারগ্রীন লজের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়।

মিস্টার ব্যানার্জি প্রথম দিকে লা লা করে বিলিতি সুর ভাঁজছিলেন, এখন নতুন করে পাইপ ধরিয়ে বললেন, 'কী খেলা আসে আপনাদের ? ব্রিজ, না পোকার, না রামি ?'

অনীক হাতের জিনিসপত্র মেঝেতে সাজিয়ে চাদরটা বিছিয়ে মাটিতে বসতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা শব্দ কানে এলো।

অন্য কোন ঘরে কেউ জুতো পায়ে হাঁটছে।

অনীকের দিকে চেয়ে দেখলাম সে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

পায়ের শব্দটা থামল। মিস্টার ব্যানার্জি হঠাৎ মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে নিয়ে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইজ এনি বডি দেয়ার ?' সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজনে প্যাসেজের দিকে এগোলাম। অনীক আলতো করে আমার কোটের আস্তিনটা ধরে নিয়েছে।

এবার জুতোর শব্দটা আবার শুরু হল। আমরা বাইরে প্যাসেজে গিয়ে পড়তেই ডানদিকের ঘরটা থেকে একটি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে সামনে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। লোকটি ভারতীয়। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ সত্ত্বেও ইনি যে ভদ্র এবং শিক্ষিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যালো।'

আমরা কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না, এমন সময় আগন্তুক নিজেই আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করলেন।

'আমার নাম ভেঙ্কটেশ। আই অ্যাম এ পেন্টার। আপনারা কি এই বাড়ির মালিক না খদ্দের ?'

ব্যানার্জি হেসে বললেন, 'দুটোর একটাও না। আমরা এমনি ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি।'

'আই সী। আমি ভাবছিলাম এই বাড়িটা যদি পাওয়া যেত তাহলে আমার কাজের জন্য একটা স্টুডিও হতে পারত। ভাঙাচোরায় আমার আপত্তি নেই। মালিক কে জানেন না বোধহয় ?'

'আজ্ঞে না। সরি।' ব্যানার্জি বললেন। 'তবে আপনি কর্ণেল মার্সারের ওখানে খোঁজ করে দেখতে পারেন। সামনের রাস্তা ধরে বাঁ দিকে চলে যাবেন মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে মিস্টার ভেঙ্কটেশ বেরিয়ে চলে গেলেন।

গেট খোলার এবং বন্ধ করার শব্দ পাবার পর ব্যানার্জি আবার তাঁর অট্টহাসি হেসে বললেন, 'মিস্টার সেনগুপ্ত, ইনি নিশ্চয়ই আপনার সাইমন বা ঐ জাতীয় কোনো ভূতটুত নন!'

আমি হেসে বললাম, 'সবে মাত্র সোয়া পাঁচটা, এর মধ্যেই আপনি ভূতের আশা করেন কি করে ? আর ইনি ভূত হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর নিশ্চয়ই নন, কারণ তাহলে পোশাকটা অন্যরকম হোত।'

আমরা ইতিমধ্যে বৈঠকখানায় ফিরে এসেছি। অনীক মাটিতে পাতা চাদরের উপর বসে পড়ে বলল, 'মিথ্যে কল্পনার প্রশ্রয় দিয়ে নার্ভাসনেস বাড়ানো! তার চেয়ে তাস হোক।'

'আগে মোমবাতি খানকতক জ্বালাও দেখি', ব্যানার্জি বললেন, 'এখানে বড় ঝপ্ করে সন্ধ্যে নামে।'

দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে কাঠের মেঝেতে দাঁড় করিয়ে ফ্লাস্কের ঢাকনিতে কফি ঢেলে তিনজনে পালা করে খেয়ে নিলাম। একটা কথা আমার কিছুক্ষণ থেকে মনে আসছিল সেটা আর না বলে পারলাম না। ভূতের নেশা যে আমার ঘাড়ে কী ভাবে চেপেছে সেটা আমার এই কথা থেকেই বোঝা যাবে। ব্যানার্জিকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'আপনি বলছিলেন কর্ণেল মার্সার এ বাড়ির ফার্নিচার কিছু কিনেছিলেন। তিনি যদি এতই কাছে থাকেন তাঁর বাড়িতে গিয়ে একটা জিনিসের খোঁজ করে আসা যায় কি ?'

'কী জিনিস ?' ব্যানার্জি প্রশ্ন করলেন।

'একটা বিশেষ ধরনের হাই-ব্যাক্‌ড চেয়ার।'

অনীক যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললো, 'কেন বলত ? হঠাৎ এখন হাই-ব্যাক্‌ড চেয়ারের খোঁজ করে কী হবে ?'

'না, মানে, ব্রাউন সাহেব বলেছেন ওটা নাকি সাইমনের খুব প্রিয় চেয়ার ছিল। সে ভূত হয়েও ওটাতে এসে বসত। ওটা থাকত ওই ফায়ারপ্লেসটার পাশে। হয়ত ওটা ওখানে এনে রাখতে পারলে—'

অনীক বাধা দিয়ে বলল, 'তুই ব্যানার্জি সাহেবের ওই মরিস গাড়িতে করে হাই-ব্যাক্‌ট চেয়ার নিয়ে আসবি ? নাকি আমরা তিনজনে ওটাকে কাঁধে করে আনব ? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে ?'

ব্যানার্জি এবার হাত তুলে আমাদের দু'জনকেই থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কর্ণেল মার্সার যা কিনেছেন তার মধ্যে ওরকম চেয়ার নেই এটা আমি জানি। তাঁর বাড়িতে আমার যথেষ্ট যাতায়াত আছে। ওটা থাকলে আমার চোখে পড়ত। আমি যতদূর জানি উনি কিনেছিলেন দুটো বুক কেস, দুটো অয়েল পেন্টিং, খানকতক ফুলদানি, আর শেল্‌ফে সাজিয়ে রাখার জন্যে গুটিকতক শখের জিনিস, যাকে আর্ট অব্‌জেক্টস বলে।'

আমি দমে গেলাম। অনীক তাস বার করে সাফ্‌ল করতে আরম্ভ করেছে। ব্যানার্জি বললেন, 'রামিই হোক। আর এসব খেলা জমে ভালো যদি পয়সা দিয়ে খেলা যায়। আপনাদের আপত্তি আছে কি ?'

বললাম, 'মোটেই না। তবে আমি ব্যাংকের সামান্য চাকুরে, বেশি হারবার সামর্থ আমার নেই।'

বাইরে দিনের আলো ম্লান হয়ে আসছে। আমরা খেলায় মন দিলাম। আমার তাসের ভাগ্য কোনদিনই ভালো না। আজও তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম না। আমি জানি অনীক মনে মনে নার্ভাস হয়ে আছে, সুতরাং সে জিতলে পরে আমি অন্তত একটু নিশ্চিত হতাম, কিন্তু তারও কোনো লক্ষণ দেখলাম না। কপাল ভালো একমাত্র মিস্টার ব্যানার্জির। গুনগুন করে বিলিতি সুর ভাঁজছেন, আর

দানের পর দান জিতে চলেছেন। খেলতে খেলতে নিস্তব্ধতার মধ্যে একবার একটা বেড়ালের ডাক শুনলাম। তার ফলে আমার মনটা আরো একটু দমে গেল। হানাবাড়িতে বেড়ালেরও থাকা উচিত নয়। কথাটা বলাতে ব্যানার্জি হেসে বললেন, 'বাট ইট ওয়াজ এ ব্ল্যাক ক্যাট—ওই প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে গেল। ব্ল্যাক ক্যাট ত ভূতের সঙ্গে যায় ভালোই—তাই না?'

খেলা চলতে থাকল। বেশ কিছুক্ষণের জন্য একবার মাত্র একটা অজানা পাখির কর্কশ ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ, দৃশ্য বা ঘটনা—আমাদের একাগ্রতায় বাধা পড়তে দেয়নি।

ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা, বাইরের আলো নেই বললেই চলে, আমি একটু ভালো তাস পেয়ে পর পর দুবার জিতেছি, আর এক রাউন্ড রামি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, এমন সময় হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক শব্দ কানে এলো।

কে যেন বাইরের দরজায় টোকা মারছে।

আমাদের তিনজনেরই হাত তাসশুদ্ধ নিচে নেমে এলো।

টক্ টক্ টক্ টক্।

অনীক এবার আরো ফ্যাকাসে। আমার বুকের ভিতরেও মৃদু কম্পন শুরু হয়েছে। কিন্তু ব্যানার্জি দেখলাম সত্যিই ঘাবড়াবার লোক নন। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেদ করে তাঁর বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হু ইজ ইট।'

আবার দরজায় টোকা—টক্ টক্ টক্।

ব্যানার্জি তদন্ত করার জন্য তড়াক্ করে উঠে পড়লেন। আমি খপ্ করে ভদ্রলোকের প্যান্টটা ধরে চাপা গলায় বললাম, 'একা যাবেন না।'

তিনজনে একসঙ্গে ঘর থেকে বেরোলাম। প্যাসেজে এসে বাঁ দিকে চাইতেই দেখলাম দরজার বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে—তার পরনে সুট ও হাতে একটা লাঠি। অন্ধকারে তাকে চেনার কোনো উপায় নেই। অনীক আবার আমার আস্তিন চেপে ধরল। এবার আরো জোরে। ওর অবস্থা দেখেই বোধহয় আমার মনে আপনা থেকেই সাহসের ভাব এল।

ব্যানার্জি ইতিমধ্যে আরো কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও—হ্যালো, ডক্টর লার্কিন! আপনি এখানে?'

এবার আমিও প্রৌঢ় সাহেবটিকে বেশ ভালোভাবেই দেখতে পেলাম। অমায়িক সাহেবটি তাঁর সোনার চশমার পিছনে নীল চোখ দুটোকে কুঁচকে হেসে বললেন, 'তোমার মরিস গাড়িখানা দেখলাম বাইরে। তারপর দেখি বাড়ির জানালা দিয়ে মোমবাতির আলো দেখা যাচ্ছে। তাই ভাবলাম একবার ঢুঁ মেরে দেখে যাই তুমি কী পাগলামি করছ এই পোড়ো বাড়ির ভেতর।'

ব্যানার্জি হেসে বললেন, 'আমার এই যুবক বন্ধু দুটির একটু উদ্ভট ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের শখ। বলল এভারগ্রীন লজে বসে তাস খেলবে, তাই আর কি!'

'ভেরি গুড, ভেরি গুড! যুবা বয়সটাই ত এ ধরনের পাগলামির সময়। আমরা বুড়োরাই কেবল নিজেদের বাড়ির কৌচে বসে রোমন্থন করি। ওয়েল ওয়েল—হ্যাভ এ গুড টাইম!'

লার্কিন সাহেব হাত তুলে গুডবাই করে লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে চলে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার ভূতের আশা পরিত্যাগ করতে হল। কী আর করি, আবার তাসে মনোনিবেশ করলাম। প্রথম দিকে প্রায় সাড়ে চার টাকার মত হারছিলাম, গত আধ ঘন্টায় তার খানিকটা ফিরে পেয়েছি। সাইমনের ভূত না দেখলেও, শেষ পর্যন্ত তাসে কিছু জিতে বাড়ি ফিরতে পারলেও আজকের আউটিংটা কিছুটা সার্থক হয়।

ঘড়ির দিকে মাঝে মাঝেই চোখটা চলে যাচ্ছিল। আসল ঘটনাটা কখন ঘটেছিল তার টাইম আমার জানা আছে। ব্রাউন সাহেবের ডায়রি থেকে জেনেছিলাম যে সন্ধ্যার এই সময়টাতেই বাজ পড়ে সাইমনের মৃত্যু হয়।

আমি তাস বাটছি, মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর পাইপে আগুন ধরাচ্ছেন, অনীক সবেমাত্র স্যান্ডউইচ খাবার মতলবে প্যাকেটটাতে হাত লাগিয়েছেন, এমন সময় তাঁর চোখের চাহনিটা মুহূর্তের মধ্যেই বদলে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গেল।

তাঁর দৃষ্টি দরজার বাইরে প্যাসেজের দিকে। বাকি দুজনের চোখও স্বভাবতই সেদিকে চলে গেল। যা দেখলাম তাতে আমারও কয়েক মুহূর্তের জন্য গলা শুকিয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে প্যাসেজের অন্ধকারের মধ্যে একজোড়া জ্বলন্ত চোখ আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ফসফরাসের মতো ফিকে সবুজ আর হলদে মেশানো একটা আভা এই নিষ্পলক চাহনিতে।

মিস্টার ব্যানার্জির ডান হাতটা ধীরে ধীরে তাঁর কোটের ভেস্ট পকেটের দিকে চলে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন ম্যাজিকের মতো আমার কাছে ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আমার মন থেকে সমস্ত ভয় দূর করে দিল। বললাম, 'আপনার পিস্তলের দরকার নেই মশাই—এটা সেই কালো বেড়ালটা।'

আমার কথায় অনীকও যেন ভরসা পেল। ব্যানার্জি পকেট থেকে তাঁর হাত বার করে এনে চাপা গলায় বললেন, 'হাউ রিডিকুলাস!'

এবারে জ্বলন্ত চোখ দুটো আমাদের ঘরের দিকে এগিয়ে এলো। চৌকাঠ পেরোতেই মোমবাতির আলোতে প্রমাণ হল আমার কথা। এটা সেই কালো বেড়ালটাই বটে।

চৌকাঠ পেরিয়ে বেড়ালটা বাঁ দিকে ঘুরল। আমাদের দৃষ্টি তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, তাকে অনুসরণ করছে।

এবার আমাদের তিনজনের গলা দিয়ে এক সঙ্গে একটা শব্দ বেরিয়ে পড়ল। আচমকা বিস্ময়ের ফলে যে-শব্দ আপনা থেকেই মানুষের মুখ থেকে বেরোয়—এ সেই শব্দ। এই শব্দের কারণ আর কিছুই না—আমরা যতক্ষণ তন্ময় হয়ে তাস খেলেছি তারই ফাঁকে কীভাবে কোত্থেকে জানি একটা গাঢ় লাল মখমলে মোড়া হাই-ব্যাক্‌ড চেয়ার এসে ফায়ারপ্লেসের পাশে তার জায়গা করে নিয়েছে।

অমাবস্যার রাতের অন্ধকারের মতো কালো বেড়ালটা চেয়ারটার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। তারপর এক মুহূর্ত সেটার সামনে দাঁড়িয়ে একটা নিঃশব্দ লাফে সেটার উপর উঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। কোনো এক অশরীরী বৃদ্ধের খিলখিল হাসির ফাঁকে ফাঁকে বার বার উচ্চারিত হচ্ছে,—'সাইমন-সাইমন-সাইমন-সাইমন'—আর তার সঙ্গে ছেলে মানুষী খুশী হওয়া হাততালি।

একটা আর্তনাদ শুনে বুঝলাম অনীক অজ্ঞান হয়ে গেছে। আর মিস্টার ব্যানার্জি ? তিনি অনীককে কোলপাঁজা করে তুলে উর্ধ্বশ্বাসে প্যাসেজ দিয়ে দরজার দিকে ছুটছেন।

আমিও আর থাকতে পারলাম না। তাস মোমবাতি ফ্লাস্ক চাদর স্যান্ডউইচ সব পড়ে রইলো। দরজা পেরিয়ে মাঠ, মাঠ পেরিয়ে গেট, গেট পেরিয়ে ব্যানার্জির মরিস মাইনর।

ভাগ্যে ব্যাঙ্গালোরের রাস্তায় লোক চলাচল কম, নইলে আজ একটি মাত্র পাগলা গাড়ির পাগলা ছুটে ক'টা লোক যে জখম হতে পারত তা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

অনীকের জ্ঞান গাড়িতেই ফিরে এসেছিল, কিন্তু তার মুখে কোনো কথা নেই। প্রথম কথা বললেন মিস্টার ব্যানার্জি। অনীকের বেয়ারার হাত থেকে ব্রান্ডির গেলাসটা ছিনিয়ে এক ঢোকে অর্ধেকটা নামিয়ে দিয়ে ঘড়ঘড়ে চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'সো' সাইমন ওয়াজ এ ক্যাট!'

আমার নিজেরও কিছুই বলার অবস্থা নেই, কিন্তু আমার মন তাঁর কথায় সায় দিল।

সত্যিই, ব্রাউন সাহেবের বুদ্ধিমান, খামখেয়ালি, অভিমানী, অনুগত আদরের সাইমন—যার মৃত্যু হয় বজ্রাঘাতে আজ থেকে একশো তেরো বছর আগে—সেই সাইমন ছিল আমাদের আজকের দেখা একটি পোষা কালো বেড়াল!

www.alorpathsala.org

মিঃ শা স ম লে র শে ষ রা ত্রি

মিঃ শাসমল আরাম কেদারাটায় গা এলিয়ে দিয়ে একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

মোক্ষম জায়গা বেছেছেন তিনি—উত্তর বিহারের এই ফরেস্ট বাংলো। এর চেয়ে নিরিবিলি নিরাপদ নিরুপদ্রব জায়গা আর হয় না। ঘরটিও দিব্যি। সাহেবী আমলের মজবুত, সুদৃশ্য টেবিল চেয়ার সাজানো, প্রসস্ত খাটে বালিশ বিছানা তক্‌তকে পরিষ্কার, ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমটি বেশ বড়। পশ্চিমের জানালাটা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসছে, আর সেই সঙ্গে আসছে ঝিঁঝিঁর একটানা শব্দ। বিজলি না থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই; কলকাতার লোড শেডিং-এ কেরোসিনের আলোয় পড়ার অভ্যাস হয়ে গেছে। বাংলোর আলোতে সাদা কাঁচের শেড থাকার ফলে তাঁর কলকাতার আলোর চেয়ে তেজ বেশি বলেই মনে হচ্ছে। সঙ্গে বই আছে—গোয়েন্দা উপন্যাস; মিঃ শাসমলের প্রিয় পাঠ্য।

এক চৌকিদার ছাড়া বাংলোয় অন্য কোনো বাসিন্দা নেই। অর্থাৎ আর কারুর মুখ দেখতে হবে না, কারুর সঙ্গে কথা বলতে হবে না। চমৎকার। কলকাতার টুরিস্ট অপিসে গিয়ে দশদিন আগে থেকে বলে এসেছিলেন এই বাংলোর কথা; দিন চারেক আগে মিঃ শাসমল তাদের কাছ থেকে চিঠিতে জানেন যে ঘর বুক করা হয়ে গেছে। অন্তত তিনটে দিন এখানে থেকে তারপর অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবা যাবে। সঙ্গে টাকা আছে যথেষ্ট; মাসখানেক চালিয়ে নেওয়া যাবে অক্লেশে। নিজের গাড়ি আছে সঙ্গে; স্বভাবতই তিনি নিজেই চালিয়ে এসেছেন এই সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার পথ।

চৌকিদার তার কথামতো সাড়ে নটায় ডিনার দিয়ে দিল। হাতের রুটি অড়হরের ডাল, একটা তরকারী আর মুরগীর কারি। ডাইনিং রুমেও সাহেবী আমলের চিহ্ন রয়েছে। টেবিল, চেয়ার, চীনমাটির পাত্র, ব্যবহারের সাইনবোর্ড—সবই সেইকালের।

'এখানে মশা আছে কি ?' খেতে খেতে প্রশ্ন করলেন মিঃ শাসমল। কলকাতায় যে অঞ্চলে তাঁর ফ্ল্যাট, সেখানে মশা নেই। আজ বছর দশেক হল মশারির অভ্যেসটা চলে গেছে। ওটা ব্যবহার না করতে পারলে আরো নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

চৌকিদার জানালো যে শীতকালে মশা হয়, তবে এসময়টা অর্থাৎ এপ্রিলে মশারির দরকার না হওয়ারই কথা। অবিশ্যি স্টকে আছে মশারি, সাহেবের দরকার হলে খাটিয়ে দেবে। চৌকিদার আরো বলল যে রাত্রে দরজা বন্ধ করে শোয়াই ভাল। চারিদিকে জঙ্গল; আর কিছু না হোক, শেয়ালটেয়াল ঢুকে পড়তে পারে ঘরে! মিঃ শাসমল অবিশ্যি নিজেই ঠিক করেছিলেন যে দরজা বন্ধ রাখবেন।

খাওয়ার পর ডাইনিং রুম থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে হাতে টর্চটা জ্বালিয়ে জঙ্গলের দিকে ফেললেন মিঃ শাসমল। শাল গাছের গুঁড়ির উপর পড়ল আলো। তারপর আলোটা এদিকে ওদিকে ঘুরিয়ে দেখলেন কোনো জানোয়ার জাতীয় কিছু দেখা যায় কিনা। চোখে পড়লো না কিছুই। নিস্তব্ধ বন, ঝিঁঝি ডেকে চলেছে অবিরাম।

'বাংলোয় ভূতটূত আছে নাকি হে!' হালকা ভাবে প্রশ্ন করলেন মিঃ শাসমল। চৌকিদার খাবার সরঞ্জাম তুলে নিয়ে তার ঘরের দিকে যাচ্ছিল, সে খালি একটু হেসে জানিয়ে দিল যে সে এখানে পঁয়ত্রিশ বছর আছে, বহু লোক এই বাংলোয় থেকে গেছে, কেউ কোনোদিন ভূত দেখে নি। কথাটা শুনে মিঃ শাসমল আরো খানিকটা হালকা বোধ করলেন।

ডাইনিং রুমের পর একটা ঘর ছেড়েই তাঁর নিজের ঘর। তাই আর খেতে যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করেন নি; ঘরে ঢুকে বুঝলেন বন্ধ রাখলেই ভালো ছিল। এই ফাঁকে কখন জানি একটা কুকুর ঢুকে পড়েছে। নেড়ী কুকুর। সাদার উপর বাদামী ছোপ, রুগ্ন, হাড় বার করা চেহারা।

'অ্যাই—ভাগ্, ভাগ্-নিকালো হিঁয়াসে!'

কুকুর ঘরের এক কোণে বসে আছে; ধমকে কোনো কাজ হল না। যেন এই ঘরেই রাত কাটাবে এমন একটা ভাব নিয়ে বসে রইল।

'অ্যাই কুত্তা—ভাগ্, ভাগ্!'

এবারে কুকুরটা মিঃ শাসমলের দিকে দাঁত খিঁচিয়ে দিল।

মিঃ শাসমল দু'পা পিছিয়ে এলেন। ছেলেবেলায় যখন বেকবাগানে থাকতেন তখন একজন প্রতিবেশীর ছেলেকে পাগলা কুকুরে কামড়ায়; ফলে ছেলেটির হয় জলাতঙ্ক। মিঃ শাসমলের স্মৃতিতে সেটা একটা বিভীষিকার আকার ধারণ করে আছে। দাঁত খিঁচোন কুকুরের দিকে এগোনর হিম্মৎ তাঁর নেই।

আড় দৃষ্টি কুকুরের দিকে রেখে মিঃ শাসমল ঘর থেকে বারান্দায় বেরোলেন।

'চৌকিদার।'

'বাবু!'

'একবার এদিকে এস ত।'

চৌকিদার গামছা দিয়ে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এল।

'আমার ঘরে একটা কুকুর ঢুকেছে; ওটাকে তাড়াও ত।'

'কুত্তা ?'—চৌকিদার যেন ভারী অবাক হয়েছে বলে মনে হল।

'কেন, কুকুর নেই নাকি এ তল্লাটে ? তুমি আকাশ থেকে পড়লে যে ? ঘরে এস, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

চৌকিদার মিঃ শাসমলের দিকে একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকল।

'কাঁহা হ্যায় কুত্তা, বাবু ?'

মিঃ শাসমলও ঢুকলেন তার পিছনে পিছনে। সত্যিই ত এই দু'মিনিটের মধ্যেই কুকুর ভেগেছে। তাও নিশ্চিত হবার জন্য চৌকিদার খাটের তলা এবং পাশের বাথরুমটা দেখে নিল।

'নেহি বাবু কুত্তা নেহি হ্যায়।'

'ছিল চলে গেছে।'

মিঃ শাসমলের নিজেকে একটু বোকা বোকা লাগছিল। চৌকিদারকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে তিনি আবার আরাম কেদারাটায় বসলেন। প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা ক্যারমের ঘুঁটি মারার মত করে জানালা নিয়ে ফেলে দিয়ে দু'হাত মাথার উপর তুলে আড় ভাঙতে গিয়ে দেখেন—কুকুর যায় নি, অথবা এরই মধ্যে কুকুর আবার ফিরে এসেছে, এবং সেই ভাবেই ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে।

জ্বালাতনের একশেষ। রাত্তিতে তাঁর নতুন চটিটার দফারফা করবে। ফেলে রাখা চটির ওপর কুকুরের লোভের কথা মিঃ শাসমল জানেন। মেঝে থেকে বাটার চটিটা তুলে নিয়ে টেবিলের উপর রেখে দিলেন তিনি।

ঘরের একজন বাসিন্দা বাড়ল। এখন থাকুক, ঘুমোনর আগে আরেকটা চেষ্টা নেবেন ব্যাটাকে বিদেয় করার।

মিঃ শাসমল হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা এয়ার-লাইনস ব্যাগটা থেকে গোয়েন্দা উপন্যাসটা বার করলেন। ভাঁজ করা পাতায় আঙুল ঢুকিয়ে যেই খুলতে যাবেন, অমনি তাঁর চোখ গেল কুকুরের কোণের বিপরীত কোণে। সেখানে কখন যে আরেকটা প্রাণী এসে আস্তানা গেড়েছে সেটা মিঃ শাসমল আদৌ টের পান নি।

একটা বেড়াল। বাঘের মত ডোরাকাটা বেড়াল। ঘোলাটে চোখ তাঁরই দিকে রেখে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে।

এরকম বেড়াল কোথায় দেখেছেন মিঃ শাসমল ?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তাঁর বাড়ির পাশেই মুখুজ্যেদের সাতটা বেড়ালের একটা ছিল ঠিক ওরকমই দেখতে। একদিন রাত্রে---

ঘটনাটা মনে পড়ে গেল মিঃ শাসমলের।

মাস ছয়েক আগে একদিন রাত্রে বেড়ালের কান্নায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল মিঃ শাসমলের। তখন মেজাজটা ভালো যাচ্ছিল না তাঁর। তাঁর অংশীদার অধীরের সঙ্গে তার আগের দিনই প্রচণ্ড বচসা হয়েছে—প্রায় হাতাহাতি। অধীর শাসিয়েছে পুলিশের কাছে তাঁর কারচুপি ফাঁস করে দেবে। সেই অবস্থায় ঘুম এমনিতেই ভালো হচ্ছিল না, তার উপর এই বেড়ালের কাঁদুনি। আরো আধ ঘণ্টা এই কান্না শুনে আর থাকতে না পেরে একটি ভারী কাঁচের পেপারওয়েট তুলে নিয়ে কান্নার উৎস লক্ষ্য করে মিঃ শাসমল সেটিকে সজোরে নিক্ষেপ করেন। তৎক্ষণাৎ কান্না থেমে যায়। পরদিন সকালে মুখুজ্যেদের বাড়িতে হুলস্থুল কাণ্ড। তাদের সাধের হুলোকে মাঝরাত্তিরে কে যেন নৃশংসভাবে খুন করেছে। মিঃ শাসমলের খুব মজা লেগেছিল কথাটা শুনে। বেড়াল খুন! সেরকম দেখতে গেলে ত মানুষ হামেশাই খুন করছে। মনে পড়ল একবার—বহুদিন আগের ঘটনা, মিঃ শাসমল তখন কলেজে পড়েন, হস্টেলে থাকেন—ঘরের দেয়ালে পিঁপড়ের লম্বা লাইন দেখে একটা খবরের কাগজের টুকরোয় দেশলাই ধরিয়ে সেই লাইনের এ-মাথা থেকে ও-মাথা জ্বলন্ত কাগজটা একবার বুলিয়ে দিতেই সব ক'টা পিঁপড়ে এক সঙ্গে মরে কুঁকড়ে দেয়াল থেকে পড়েছিল মেঝেতে। পিঁপড়ে খুন!...

মিঃ শাসমল রিস্টওয়াচের দিকে চেয়ে দেখলেন দশটা বেজে দশ। মাসখানেক থেকে মাথায় একটা দপদপানি অনুভব করছিলেন তিনি; সেটা এখন আর নেই। আর মাথা গরম ভাবটা, যেটার জন্য তাঁকে দিনে তিনবার স্নান করতে হত, সেটাও আর বোধ করছেন না তিনি।

মিঃ শাসমল বইটা খুলে মুখের সামনে ধরলেন। দু'লাইন পড়ে আবার চোখ চলে গেল বেড়ালটির দিকে। সেটা এরকম ভাবে চেয়ে রয়েছে কেন তাঁর দিকে ?

না, একা থাকার বাসনা তাঁকে ত্যাগ করতে হল। অবিশ্যি মানুষ ত তিনি একাই; সেটাই ভরসা। রাত্রে এই দুই প্রাণী যদি উৎপাত না করে তাহলে ঘুম না হবার কোনো কারণ নেই। ঘুমটা খুবই দরকার। গত কয়েকটা দিন স্বাভাবিক কারণেই তাঁর ভালো ঘুম হয় নি। খাওয়ার আধুনিক বাতিকটা তাঁর নেই।

মিঃ শাসমল টেবিল থেকে ল্যাম্পটা তুলে বিছানার পাশে ছোট টেবিলটায় রাখলেন। তারপর গায়ের জামা খুলে আলনায় টাঙিয়ে, ফ্লাস্ক থেকে এক গেলাস জল ঢেলে খেয়ে হাতে বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

পায়ের দিকে কুকুর। সেটা বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে, দৃষ্টি মিঃ শাসমলের দিকে।

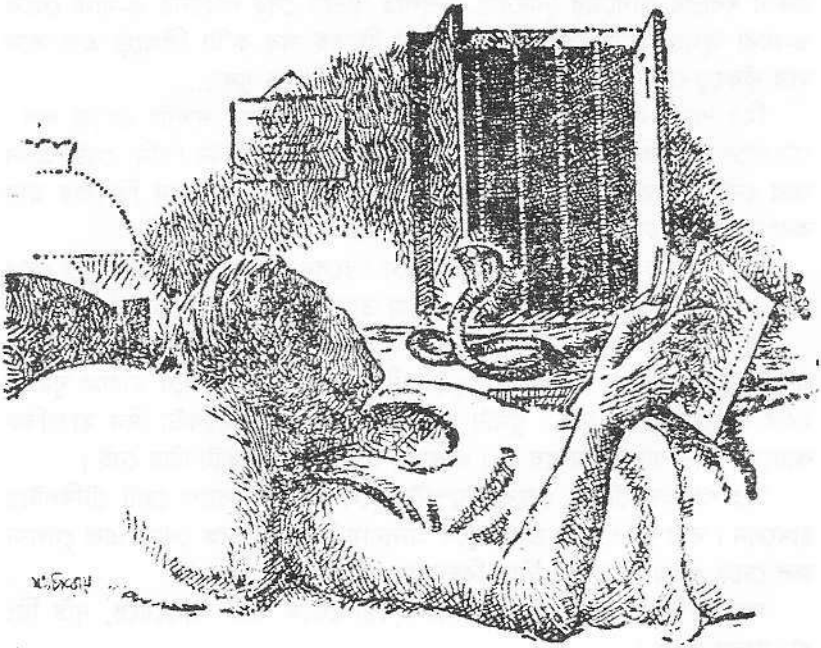

কুকুর খুন ?

মিঃ শাসমলের বুকের ভিতরে ধড়াস করে উঠল।

হ্যাঁ, তা এক রকম খুন বৈকি। ঘটনাটা মনে পড়ে গেছে। বোধহয় তিয়াত্তর সাল। গাড়িটা তখন সবে কিনেছেন মিঃ শাসমল। চালক হিসাবে তিনি কিঞ্চিৎ 'র‍্যাশ'। কলকাতার ভীড়ে স্পীড তোলা সম্ভব নয় তাই বোধহয় শহর থেকে বেরোলেই মিঃ শাসমলের স্পিডমিটারের কাঁটা তরতরিয়ে উঠে যায় উপর দিকে। ৭০ মাইলে স্পীড না ওঠা পর্যন্ত তাঁর মন অতৃপ্ত থেকে যায়। সেই অবস্থায় একবার ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে কোলাঘাট যাবার পথে একটা নেড়ী কুকুর তাঁর গাড়ির তলায় পড়ে। সাদার উপর বাদামী ছোপ। মিঃ শাসমল তা সত্ত্বেও গাড়ির স্পীড কমাননি। যে কুকুর খেতে পায় না, যার পাঁজরার হাড় গোণা যায় তার বেঁচে থেকে লাভ কী—এমন একটা ধারণা মনে এনে অপরাধবোধ লাঘব করতে চেষ্টা করেছিলেন এটাও মনে আছে।

কিন্তু এই স্মৃতিই তাঁর মনের নিরুদ্বেগ ভাবটাকে একেবারে তছনছ করে দিল।

জীবনে যত প্রাণী হত্যা করেছেন তিনি তার সবগুলোই কি আজ এই ঘরে এসে হাজির হবে নাকি ? সেই যে সেই প্রথম এয়ার গান দিয়ে মারা কুচকুচে কালো নাম-না জানা পাখি আর সেবার সেই ঝাড়গ্রামে মামাবাড়িতে থান ইঁট দিয়ে—

হ্যাঁ, সেটাও এসেছে।

জানালার দিকে চোখ যেতেই মিঃ শাসমল সাপটাকে দেখতে পেলেন। হাত চারেক লম্বা একটি গোখরো। তার মসৃণ দেহটা জানালা দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে দেয়ালের সংলগ্ন টেবিলটার উপর উঠেছে। এপ্রিল মাসে সাপ বেরোয় না; কিন্তু এই সাপ বেরিয়েছে।

সাপের তিন ভাগের দুই ভাগ রয়ে গেল টেবিলের উপর। বাকি এক ভাগ টেবিল ছেড়ে উঁচিয়ে উঠল ফণা তোলার ভঙ্গিতে। ল্যাম্পের আলোয় জ্বলজ্বল করছে তার নির্মম নিষ্পলক দুটি চোখ।

ঝাড়গ্রামে তাঁর মামাবাড়িতে ঠিক এমনই একটা গোখরোর মাথা থেঁতলে দিয়েছিল মিঃ শাসমল থান ইঁট মেরে। সেটা ছিল নাকি বাস্তুসাপ, কারুর কোনো অনিষ্ট করে নি কোনদিন।

মিঃ শাসমল অনুভব করলেন তাঁর গলা একদম শুকিয়ে গেছে। চেঁচিয়ে যে চৌকিদারকে ডাকবেন তার কোনো উপায় নেই।

বাইরে ঝিঁঝিঁর ডাক থেমে গিয়ে চারিদিকে এক অপার্থিব নিস্তব্ধতা। হাত ঘড়ির কোনো শব্দ নেই, নাহলে সেটা শোনা যেত। একবার মিঃ শাসমলের মনে হল তিনি হয়ত স্বপ্ন দেখছেন। সম্প্রতি দু-একবার এরকম হয়েছে। নিজের ঘরে

নিজের খাটে শুয়ে হঠাৎ মনে হয়েছে তিনি যেন অন্য কোথাও রয়েছেন, ঘরে অচেনা লোকজন চলাফেরা করছে, অস্ফুট স্বরে কথা বলছে। কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য। ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বোধহয় এরকম হয়। এও একরকম স্বপ্ন, যদিও পুরোপুরি স্বপ্ন নয়।

আজ অবিশ্যি স্বপ্ন দেখছেন না তিনি। নিজের গায়ে চিমটি কেটে বুঝেছেন তিনি জেগেই আছেন। যা ঘটছে তা সত্যিই তাঁর চোখের সামনে এবং তাঁকে দেখানোর জন্যই ঘটছে।

আরো ঘন্টাখানেক এই ভাবে শুয়ে রইলেন মিঃ শাসমল। ইতিমধ্যে মশা ঢুকেছে ঘরে। কামড় তিনি অনুভব করেন নি এখনও, কিন্তু তারা যে আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে সেটা চোখে দেখে এবং কানে শুনে বুঝেছেন। কত মশা মেরেছেন তিনি জীবনে তার কি হিসাব আছে ?

শেষ পর্যন্ত প্রাণীদের দিক থেকে উৎপাতের কোনো ইঙ্গিত না পেয়ে মিঃ শাসমল খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন! এবার ঘুমোনোর চেষ্টা দিলে কেমন হয় ?

ল্যাম্পটা কমানোর জন্য হাত বাড়াতেই বাইরে থেকে একটা শব্দ এল। বাংলোর গেট থেকে বারান্দার সিঁড়ি পর্যন্ত পথটা নুড়ি পাথর দিয়ে ঢাকা। সেই পথ দিয়ে কেউ হেঁটে আসছে।

চতুষ্পদ নয়, দ্বিপদ।

এবারে মিঃ শাসমল বুঝলেন তাঁর সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে আসছে, আর তাঁর হৃদস্পন্দনের শব্দ তিনি নিজের কানে শুনতে পাচ্ছেন।

বেড়াল কুকুরের দৃষ্টি এখনো তাঁর দিকে। মশা গান গেয়ে চলেছে তাঁর কানের পাশে। গোখরোর ফনা এখনো তোলা; কোন অদৃশ্য সাপুড়ের অশ্রুত বাঁশির তালে তালে যেন সেই ফণা দুলছে।

পায়ের শব্দ এবার বারান্দায়। এগিয়ে আসছে।

ফুরুৎ করে একটা কুচকুচে কালো পাখি জানালা দিয়ে ঢুকে টেবিলে বসল। এই সেই পাখি—তাঁর এয়ার গানের গুলি খেয়ে যেটা পাঁচিল থেকে টুপ্ করে পড়েছিল পাশের বাড়ির বাগানে।

পায়ের শব্দ তাঁর ঘরের দরজার বাইরে থামল।

মিঃ শাসমল জানেন কে এসেছে। অধীর। অধীর চক্রবর্তী। তাঁর পার্টনার। এককালে বন্ধু ছিল, কিন্তু সম্প্রতি পরস্পর প্রায় কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মিঃ শাসমলের ব্যবসায়িক কারচুপি অধীরের পছন্দ হয়নি। তাঁকে শাসিয়েছিল পুলিশে ধরিয়ে দেবে বলে। মিঃ শাসমল উলটে বলেছিলেন—ব্যবসার ক্ষেত্রে সিধে রাস্তাটা হল মূর্খের রাস্তা। অধীর সেটা মানেনি। এটা আগে জানা থাকলে কখনই তাকে অংশীদার করতেন না মিঃ শাসমল। তিনি বুঝেছিলেন অধীর তাঁর

পরম শত্রু। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। শেষ রাখেননি মিঃ শাসমল। গতকাল রাত্রে অধীরেরই বৈঠকখানায় দুজনে মুখোমুখি বসেছিলেন। মিঃ শাসমলের পকেটে রিভলভার। খুনের অভিপ্রায় নিয়েই এসেছেন তিনি। মাত্র চার হাত দূরে বসে অধীর। অধীরের গলা যখন ভর্ৎসনার সপ্তমে চড়েছে, তখন রিভলবার বার করে গুলি চালান মিঃ শাসমল। তাঁর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখে এককালের বন্ধু অধীর চক্রবর্তীর মুখের অবস্থা কী হয়েছিল সেটা ভাবতে হাসি এল মিঃ শাসমলের। খুনটা করার দশ মিনিটের মধ্যেই তিনি গাড়িতে বেরিয়ে পড়েন। রাতটা বর্ধমান স্টেশনের ওয়েটিংরুমে কাটিয়ে আজ সকালে এই দশ দিন আগে রিজার্ভ করা বাংলোর উদ্দেশে রওনা দেন।

দরজায় আঘাত পড়ল। একবার, দু'বার, তিনবার।

মিঃ শাসমল চেয়ে আছেন দরজার দিকে। তাঁর সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরেছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে।

'দরজা খোল, জয়ন্ত। আমি অধীর। দরজা খোল।'

যাকে তিনি গতকাল রাত্রে খুন করে এসেছেন, এই সেই অধীর। একটা কারণে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল খুনটা ঠিক হয়েছে কিনা, কিন্তু এখন আর নেই । ওই কুকুর, ওই বেড়াল, ওই সাপ, ওই পাখি—আর এখন দরজার বাইরে অধীর। সবাই যখন এসেছে মৃত্যুর পরে, তখন অধীরও আসবে এটাই সঙ্গত।

আবার দরজায় ঘন ঘন করাঘাত।

মিঃ শাসমলের দৃষ্টি ঝাপসা, কিন্তু তিনি দেখতে পাচ্ছেন কুকুরটা তাঁর দিকে এগোচ্ছে, বেড়ালের চোখ তাঁর নিজের চোখের এক হাতের মধ্যে, সাপটা টেবিলের পায়া বেয়ে মেঝেতে নামছে তাঁরই দিকে এগোবে বলে, পাখিটা এসে খাটের উপর বসল, তাঁর বুকে গেঞ্জির ওপর অজস্র পিঁপড়ে এসে হাজির হয়েছে...

শেষ পর্যন্ত দুই কনস্টেবলের ঠেলায় দরজা ভাঙল।

অধীরবাবুই পুলিশ নিয়ে এসেছেন কলকাতা থেকে। মিঃ শাসমলের কাগজপত্র থেকে টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা চিঠি বেরোয়; এই বাংলো রিজার্ভ করার খবর ছিল তাতে।

ঘরে ঢুকে মিঃ শাসমলকে মৃত অবস্থায় দেখেই ইনস্পেকটর সামন্ত অধীরবাবুকে জিগ্যেস করলেন তাঁর পার্টনারের হার্টের ব্যারাম ছিল কিনা। অধীরবাবু বললেন, 'হার্টের কথা জানি না, তবে ইদানীং ওর মাথাটা গোলমাল করছিল। যে ভাবে টাকা এদিক-ওদিক করেছে, আমাকে যে ভাবে ঠকিয়েছে,

সেটা সুস্থ-মস্তিষ্ক লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। অবিশ্যি ওর হাতে রিভলভার দেখে সে ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়। সত্যি বলতে কি, ও যখন ওটা বার করল পকেট থেকে, তখন আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি। ও গুলি মেরে পালানোর পর দশ মিনিট লেগেছিল আমার সংবিৎ ফিরে পেতে। তখনই ঠিক করি এই উন্মাদকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে। আমি যে খুন হইনি, সেটা নেহাৎই দৈবক্রমে।'

মিঃ সামন্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, 'কিন্তু এত কাছ থেকে আপনাকে মিস্ করলেন কী করে?'

অধীরবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'কপালে মৃত্যু না থাকলে আর মানুষ কী করে মরে বলুন! গুলি ত আমার গায়ে লাগেনি। লেগেছিল আমার সোফার গায়ে। অন্ধকারে লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতা আর ক'জনের থাকে? রিভলভার বার করার সঙ্গে সঙ্গে যে আমার পাড়ায় লোড শেডিং হয়ে যায়!'

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
কিশোরসাহিত্য কেন্দ্র

পিন্টুর দাদু

পিন্টুর আপসোস এইখানেই। তার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেরই দাদু আছে, কিন্তু কই, তাদের কেউই ত তার নিজের দাদুর মত নয়। রাজুর দাদুকে সে দেখেছে নিজে হাতে লাল আর বেগুনী কাগজের ফিতে পর পর জুড়ে রাজুর ঘুড়ির জন্য লম্বা ল্যাজ তৈরি করে দিতে। স্বপন আর সুদীপের দাদু—যাঁর টকটকে রঙ, গালভরা হাসি আর ধপ্‌ধপে সাদা দাড়িগোঁফ দেখলেই পিন্টুর ফাদার ক্রিসমাসের কথা মনে পড়ে যায়—তিনি কী দারুণ মজার মজার ছড়া লেখেন। একটা ছড়া স্বপনের কাছ থেকে শুনে শুনে পিন্টুর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল; এখনও বেশ কয়েক লাইন মনে আছে—

লন্ডন ম্যাড্রিড সানফ্রানসিস্কো
আকবর হুমায়ূন হর্ষ কণিষ্ক
অ্যান্ডিজ কিলিমাঞ্জারো ফুজিয়ামা
তেনজিং ন্যানসেন ভাস্কো-ডা-গামা
রিগা লিমা পেরু চিলি চুংকিং কঙ্গো
হ্যানিবল তুঘলক তৈমুরলঙ্গ...

কী মজার ছড়া!—এক লাইন ভূগোল, এক লাইন ইতিহাস। আর ছড়া যে শুধু লেখেন তা নয়; তাতে সুর দিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করে পাড়ার ছেলেদের ডেকে শোনান।

এছাড়া সন্তুর দাদু—যাঁকে দেখতে ঠিক হ-য-ব-র-ল-র উদোর মত—তিনি মোমবাতির আলোয় দেয়ালে নিজের হাতের ছায়া ফেলে দারুণ শ্যাডোগ্রাফি দেখান; অতীনের দাদু ফাটাফাটি রকম ভালো শিকারের গল্প করেন; সুবুর দাদু সাবানজলে কী জানি একটা মিশিয়ে আশ্চর্য রকম মজবুত বুদবুদ তৈরি করেন। একবার তাঁর তৈরি একটা পাঁচ নম্বরের ফুটবলের সাইজের বুদবুদকে পিন্টু সাতবার মাটিতে পড়ে লাফিয়ে তারপর ফাটতে দেখেছিল।

পিন্টু অনেকবার এইসব ভেবেছে, আর নিজের দাদুর সঙ্গে এদের দাদুর তুলনা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

একটা গালভরা নাম আছে অবিশ্যি পিন্টুর দাদুর—ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ গুহ মজুমদার। নামের পর আবার অনেকগুলো ইংরেজি অক্ষর আর কমা-ফুলস্টপ। সেগুলো সব নাকি দাদুর পাওয়া ডিগ্রী। মা-বাবার কাছে পিন্টু শুনেছে যে দাদুর মত বিদ্বান লোক শুধু বাংলাদেশে কেন, ভারতবর্ষেই কম আছে। দাদু নাকি বারো বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। তাঁর পড়াশুনার জন্য বাড়ি থেকে প্রায় খরচই দিতে হয়নি, কারণ তাঁর মত এত বৃত্তি নাকি খুব কম ছাত্রই পেয়েছেন। তাছাড়া সোনা রূপোর মেডেল যে কত আছে তার ত হিসেবই নেই। আর আছে নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া মানপত্র, যেগুলো দাদুর ঘরের দেয়ালের সব ফাঁক ভরিয়ে দিয়েছে। যদিও দাদু সব বিষয়েই পণ্ডিত, যে বিষয়টা তাঁর সবচেয়ে ভালো করে জানা, সেটাকে বলে দর্শন। এই দর্শন নিয়ে দাদুর লেখা একটি ইংরেজি বই বেরিয়েছে দু'বছর আগে। পিন্টু দেখেছে সেটা ৭৭২ পৃষ্ঠা, আর তার দাম পঁয়ষট্টি টাকা।

কিন্তু এত জ্ঞান, এত বিদ্যা হলেই কি মানুষকে এত গোমড়া আর এত থমথমে হতে হবে ? পিন্টুর বন্ধুদের মধ্যে ত এটা ঠাট্টারই ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।—'হ্যাঁরে আজ তোর দাদু হেসেছেন ?'—এ প্রশ্নটা যে পিন্টুকে কতবার শুনতে হয়েছে! উত্তরে সে যদি হ্যাঁ বলে, তাহলে সেটা হবে মিথ্যে কথা; কারণ পিন্টুর এই আট বছরের এমন একটা দিনও মনে পড়ে না যেদিন সে দাদুকে হাসতে দেখেছে। তবে এও ঠিক, যে ধমক-ধামক করা বা গলা তুলে কথা বলা, এগুলোও দাদু বিশেষ করেন না। সেটার সুযোগও বাড়ির লোকে দেয় না, কারণ সবাই জানে যে দাদুর পান থেকে চুনটি খসলে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। পিন্টু মার কাছে শুনেছে যে সে যখন জন্মায়নি তখন জগন্নাথ ধোপা একবার নাকি দাদুর পাঞ্জাবিতে ভুল করে বেশি মাড় দিয়ে ফেলেছিল। তাতে দাদু তাঁর কাঁঠাল কাঠের লাঠি দিয়ে প্রথম জগন্নাথকে পেটান, তারপর তার গাধাটাকে পেটান। গাধাটা কী দোষ করল সেটা আর কারুর জিগ্যেস করার সাহস হয়নি।

পিন্টু নিজে গত বছর বাড়ির বাইরের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলতে গিয়ে দাদুর ঘরের জানালার একটা কাঁচ ভেঙে দেয়। দাদু তখন সারাদিনের লেখাপড়ার কাজের পর বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে শবাসনে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সময় গুলিটা কাঁচ ভেঙে ঘরের ভিতর এসে পড়ে। দাদু গুলি হাতে বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। পিন্টুর হাতেই ডাণ্ডা, তাই দাদুর বুঝতে বাকি থাকে না কার কীর্তি এই কাঁচ ভাঙা। দাদু চোখ রাঙাননি, ধমক দেননি, এমন কি একটি কথাও বলেননি পিন্টুকে।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরলে পর মা পিন্টুকে ডেকে বললেন, 'ডাণ্ডাটা দে। ওটা থাকবে দাদুর ঘরে। আর সাতদিন তোর সব খেলা বন্ধ।'

পিন্টুর চোখে জল এসে গিয়েছিল। সাতদিন খেলা বন্ধের চেয়েও বেশি আফসোস হয়েছিল ডাণ্ডা-গুলিটার জন্য। বিশেষ করে গুলিটা। শ্রীনিবাস কী সুন্দর করে দা দিয়ে ছুঁচোল করে কেটে দিয়েছিল দুটো দিক। এত ভালো গুলি এ তল্লাটে আর কারুর নেই।

অথচ পিন্টু জানে যে দাদু ছেলেবেলায় এরকম ছিলেন না। বাড়িতে একটা অনেক দিনের পুরোন বিলিতি ফোটো অ্যালবাম আছে, যার মোটা মোটা পাতার পাশগুলোতে সোনার জল লাগানো। সেই অ্যালবামে দাদুর একটা ছবি আছে বাষট্টি বছর আগে তোলা। তখন দাদুর পিন্টুরই বয়স। তাতে দাদুর পরনে হাফ প্যান্ট, মুখে আর হাতে একটি হকি স্টিক। তাঁর তখনকার চেহারার সঙ্গে পিন্টুর নিজের চেহারার আশ্চর্য মিল সেটা পিন্টু বেশ বুঝতে পারে। সেই হাশিখুশি খেলুড়ে খোকা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এমন হয়ে গেল কি করে?

দাদু যে সব সময় পিন্টুদের বাড়িতেই থাকেন তা নয়। পিন্টুর জ্যাঠামশাই আসামে জঙ্গল বিভাগে বড় চাকরি করেন; তাঁর একটা চমৎকার বাংলো আছে জঙ্গলের ভিতরে। দাদু মাঝে মাঝে সেখান গিয়ে থেকে আসেন মাস খানেক করে। যাবার সময় সুটকেস বোঝাই বই আর খাতা নেন সঙ্গে, আর যখন ফেরেন তখন খাতাগুলো লোখায় ভরে যায়।

যে সময়টা তিনি থাকেন না, সে সময়টা বাড়ির চেহারাই পালটে যায়। পিন্টুর দিদি রেডিওতে সিনেমার গান শোনে, দাদা হপ্তায় দুটো করে ফাইটিং-এর ছবি দেখে, বাবার চুরুট খাওয়া বেড়ে যায়, আর মা দুপুর হলেই পাড়ার সদু মাসি-লক্ষ্মীমাসিদের ডেকে এনে দিব্যি খোশ মেজাকে তাস খেলেন আর আড্ডা দেন।

দাদু ফিরে এলেই অবিশ্যি আবার যেই কে সেই।

কিন্তু এবার হল একটু অন্য রকম।

এক মাসের জন্য দাদু গিয়েছিলেন আসামে তাঁর বড় ছেলের কাছে। পিন্টু মা-বাবার সঙ্গে এক ঘরে শোয়; দাদু ফেরার দু'দিন আগে মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে পিন্টু শোনে মা-বাবা দাদুকে নিয়ে কথা বলছেন। পিন্টু মটকা মেরে পড়ে থেকে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে কথা শুনল, কিন্তু বাবা অনেক শক্ত শক্ত ইংরেজি কথা ব্যবহার করাতে অনেক কিছুই বুঝতে পারল না। তবে এইটুকু বুঝল যে দাদুর কী একটা অসুখ করেছে।

দুদিন বাদে অসুখ নিয়েই ফিরলেন দাদু। বাবার সঙ্গে ডাঃ রুদ্র স্টেশনে গেলেন দাদুকে আনতে। বাবার অ্যাম্বাসাডর গাড়িতেই দাদু ফিরলেন, আর তাঁকে

গাড়ি থেকে ধরে ধরে নামালেন বাবা আর ডাঃ রুদ্র। তারপর ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায়, বারান্দা থেকে বৈঠকখানায়, বৈঠকখানা থেকে দোতালার সিঁড়ি, আর সিঁড়ি উঠে দাদুর ঘরে নিয়ে তাঁর বিছানায় তাঁকে শুইয়ে দিলেন। পিন্টু ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল, এমন সময় মা এসে তার মাথায় হাত দিয়ে নরম গলায় বললেন, 'এখানে না, নিচে যাও।'

'দাদুর কী হয়েছে মা ?' পিন্টু না জিগ্যেস করে পারল না।

'অসুখ', বললেন মা।

অথচ পিন্টুর দেখে মনে হয়নি দাদুর কোনো অসুখ হয়েছে। অবিশ্যি এটা ঠিকই যে দাদুকে এইভাবে পরের কাঁধে ভর করতে কোনোদিন দেখেনি পিন্টু। তাহলে কি পায়ে কোনো চোট পেয়েছেন ? জেঠুর বাংলোর বাইরে যদি একা হাঁটতে বেরিয়ে থাকেন দাদু তাহলে জঙ্গলের মধ্যে খানাখন্দে পড়ে চোট পাওয়া কিছুই আশ্চর্য না। কিম্বা যদি সাপ-টাপ বা বিছে-টিছে কামড়ে থাকে, তাহলেও অবিশ্যি অসুখ হতে পারে।

তিন দিন এইভাবে কেটে গেল। পিন্টুর শোবার ঘর এক তলায়, দাদুর ঘরের ঠিক নিচে। পিন্টুকে যেতে দেওয়া হয় না। কাজেই দাদুর অসুখ কেমন যাচ্ছে সেটা জানার উপায় নেই। দিদি বা দাদা থাকলে হয়ত জানা যেত, কিন্তু দিদি কলকাতার হস্টেলে, আর দাদা তার বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গেছে রানিখেত। গতকাল রাত্রে পিন্টু দাদুর ঘরে একটা কাঁসার গেলাস কিম্বা বাটি মেঝেতে পড়ার শব্দ পেয়েছে আর আজ সকালে দুপধাপ শব্দ শুনে মনে হয়েছে দাদু হাঁটছেন। তাহলে আর দাদুর এমন কী অসুখ ?

দুপুরে পিন্টু আর থাকতে পারল না। মা দাদুকে ওষুধ খাইয়ে নিচে নেমে এসেছেন কিছুক্ষণ হল, আর বাবা চলে গেছেন কোর্টে। আজ বিকেল থেকে একজন নার্স আসবে সে কথা পিন্টু জানে, কিন্তু এখন দাদুর ঘরে আর কেউ নেই।

বুকের মধ্যে একটা ধুকপুকুনির সঙ্গে পিন্টু বুঝতে পারল যে তাকে একবার দোতলায় গিয়ে দাদুর ঘরে উঁকি দিতেই হবে। শুধু তাই না; দাদু যদি ঘুমোন, তাহলে তাকে ঢুকতে হবে, আর ঢুকে তার ডান্ডা আর গুলিটা খুঁজে বার করে আনতে হবে। দাদু যখন থাকেন না তখন তাঁর ঘর তালা চাবি দিয়ে বন্ধ থাকে, তাই ওঘর থেকে কিছু বার করে আনার উপায় থাকে না।

দোতলায় উঠতে পিন্টুর যে একটু ভয়-ভয় করছিল না তা নয়; তবে অসুস্থ দাদু আর তেমন কী করতে পারেন এই ভেবে মনে খানিকটা সাহস পেয়ে উনিশ ধাপ সিঁড়ি উঠে পা টিপে সে দাদুর ঘরের দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। প্যাসেজের বাঁয়ে ঘরের দরজা, আর সামনের আট-দশ পা এগিয়ে ছাতের দরজা।

কোন শব্দ নেই ঘরে। যে গন্ধটা পাচ্ছে পিন্টু সেটা ওর খুব চেনা আর প্রিয় গন্ধ। দু'হাজার পুরোন বইয়ের গন্ধ। দু'হাজার পুরোন বই আছে দাদুর ঘরে।

পিন্টু নিশ্বাস বন্ধ করে গলাটা বাড়িয়ে দিল।

দাদুর খাট খালি।

তবে কি দাদু পিছনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন ?

পিন্টু তার ডান পা-টা বাড়িয়ে দিল চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢোকার জন্যে। পা-টা চৌকাঠের ওদিকের মেঝেতে পৌছবার আগেই একটা শব্দ এল তার কানে।

'খটাং, খটাং, খটাং!'

পিন্টু চমকে পিছিয়ে আসতেই আরেকটা শব্দ—

'কু-ই ই ই!'

পিন্টুর চোখ চলে গেল ছাতের দরজার দিকে। দরজার পাশ দিয়ে একটা মুখ উঁকি মারছে।

দাদুর মুখ। এ মুখ পিন্টু এর আগে কখনো দেখে নি। সারা মুখ হাসিতে উজ্জ্বল, চোখের চাহনি দুষ্টুমিতে ভরা।

পিন্টু অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে মুখের দিকে।

তারপর দাদুর ডান হাতটা বেরিয়ে এল দরজার পাশ দিয়ে।

পিন্টু দেখল সে হাতে ধরা তার ডাংগুলির ডাণ্ডা।

এবার দাদু পিন্টুকে আসবার জন্যে ইসারা করে দরজা থেকে সরে গেলেন। পিন্টু ছাতের দিকে এগিয়ে গেল।

বেশ বড় খোলা ছাত, ছাতের মাঝখানে রাখা শ্রীনিবাসের তৈরি কাঠের গুলি।

দাদু পিন্টুর দিকে চেয়ে একবার হেসে হাতের ডাণ্ডাটা গুলির দিকে তাক করে মারলেন—খটাং!

গুলিতে লাগল না ডাণ্ডা। তারপর আবার মারতেই গুলির ঠিক মোক্ষম জায়গায় লেগে সেটা বাঁই বাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে হাতের চার হাত উপরে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দাদু চালালেন ডাণ্ডা।

ডাণ্ডার বাড়ি লেগে গুলিটা ছাতের পঞ্চাশ হাত পশ্চিমে সুপুরি গাছটার মাথার উপর দিয়ে সন্তুদের বাড়ির দিকে সাঁ করে চলে গেল উড়ন তুবড়ির মত। তারপরই শুরু হল দাদুর খিলখিলে হাসির সঙ্গে হাততালি আর লাফানি।

পিন্টু ছাত থেকে নিচে নেমে এল।

মা-কে ঘটনাটা বলতে মা বললেন ওটাই নাকি দাদুর অসুখ। এরকম অসুখ নাকি মাঝে মাঝে বুড়োদের হয়; তারা আর বুড়ো থাকেন না, খোকা হয়ে যায়।

যাই হোক, পিন্টু আজ প্রথম তার বন্ধুদের বলতে পারবে যে সে তার দাদুকে প্রাণ খুলে হাসতে দেখেছে।

ভূ তো

নবীনকে দ্বিতীয়বার হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল। অক্রুরবাবুর মন ভেজানো গেল না। উত্তরপাড়ার একটা ফাংশনে নবীন পেয়েছিল অক্রুর চৌধুরীর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয়। 'ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম' খেলার নামটা নবীনের জানা ছিল না। সেটা বলে দেয় দ্বিজপদ। দ্বিজুর বাবা অধ্যাপক, তাঁর লাইব্রেরিতে নানান বিষয়ের বই। দ্বিজু নামটা বলে বানানটাও শিখিয়ে দিল। ভি-ই-এন-টি-আর-আই-এল-ও-কিউ-ইউ-আই-ইস-এম। 'ভেন্‌ট্রিলোকুইজম্‌'। অক্রুর চৌধুরী মঞ্চে একা মানুষ, কিন্তু তিনি কথা চালিয়ে যাচ্ছেন আরেকজন অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে। সেই মানুষ যেন হলের সিলিং-এর কাছাকাছি কোথাও শূন্যে অবস্থান করছে। অক্রুরবাবু তাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেন, তারপর উত্তর আসে উপর থেকে।

'হরনাথ, কেমন আছ ?'

'আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি।'

'শুনলাম তুমি নাকি আজকাল সঙ্গীতচর্চা করছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।'

'রাগ সঙ্গীত ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রাগ সঙ্গীত।'

'গান করো ?'

'আজ্ঞে না।

'যন্ত্র সঙ্গীত ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী যন্ত্র ? সেতার ?'

'আজ্ঞে না।'

'সরোদ ?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে কী বাজাও ?'

'আজ্ঞে গ্রামোফোন।'

হাসি আর হাততালিতে হল মুখর হয়ে ওঠে। প্রশ্নটা উপর দিকে চেয়ে করে উত্তরটা শোনার ভঙ্গিতে মাথাটা একটু হেঁট করে নেন অক্রুরবাবু, কিন্তু তিনি নিজেই যে উত্তরটা দিচ্ছেন সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই। ঠোঁট একদম নড়ে না।

নবীন তাজ্জব বনে গিয়েছিল। এ জিনিস শিখতে না পারলে জীবনই বৃথা। অক্রুর চৌধুরী কি ছাত্র নেবেন না ? নবীনের পড়াশুনায় আগ্রহ নেই। হাইয়ার সেকেন্ডারী পাশ করে বসে আছে বছর তিনেক। আর পড়ার ইচ্ছে হয়নি। বাপ নেই, কাকার বাড়িতেই মানুষ সে। কাকার একটা প্লাইউডের কারখানা আছে; তাঁর ইচ্ছে নবীনকে সেখানেই ঢুকিয়ে দেন, কিন্তু নবীনের শখ হল ম্যাজিকের দিকে। হাত সাফাই রুমালের ম্যাজিক, আংটির ম্যাজিক, বলের ম্যাজিক— এসব সে বাড়িতেই অভ্যাস করে বেশ খানিকটা আয়ত্ত করেছে। কিন্তু অক্রুর চৌধুরীর ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম দেখার পরে সেগুলোকে নিরামিষ বলে মনে হচ্ছে।

ফাংশনের উদ্যোক্তাদের কাছেই নবীন জানল অক্রুরবাবু থাকেন কালকাতায় অ্যামহার্স্ট লেনে। পরদিনই ট্রেনে চেপে কলকাতায় এসে সে সোজা চলে গেল যাঁকে গুরু বলে মেনে নিয়েছে তাঁর বাড়িতে। গুরু কিন্তু বাঁধ সাধলেন।

'কী করা হয় এখন ?' প্রথম প্রশ্ন করলেন ভেন্‌ট্রিলোকুইস্ট। কাছ থেকে ভদ্রলোককে দেখে হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল নবীনের। বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়, চাড়া দেওয়া ঘন কালো গোঁফ, মাথার কালো চুলের ঠিক মধ্যিখানে টেরি, তার দু'দিক দিয়ে ঢেউ খেলে চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। চোখ দুটো ঢুলুঢুলু যদিও স্টেজে এই চোখই স্পটলাইটের আলোতে ঝিলিক মারে।

নবীন পরিচয় দিয়ে বলল, সে কী করে।

'এই সব শখ হয়েছে কেন ?'

নবীন সত্যি কথাটাই বলল।—'একটু-আধটু ম্যাজিকের অভ্যাস আছে, কিন্তু এটার শখ হয়েছে আপনার সেদিনের পারফরম্যান্স দেখে।'

অক্রুরবাবু মাথা নাড়লেন।

'এ জিনিস সকলের হয় না। অনেক সাধনা লাগে। আমাকেও কেউ শেখায় নি। যদি পার ত নিজে চেষ্টা করে দেখ।'

নবীন সেদিনের মত উঠে পড়ল, কিন্তু সাতদিন বাদেই আবার অ্যামহার্স্ট লেনে গিয়ে হাজির হল। ইতিমধ্যে সে খালি ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌মের স্বপ্ন দেখেছে। এবার দরকার হলে সে অক্রুরবাবুর হাতে পায়ে ধরবে।

কিন্তু এবার আরো বিপর্যয়। এবার অক্রুরবাবু তাকে একরকম বাড়ি থেকে বারই করে দিলেন। বললেন, 'আমি যে শেখাবো না সেটা প্রথমবারেই তোমার

বোঝা উচিত ছিল। সেটা বোঝনি মানে তোমার ঘটে বুদ্ধি নেই। বুদ্ধি না থাকলে কোনোরকম ম্যাজিক চলে না—এ ম্যাজিক ত নয়ই।'

প্রথমবারে নবীন মুষড়ে পড়েছিল, এবারে তার মাথা গরম হয়ে গেল। চুলোয় যাক অক্রুর চৌধুরী। সে যদি না শেখায় তবে নবীন নিজেই শিখবে, কুছ পরোয়া নেহি।

নবীনের মধ্যে যে এতটা ধৈর্য আর অধ্যবসায় ছিল সেটা সে নিজেই জানত না। কলেজ স্ট্রীটে একটা বইয়ের দোকান থেকে ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম সম্বন্ধে একটা বই কিনে নিয়ে সে শুরু করে দিল তার সাধনা।

মোটামুটি নিয়মটা সহজ। 'প' বর্গের অর্থাৎ প-ফ-ব-ভ-ম, কেবল এই ক'টা অক্ষর উচ্চারণ করার সময় ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকে, ফলে ঠোঁট নাড়াটা ধরা পড়ে বেশি। এই ক'টা অক্ষর না থাকলে যে কোনো কথাই ঠোঁট ফাঁক করে অথচ না নাচিয়ে বলা যায়। কোনো কথায় 'প' বর্গের অক্ষর থাকলে সেখানেও উপায় আছে। যেমন, 'তুমি কেমন আছ' কথাটা যদি 'তুঙি কেঙন আছ' করে আর বলা যায়, তাহলে আর ঠোঁট নাড়াবার কোনো দরকারই হয় না, কেবল জিভ নাড়লেই চলে। প-ফ-ব-ভ-ম-য়ের জায়গায় ক-খ-গ-ঘ-ঙ—এই হল নিয়ম। কথোপকথন যদি হয় এই রকম—'তুমি কেমন আছ ?' 'ভালো আছি', 'আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না ?' 'তা পড়েছে, দিব্যি ঠাণ্ডা।'—তাহলে সেটা বলতে হবে এই ভাবে—'তুমি কেমন আছ ?' 'ঘালো আছি', 'আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না ?' 'তা করেছে, দিগ্যি ঠাণ্ডা।'

আরো আছে। উত্তরদাতার গলার আওয়াজটাকে চেপে নিজের আওয়াজের চেয়ে একটু তফাত করে নিতে হবে। এটাও সাধনার ব্যাপার, এবং এটাতেও অনেকটা সময় দিল নবীন। কাকা এবং কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধুকে শুনিয়ে যখন সে তারিফ পেল, তখনই বুঝল যে ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম ব্যাপারটা তার মোটামুটি রপ্ত হয়েছে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

সেই অদৃশ্য উত্তরদাতার যুগ আর আজকাল নেই। আজকাল ভেন্‌ট্রি-লোকুইস্টের কোলে থাকে পুতুল। সেই পুতুলের পিছন দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মাথা ঘোরায় এবং ঠোঁট নাড়ায় যাদুকর। মনে হয় যাদুকরের প্রশ্নের উত্তর বেরোচ্ছে এই পুতুলের মুখ দিয়েই।

তাঁর আশ্চর্য প্রোগ্রেসে খুশি হয়ে কাকাই এই পুতুল বানাবার খরচ দিয়ে দিলেন নবীনকে। পুতুলের চেহারা কেমন হবে এই নিয়ে দিন পনের ধরে গভীর চিন্তা করে হঠাৎ এক সময় নবীনের মাথায় এল এক আশ্চর্য প্ল্যান।

পুতুল দেখতে হবে অবিকল অক্রুর চৌধুরীর মত। অর্থাৎ অক্রুর চৌধুরীকে হাতের পুতুল বানিয়ে তাঁর অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

একটা হ্যান্ডবিলে অক্রুর চৌধুরীর একটা ছবি ছিল সেটা নবীন সযত্নে রেখে দিয়েছিল। সেটা সে আদিনাথ কারিগরকে দেখাল---'এইরকম গোঁফ, এই টেরি, এইরকম ঢুলুঢুলু চোখ, ফোলা ফোলা গাল।' সেই পুতুল যখন মুখ নাড়বে আর ঘাড় ঘোরাবে নবীনের কোলে বসে, তখন কী রগড়টাই না হবে! আশা করি তার শো দেখতে আসবেন অক্রুর চৌধুরী!

সাতদিনের মধ্যে পুতুল তৈরি হয়ে গেল। পোষাকটা অক্রুর চৌধুরীর মত; কালো গলাবন্ধ কোটের তলায় কোঁচা কোমরে গোঁজা ধুতি।

নেতাজী ক্লাবের শশধর বোসের সঙ্গে নবীনের আলাপ ছিল; তাদের একটা ফাংশনে শশধরকে ধরে তবে ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌মের একটা আইটেম ঢুকিয়ে নিল নবীন। আর প্রথম অ্যাপিয়ারেন্সেই যাকে বলে হিট। পুতুলের একটি নামও দেওয়া হয়েছে অবশ্য—ভূতনাথ, সংক্ষেপে ভূতো। ভূতোর সঙ্গে নবীনের সংলাপ লোকের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ভূতো হল ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার, আর নবীন মোহনবাগানের। বাগ্‌বিতণ্ডা এতই জমেছিল যে ভূতো যে ক্রমাগত ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান বলে চলেছে সেটা কেউ লক্ষ্যই করে নি।

এর পর থেকেই বিভিন্ন ফাংশনে, টেলিভিশনে ডাক পড়তে লাগল নবীনের। নবীনও বুঝল যে ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আর কোনো চিন্তা নেই, রুজি-রোজগারের পথ সে পেয়ে গেছে।

অবশেষে একদিন অক্রুর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হল নবীনের।

মাস তিনেক হল নবীন উত্তরপাড়া ছেড়ে কলকাতায় মির্জাপুর স্ট্রীটে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রয়েছে। বাড়িওয়ালা সুরেশ মুৎসুদ্দি বেশ লোক, নবীনের খ্যাতির কথা জেনে তাঁকে সমীহ করে চলেন। সম্প্রতি মহাজাতি সদনে একটা বড় ফাংশনে নবীন এবং ভূতো প্রচুর বাহবা পেয়েছে। ফাংশনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে আজকাল নবীনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। নবীনের নিজের ব্যক্তিত্বেও ছাপ পড়েছে, তাঁর চেহারা ও কথা বার্তায় একটা নতুন জৌলুস লক্ষ্য করা যায়।

হয়ত মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানেই অক্রুরবাবু উপস্থিত ছিলেন, এবং অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে নবীনের ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন। সেদিনের আইটেমে নবীন আর ভূতোর মধ্যে কথাবার্তা ছিল পাতাল রেল নিয়ে। যেমন,—

'কলকাতায় পাতাল রেল হচ্ছে জান ত ভূতো ?'

'কই, না ত!'

'সে, কি, তুমি কলকাতার মানুষ হয়ে পাতাল রেলের কথা জান না ?'

ভূতো মাথা নেড়ে বলল, 'উহুঁ, তবে হাসপাতাল রেলের কথা শুনেছি বটে।'

'হাসপাতাল রেল ?'

'তাই ত শুনি। একটা বিরাট অপারেশন, সারা শহরের গায়ে ছুরি চলছে, শহরের এখন-তখন অবস্থা। হাসপাতাল ছাড়া আর কি ?'

আজ নবীন তাঁর ঘরে বসে নতুন সংলাপ লিখছিল লোড শেডিংকে কেন্দ্র করে। লোড শেডিং, জিনিসের দাম বাড়া, বাসট্রামে ভীড় ইত্যাদি যে সব জিনিস নিয়ে শহরের লোক সবচেয়ে বেশি মেতে ওঠে, ভূতোর সঙ্গে সেইসব নিয়ে আলোচনা করলে দর্শক সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় এটা নবীন বুঝে নিয়েছে। আজকের নকশাটাও বেশ জমে উঠেছিল, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। নবীন দরজা খুলে বেশ খানিকটা হকচকিয়ে দেখল অক্রুরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

'আসতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই।'

নবীন ভদ্রলোককে ঘরে এনে নিজের চেয়ারটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল। অক্রুরবাবু তৎক্ষণাৎ বসলেন না। তাঁর দৃষ্টি ভূতোর দিকে। সে অনড় ভাবে বসে আছেন নবীনের টেবিলের এক কোণে।

অক্রুরবাবু এগিয়ে গিয়ে ভূতোকে তুলে নিয়ে তার মুখটা বেশ মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। নবীনের কিছু করার নেই। সে যে খানিকটা অসোয়াস্তি বোধ করছে না, সেটা বললে ভুল হবে, তবে অক্রুরবাবুর হাতে অপমান হবার কথাটা সে মোটেই ভোলে নি।

'তোমার হাতের পুতুল বানিয়ে দিলে আমাকে ?'

একথা বলে অক্রুরবাবু চেয়ারটায় বসলেন।

'হঠাৎ এ মতি হল কেন ?

নবীন বলল, 'কেন বানিয়েছি সেটা বোধহয় বুঝতে পারছেন। আমি অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলাম আপনার কাছে। সবটুকু ভেঙে দিয়েছিলেন আপনি। তবে এটুকু বলতে পারি—আপনার এই প্রতিমূর্তিই কিন্তু আজ আমাকে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। আমি খেয়ে-পরে আছি এর জন্যেই।'

অক্রুরবাবু এখনো ভূতোর দিক থেকে চোখ সরান নি। বললেন, 'তুমি জান কি না জানি না—বারাসাতে সেদিন আমার একটা শো ছিল। স্টেজে নেমেই যদি চতুর্দিক থেকে 'ভূতো' 'ভূতো' বলে টিটকিরি শুনতে হয়, সেটা কি খুব সুখকর হয় বলে তুমি মনে কর ? তোমার ভাত-কাপড় আমি জোগাতে পারি, কিন্তু তোমার জন্য যে আমার ভাত-কাপড়ের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার কী হবে ? তুমি কি ভেবেছ আমি এটা এত সহজে মেনে নেব ?'

সময়টা সন্ধ্যা। লোড শেডিং। টিমটিম করে দুটি মোমবাতি জ্বলছে নবীনের ঘরে। সেই আলোয় নবীন দেখল অক্রুরবাবুর চোখ দুটো স্টেজে যেমন জ্বলজ্বল করে সেই ভাবে জ্বলছে। ছোট্ট মানুষটার বিশাল একটা দোলায়মান ছায়া পড়েছে

ঘরের দেয়ালে। টেবিলের উপর ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে বসে আছে ভূতনাথ—অনড়, নির্বাক্।

'তুমি জান কি না জানি না', বললেন অক্রুরবাবু, 'ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌মেই কিন্তু আমার যাদুর দৌড় শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আমি আঠারো বছর বয়স থেকে আটত্রিশ বছর পর্যন্ত আমাদের দেশের একজন অজ্ঞাতনামা অথচ অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন যাদুকরের শিষ্যত্ব করেছি। কলকাতা শহরে নয়; হিমালয়ের পাদদেশে এক অত্যন্ত দুর্গম স্থানে।

'সে যাদু আপনি মঞ্চে দেখিয়েছেন কখনো?'

'না। তা দেখাইনি কারণ সে সব স্টেজে দেখানোর জিনিস নয়। রোজগারের পন্থা হিসেবে আমি সে যাদু ব্যবহার করব না এ প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম আমার গুরুকে। সে কথা আমি রেখেছি।'

'আপনি আমাকে কী বলতে চাইছেন সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'আমি শুধু সতর্ক করে দিতে এসেছি। তোমার মধ্যে সাধনার পরিচয় পেয়ে আমি খুশিই হয়েছি। ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম যাদুটা যেমন তোমাকে আমি শেখাই নি, তেমনি আমাকেও কেউ শেখায় নি। পেশাদারী যাদুকররা তাদের আসল বিদ্যা কাউকে শেখায় না, কোনোদিনই শেখায়নি। ম্যাজিকের রাস্তা যাদুকরদের নিজেদেরই করে নিতে হয়—যেমন তুমি করে নিয়েছ। কিন্তু তোমার পুতুলের আকৃতি নির্বাচনে তুমি যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছ, সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারছি না। শুধু এইটুকুই বলতে এসেছি তোমাকে।'

অক্রুরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার চুল আর গোঁফ এতদিন কাঁচা ছিল, এই সবে পাকতে শুরু করেছে। তুমি দেখছি সেটা অনুমান করে আগে থেকেই কিছু পাকা চুল লাগিয়ে রেখেছ।...যাক, আমি তাহলে আসি।'

অক্রুরবাবু চলে গেলেন।

নবীন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভূতনাথের সামনে এসে দাঁড়াল। পাকা চুল। ঠিকই। দু-একটা পাকা চুল ভূতনাথের মাথায় এবং গোঁফে রয়েছে বটে। এটা নবীন এতদিন লক্ষ্য করে নি। সেটাও আশ্চর্য, কারণ ভূতোকে কোলে নিলে সে নবীনের খুবই কাছে এসে পড়ে, আর সব সময় তার দিকে তাকিয়েই কথাবার্তা চলে। সাদা চুলগুলো আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল।

যাই হোক, নবীন আর এই নিয়ে ভাববে না। দেখার ভুল সব মানুষেরই হয়। মুখ চোখের দিকেই বেশি দৃষ্টি দিয়েছে নবীন, চুলটা তেমন ভাল করে দেখেনি।

কিন্তু তাও মন থেকে খটকা গেল না।

ভূতোকে বইবার জন্য নবীন একটা চামড়ার কেস করে নিয়েছিল, সেই কেসে ভরে সে পরদিন হাজির চিৎপুরে আদিনাথ পালের কাছে। তার সামনে কেস থেকে ভূতোকে বের করে মেঝেতে রেখে নবীন বললো, 'দেখুন ত, এই পুতুলের মাথায় আর গোঁফে যে সাদা চুল রয়েছে, সে কি আপনারই দেওয়া ?'

আদিনাথ পাল ভারী অবাক হয়ে বলল, 'এ আবার কী বলছেন, স্যার। পাকা চুলের কথা ত আপনি বলেন নি। বললে কাঁচা পাকা মিশিয়ে দিতে ত কোনো অসুবিধা ছিল না। দু'রকম চুল ত আছে স্টকে; যে যেমনটি চায়।'

'ভুল করে দু-একটা সাদা চুল মিশে যেতে পারে না কি ?'

'ভুল ত মানুষের হয় বটেই। তবে তেমন হলে আপনি পুতুল নেবার সময়ই বলতেন না কি ? আমার কী মনে হয় জানেন, স্যার, অন্য কেউ এসে চুল লাগিয়ে দিয়েছে; আপনি টের পান নি।'

তাই হবে নিশ্চয়ই। নবীনের অজান্‌তেই ঘটনাটা ঘটেছে।

চেতলায় ফ্রেন্ডস ক্লাবের ফাংশনে একটা মজার ব্যাপার হল।

ভূতোর জনপ্রিয়তার এইটেই প্রমাণ যে ফাংশনের উদ্যোক্তারা তার আইটেমটি রেখেছিলেন সবার শেষে। লোড শেডিং নিয়ে রসাল কথোপকথন চলেছে ভূতো আর নবীনে। নবীন দেখল যে ভূতোর উত্তরে সে যে সব সময় তৈরি কথা ব্যবহার করছে তা নয়। তার কথায় অনেক সময় এমন সব ইংরেজি শব্দ ঢুকে পড়েছে যেগুলো নবীন কখনো ব্যবহার করে না—বড় জোর তার মানেটা জানে। নবীনের এ একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। অবিশ্যি তার জন্য শো-এর কোনো ক্ষতি হয়নি, কারণ কথাগুলো খুব লাগসই ভাবেই ব্যবহার হচ্ছিল, আর লোকেও তারিফ করছিল খুবই। ভাগ্যে তারা জানে না যে নবীনের বিদ্যে হাইয়ার সেকেন্ডারী পর্যন্ত।

কিন্তু এই ইংরেজী কথার অপ্রত্যাশিত ব্যবহারটা নবীনের খুব ভালো লাগে নি। তাঁর সব সময়ই মনে হচ্ছিল অন্য একজন কেউ যেন অলক্ষ্যে তার উপর কর্তৃত্ব করছে। শো-এর পর বাড়ি ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নবীন টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে ভূতোকে রাখল বাতির সামনে।

কপালের তিলটা কি ছিল আগে ? না। এখন রয়েছে। সেদিন তার ঘরে বসেই নবীন প্রথম লক্ষ্য করেছে অক্রুরবাবুর কপালের তিলটা। খুবই ছোট্ট তিল, প্রায় চোখে পড়ার মত নয়। ভূতোর কপালেও এখন দেখা যাচ্ছে তিলটা।

আর সেই সঙ্গে আরো কিছু।

আরো খান দশেক পাকা চুল।

আর চোখের তলায় কালি।

এই কালি আগে ছিল না।

নবীন চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে দিল। তার ভারী অস্থির লাগছে। ম্যাজিকের পূজারী সে, কিন্তু এ ম্যাজিক বড়ই অস্বস্তিকর। যে ম্যাজিকে সে বিশ্বাস করে তার সবটাই মানুষের কারসাজি। যেটা অলৌকিক, সেটা নবীনের কাছে ম্যাজিক নয়। সেটা অশুভ। ভূতোর এই পরিবর্তনের মধ্যে সেই অশুভের ইঙ্গিত রয়েছে।

অথচ একদৃষ্টে চেয়ে থেকেও ভূতোকে পুতুল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। চোখে ঢুলুঢুলু চাহনি, ঠোঁটের কোণে অল্প হাসি, আর খেলার সময় তার নিজের হাতের কারসাজি ছাড়া যে কোনো পুতুলের মতই অসাড়, নির্জীব।

অথচ তার চেহারায় অল্প অল্প পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

আর নবীন কেন জানি বিশ্বাস করে এই পরিবর্তনগুলো অক্রুর চৌধুরীর মধ্যেও ঘটছে। তারও চুলে পাক ধরেছে, তারও চোখের তলায় কালি পড়ছে।

ভূতোর সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলে টেকনিকটা ঝালিয়ে নেওয়ার অভ্যাস নবীনের প্রথম থেকেই। যেমন—

'আজ দিনটা বেজায় গুমোট করছে, না রে ভূতো?'

'হুঁ, গেজায় গুঙোট।'

'তবে তোর সুবিধে আছে, ঘাম হয় না।'

'কুতুলের আগার ঘাঙ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!'

আজও প্রায় আপনা থেকেই নবীনের মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়ল।

'এসব কী ঘটছে বল তো ভূতো?'

উত্তরটা এল নবীনকে চমকে দিয়ে—

'কর্ঙখল! কর্ঙখল!

কর্মফল।

নবীনের ঠোঁট দিয়েই উচ্চারণটা হয়েছে, যেমন হয় স্টেজে, কিন্তু উত্তরটা তাঁর জানা ছিল না। এটা তাকে দিয়ে বলানো হয়েছে। কে বলিয়েছে সে সম্বন্ধে নবীনের একটা ধারণা আছে।

সে রাত্রে চাকর শিবুর অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও নবীন কিছু খেল না। এমনিতে রাত্রে ওর ঘুম ভালোই হয়, কিন্তু সাবধানের মার নেই, তাই আজ একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নিল। একটা নাগাদ বুঝতে পারল বড়িতে কাজ দেবে না। হাত থেকে পত্রিকাটা নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিতেই চোখের পাতা বুজে এল।

ঘুমটা ভেঙে গেল মাঝরাত্তিতে।

ঘরে কে কাশল?

সে নিজে কি ? কিন্তু তাঁর ত কাশি হয় নি। অথচ কিছুক্ষণ থেকেই যেন খুক্ খুক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।

ল্যাম্পটা জ্বালালো নবীন।

ভূতনাথ বসে আছে সেই জায়গাতেই, অনড়। তবে তার দেহটা যেন একটু সামনের দিকে ঝোঁকা, আর ডান হাতটা ভাঁজ হয়ে বুকের কাছে চলে এসেছে।

নবীন ঘড়িতে দেখল সাড়ে তিনটে। বাইরে পাহারাওয়ালার লাঠির ঠক্ ঠক্। দূরে কুকুর ডাকছে। একটা প্যাঁচা কর্কশ স্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল তার বাড়ির উপর দিয়ে। পাশের বাড়িতে কারুর কাশি হয়েছে নিশ্চয়। আর জানালা দিয়ে হাওয়া এসে ভূতোর শরীরটাকে সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরের জনবহুল মির্জাপুর স্ট্রীটে তার এহেন অহেতুক ভয় অত্যন্ত বিসদৃশ।

নবীন ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল, এবং আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ফিন্‌লে রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাৎসরিক ফাংশনে নবীন প্রথম ব্যর্থতার আস্বাদ পেল।

প্রকাণ্ড হলে প্রকাণ্ড অনুষ্ঠান। যথারীতি তার আইটেম হল শেষ আইটেম। আধুনিক গান, আবৃতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, কত্থক নাচ এবং তারপর নবীন মুনসীর ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে নিজের গলার যত্ন নেবার জন্যে যা করার সবই করেছে নবীন। গলাটাকে পরিষ্কার রাখা খুবই দরকার, কারণ সূক্ষ্মতম কন্ট্রোল না থাকলে ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম হয় না। স্টেজে ঢোকার আগে পর্যন্ত সে দেখেছে গলা দিয়ে পরিষ্কার স্বর বেরোচ্ছে। কিন্তু সর্বনাশ হল ভূতোর উত্তরে।

এ উত্তর দর্শকের কানে পৌঁছবে না, কারণ সর্দি-কাশিতে বসে গেছে সে গলা। আর এটা শুধু ভূতোর গলা। নিজের গলা সাফ এবং স্পষ্ট।

'লাউডার প্লীজ' বলে আওয়াজ দিল পিছনের দর্শক। সামনের দর্শক অপেক্ষাকৃত ভদ্র, তাই তাঁরা আওয়াজ দিল না, কিন্তু নবীন জানে যে তাঁরা ভূতোর একটা কথাও বুঝতে পারছেন না।

আরো পাঁচ মিনিট চেষ্টা করে নবীনকে মাপ চেয়ে স্টেজ থেকে বিদায় নিতে হল। এমন লজ্জাকর অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে এই প্রথম।

সেদিনের পারিশ্রমিকটা নবীন নিজেই প্রত্যাহার করল। এ অবস্থায় টাকা নেওয়া যায় না। এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি নিশ্চয়ই চিরকাল চলতে পারে না। অল্পদিনের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এ বিশ্বাস নবীনের আছে।

ভাদ্র মাস। গরম প্রচণ্ড। তার উপরে এই অভিজ্ঞতা। নবীন যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত সাড়ে এগারোটা। সে রীতিমত অসুস্থ বোধ করছে। এই প্রথম ভূতোর উপর একটু রাগ অনুভব করছে সে যদিও সে জানে ভূতো তারই হাতের পুতুল। ভূতোর দোষ মানে তাঁরই দোষ।

টেবিলের উপর ভূতোকে রেখে নবীন দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিল। হাওয়া বিশেষ নেই, তবে যেটুকু আসে, কারণ আজ শনিবার, রাত বারোটার আগে পাখা চলবে না।

নবীন মোমবাতি জ্বেলে টেবিলে রাখতেই একটা জিনিস দেখে তাঁর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ভূতোর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

শুধু তাই না। ভূতোর গালে চকচকে ভাবটা আর নেই। ভূতো শুকিয়ে গেছে। আর ভূতোর চোখ লাল।

এই অবস্থাতেও নবীন তাঁর পুতুলের দিকে আরো দু'পা এগিয়ে না গিয়ে পারল না। কত বিস্ময়, কত বিভীষিকা তাঁর কপালে আছে সেটা দেখবার জন্যে যেন তাঁর জেদ চেপে গেছে।

দু'পা-র বেশি এগোন সম্ভব হল না নবীনের। একটি জিনিস চোখে পড়ায় তাঁর চলা আপনিই বন্ধ হয়ে গেছে।

ভূতোর গলাবন্ধ কোটের বুকের কাছটায় একটা মৃদু উত্থান-পতন।

ভূতো শ্বাস নিচ্ছে।

শ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে কি ?

হ্যাঁ, যাচ্ছে বৈ কি। ট্র্যাফিক-বিহীন নিস্তব্ধ রাত্রে নবীনের ঘরে এখন একটির বদলে দু'টি মানুষের শ্বাসের শব্দ।

হয়ত চরম আতঙ্ক আর প্রচণ্ড বিস্ময় থেকেই নবীনের গলা দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে পড়ল,—

'ভূতো!'

আর সেই সঙ্গে এক অশরীরী চিৎকার নবীনকে ছিটকে পিছিয়ে দিল তার তক্তপোশের দিকে—

'ভূতো নয়! আমি অক্রুর চৌধুরী!'

নবীন জানে যে সে নিজে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেনি। কণ্ঠস্বর ওই পুতুলের। অক্রুর চৌধুরী কোনো এক আশ্চর্য যাদুবলে ওই পুতুলকে সরব করে তুলেছেন। নবীন চেয়েছিল অক্রুর চৌধুরীকে তার হাতের পুতুল বানাতে। এ জিনিস নবীন চায় নি। এ জ্যান্ত পুতুলের সঙ্গে এক ঘরে থাকা নবীনের পক্ষে অসম্ভব। সে এখনই—

কী যেন একটা হল।

একটা শ্বাসের শব্দ কমে গেল কি ?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

ভূতো আর নিশ্বাস নিচ্ছে না। তার কপালে আর ঘাম নেই। তার চোখের লাল ভাবটা আর নেই, চোখের তলায় আর কালি নেই।

নবীন খাট থেকে উঠে গিয়ে ভূতোকে হাতে নিল।

একটা তফাত হয়ে গেছে কেমন করে জানি এই অল্প সময়ের মধ্যেই।

ভূতোর মাথা আর ঘোরানো যাচ্ছে না, ঠোঁট আর নাড়ানো যাচ্ছে না। যন্ত্রপাতিতে জাম ধরে গেছে। আর একটু চাপ দিলে ঘুরবে কি মাথা ?

চাপ বাড়াতে গিয়ে ভূতোর মাথাটা আলগা হয়ে টেবিলে খুলে পড়ল।

* * * * *

পরদিন সকালে সিঁড়িতে নবীনের দেখা হল বাড়িওয়ালা সুরেশ মুৎসুদ্দির সঙ্গে। ভদ্রলোক অভিযোগের সুরে বললেন, 'কই মশাই, আপনি ত আপনার পুতুলের খেলা দেখালেন না একদিনও আমাকে। সেই যে ভেন্টিকুলোজিয়াম না কী!'

'পুতুল নয়', বলল নবীন, 'এবার অন্য ম্যাজিক ধরব। আপনার যখন শখ আছে তখন নিশ্চয়ই দেখাব। কিন্তু হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন ?'

'আপনার এক জাতভাই যে মারা গেছে দেখলুম কাগজে। অক্রুর চৌধুরী।'

'তাই বুঝি ?'—নবীন এখনো কাগজ দেখে নি।—'কিসে গেলেন ?'

'হৃদ্‌রোগে', বললেন সুরেশবাবু, 'আজকাল ত শতকরা সত্তর জনই যায় ওই রোগেই।'

নবীন জানে যে খোঁজ নিলে নির্ঘাত জানা যাবে মৃত্যুর টাইম হল গত কাল রাত বারোটা বেজে দশ মিনিট।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

সাধনবাবুর সন্দেহ

সাধনবাবু একদিন সন্ধ্যাবেলা কাজ থেকে ফিরে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখলেন মেঝেতে একটা বিঘতখানেক লম্বা সরু গাছের ডাল পড়ে আছে। সাধনবাবু পিট পিটে স্বাভাবের মানুষ। ঘরে যা সামান্য আসবাব আছে—খাট, আলমারি, আলনা, জলের কুঁজো রাখার টুল—তার কোনটাতে এক কণা ধুলো তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, ফুলকারি করা টেবিল ক্লথ—সবই তক্‌তকে হওয়া চাই। এতে ধোপার খরচটা বাড়ে, কিন্তু সেটা সাধনবাবু গা করেন না। আজ ঘরে ঢুকেই গাছের ডাল দেখে তাঁর নাক কুঁচকে গেল।

'পচা!'

চাকর পচা মনিবের ডাকে এসে হাজির।

'বাবু ডাকছিলেন ?'

'কেন, তোর কি সন্দেহ হচ্ছে ?'

'না বাবু, তা হবে কেন ?'

'মেঝেতে গাছের ডাল পড়ে কেন ?'

'তা তো জানি না বাবু। কাক-চড়ুইয়ে এনে ফেলেছে বোধহয়।'

'কেন, ফেলবে কেন ? কাক-চড়ুই ত ডাল আনবে বাসা বাঁধার জন্যে। সে ডাল মাটিতে ফেলবে কেন ? ঝাড়ু দেবার সময় লক্ষ্য করিসনি এটা ? নাকি ঝাড়ুই দিসনি ?

'ঝাড়ু আমি রোজ দিই বাবু। যখন দিই তখন এ-ডাল ছিল না।'

'ঠিক বলছিস ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু।'

'তাজ্জব ব্যাপার তো!'

পরদিন সকালে আপিস যাবার আগে একটা চড়ুইকে তাঁর জানালায় বসতে দেখে সাধনবাবুর সন্দেহ হল ইনিই বাসা বাঁধার ফিকির খুঁজছেন। কিন্তু কোথায় ? ঘরের মধ্যে জায়গা কোথায় ? ঘুলঘুলিতে কি ? তাই হবে।

তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়ির সাতখানা ঘরের মধ্যে তাঁর ঘরের দিকেই চড়ুই-এর দৃষ্টি কেন এই নিয়েও সাধনবাবুর মনে খট্‌কা লাগল। এমন কিছু আছে কি তাঁর ঘরে যা পাখিদের অ্যাট্র্যাক্ট করতে পারে ?

অনেক ভেবে সাধনবাবুর সন্দেহ হল—ওই যে নতুন কবরেজী তেলটা তিনি ব্যবহার করছেন—যেটা দোতলার শখের কবিরাজ নীলমণিবাবুর মতে খুস্‌কির মহৌষধ—সেটার উগ্র গন্ধই হয়ত পাখিদের টেনে আনছে। সেই সঙ্গে এমনও সন্দেহ হল যে এটা হয়ত নীলমণিবাবুর ফিচলেমি, সাধনবাবুর ঘরটাকে একটা পক্ষিনিবাসে পরিণত করার মতলবে তিনি এই তেলের গুণগান করছেন।...

আসলে সতেরর দুই মির্জাপুর স্ট্রীটের এই ফ্ল্যাটবাড়ির সকলেই সাধনবাবুর সন্দেহ বাতিকের কথা জানেন, এবং আড়ালে এই নিয়ে হাসিঠাট্টা করেন। 'আজ কী কী সন্দেহের উদয় হল আপনার মনে ?'—এ জাতীয় প্রশ্ন দিনের শেষে সাধনবাবুকে প্রায়ই শুনতে হয়।

শুধু প্রশ্ন নয়, অন্যভাবেও তাঁকে নিয়ে লেগ-পুলিং চলে। একতলার নবেন্দু চাটুজ্যের ঘরে সন্ধ্যায় তিন-তাসের আড্ডা বসে। সাধনবাবু তাতে নিয়মিত যোগদান করেন। সেদিন যেতে নবেন্দুবাবু তাঁকে একটা দলা পাকানো কাগজ দেখিয়ে বললেন, 'দেখুন ত মশাই, এ থেকে কিছু সন্দেহ হয় কি না। এটা জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে।'

আসলে কাগজটা নরেন্দু বাবুরই মেয়ে মিনির অঙ্কের খাতার একটা ছেঁড়া পাতা। সাধনবাবু কাগজটাকে খুলে সেটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললেন, 'এটা তো সংখ্যা দিয়ে লেখা কোনো সাঙ্কেতিক ভাষা বলে মনে হচ্ছে।'

নবেন্দুবাবু কিছু না বলে চুপটি করে চেয়ে রইলেন সাধনবাবুর দিকে।

'কিন্তু এটার তো মানে করা দরকার', বললেন সাধনবাবু। 'ধরুন এটা যদি কোনো হুমকি হয়, তাহলে...'

সঙ্কেতের পাঠোদ্ধার হয়নি অবশ্য। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়; কথা হল, এই কাগজের দলা থেকে সাধনবাবুর সন্দেহ কোন্ কোন্ দিকে যেতে পারে সেইটে দেখা। সাধনবাবু বিশ্বাস করেন যে গোটা কলকাতা শহরটাই হল ঠক জুয়াচোর ফন্দিবাজ মিথ্যেবাদীর ডিপো। কারুর উপর ভরসা নেই, কাউকে বিশ্বাস করা চলে না। এই অবস্থায় একমাত্র সন্দেহই মানুষকে সামলে চলতে সাহায্য করতে পারে।

এই সাধনবাবুই একদিন আপিস থেকে এসে ঘরে ঢুকে তাঁর টেবিলের উপর একটা বেশ বড় চার-চৌকা কাগজের মোড়ক দেখতে পেলেন। তাঁর প্রথমেই সন্দেহ হল সেটা ভুল করে তাঁর ঘরে চলে এসেছে। এহেন মোড়ক তাঁকে কে পাঠাবে ? তিনি ত এমন কোনো পার্সেল প্রত্যাশা করেন নি!

কাছে গিয়ে যখন দেখলেন যে মোড়কের উপর তাঁর নাম নেই, তখন সন্দেহটা আরো পাকা হল।

'এটা কে এনে রাখল রে ?' চাকর পচাকে ডেকে জিগ্যেস করলেন সাধনবাবু।

'আজ্ঞে একজন লোক ধনঞ্জয়ের হাতে দিয়ে গেছে দুপুরে এসে। আপনার নাম করে বলেছে আপনারই জিনিস।'

ধনঞ্জয় একতলার ষোড়শীবাবুর চাকর।

'কী আছে এতে, কে পাঠিয়েছে, সে সব কিছু বলেছে ?'

'আজ্ঞে তা ত বলেনি।'

'বোঝো!'

সাধনবাবু কাঁধের চাদরটা আলনায় রেখে খাটে বসলেন। রীতিমতো বড় মোড়ক। প্রায় একটা পাঁচ নম্বর ফুটবল ঢুকে যায় ভিতরে। অথচ কে পাঠিয়েছে জানার কোনো উপায় নেই।

সাধনবাবু খাট থেকে উঠে এগিয়ে গিয়ে মোড়কটা হাতে তুললেন। বেশ ভারী। কমপক্ষে পাঁচ কিলো।

সাধনবাবু মনে করতে চেষ্টা করলেন শেষ কবে তিনি এই জাতীয় মোড়ক পেয়েছেন। হ্যাঁ, বছর তিনেক আগে খড়দায় তাঁর এক মাসীমা থাকতেন, তিনি পাঠিয়েছিলেন আমসত্ত্ব। তার মাস ছয়েকের মধ্যেই সেই মাসীমার মৃত্যু হয়। আজ সাধনবাবুর নিকট আত্মীয় বলতে আর কেউই অবশিষ্ট নেই। পার্সেল কেন, চিঠিও তিনি মাসে দু-একটার বেশি পান না। এই মোড়কের সঙ্গে একটা চিঠি থাকা অস্বাভাবিক হত না, কিন্তু তাও নেই।

কিংবা হয়তো ছিল। সাধনবাবুর সন্দেহ হল ধনঞ্জয়ের অসাবধানতা হেতু সেটি খোয়া গেছে।

একবার ধনঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

তাকে ডেকে পাঠানো অনুচিত হবে মনে করে সাধনবাবু নিজেই নিচে গেলেন। ধনঞ্জয় উঠোনে বসে হামানদিস্তায় কী যেন ছেঁচছিল, সাধনবাবুর ডাকে উঠে এল।

'ইয়ে আজ তোমার হাতে কেউ একটা পার্সেল দিয়ে গেস্‌ল আমার নাম করে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সঙ্গে চিঠি ছিল ?'

'কই না ত।'

'কোথেকে আসছে সেটা বলেছিল ?'

'মদন না কী জানি একটা নাম বললেন।'

'মদন ?'

'তাই ত বললেন।'

মদন বলে কাউকে চেনেন বলে মনে করতে পারলেন না সাধনবাবু। কী বলতে কী বলছে লোকটা কে জানে। ধনঞ্জয় যে একটি গবেট সে সন্দেহ অনেকদিনই করেছেন সাধনবাবু।

'চিঠিপত্তর কাগজ-টাগজ কিছু ছিল না সঙ্গে ?'

'একটা কাগজ ছিল, তাতে বাবু সই করে দিলেন।'

'কে, ষোড়শীবাবু ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কিন্তু ষোড়শীবাবুকে জিগ্যেস করেও কোনো ফল হল না। একটা চিরকুটে তিনি সাধনবাবুর হয়ে সই করে দিয়েছেন বটে, কিন্তু কোথা থেকে এসেছিল খেয়াল করেননি।

সাধনবাবু আবার নিজের ঘরে ফিরে এলেন। কার্তিক মাসের সন্ধ্যা, শীতটা এর মধ্যে বেশ অনুভব করা যাচ্ছে। সামনে কালীপূজো, তার তোড়জোর যে চলছে সেটা মাঝে মাঝে বোমা-পটকার—

'দুম্!'

পাড়াতেই একটা বোমা ফেটেছে। আর সেই মুহূর্তেই খাটে বসা সাধনবাবুর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল।

টাইম বোমা!

ওই মোড়কের মধ্যে টাইম-বোমা নেই ত, যেটা নির্দিষ্ট সময়ে ফেটে তাঁর ইহজগতের লীলা সাঙ্গ করে দেবে ?

এই টাইম-বোমার কথা ইদানীং খুব শোনা যাচ্ছে। সারা বিশ্বের সন্ত্রাসবাদীদের এটা একটা প্রধান অস্ত্র।

কিন্তু তাঁকে বোমা পাঠাবে কে, কেন ?

প্রশ্নটা মনে আসতেই সাধনবাবু উপলব্ধি করলেন যে ব্যবসায়ী হওয়ার ফলে তাঁর শত্রুর অভাব নেই। কনট্র্যাক্ট পাবার জন্য তোষামোদ ধরাধরি তাঁকেও করতে হয়, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি ব্যবসায়ীদেরও করতে হয়। যদি তিনি পেয়ে যান সে কনট্র্যাক্ট, তাহলে অন্যেরা হয়ে যায় তাঁর শত্রু। এ তো হামেশাই হচ্ছে।

'পচা!'

ডাকটা দিয়েই বুঝতে পারলেন যে তাঁর গলা দিয়ে পরিষ্কার আওয়াজ বেরোচ্ছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

কিন্তু তাও পচা হাজির।

'বাবু, ডাকলেন ?'

'ইয়ে—'

কিন্তু কাজটা কি ভালো হবে ? সাধনবাবু ভেবেছিলেন পচাকে বলবেন পার্সেলে কান লাগিয়ে দেখতে টিক্ টিক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে কিনা। টাইম বোমার সঙ্গে কলকজা লাগানো থাকে, সেটা টিক্ টিক্ শব্দে চলে। সেই টিক্‌টিক্-ই একটা পূর্বনির্ধারিত বিশেষ মুহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে পরিণত হয়।

পচা যখন কান লাগাবে, তখনই যদি বোমাটা...

সাধনবাবু আর ভাবতে পারলেন না। এদিকে পচা বাবুর আদেশের জন্য দাঁড়িয়ে আছে; সাধনবাবুকে বলতেই হল যে তিনি ভুল করে ডেকেছিলেন, তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই।

এই রাতটা সাধনবাবু ভুলবেন না কোনোদিন। অসুখ বিসুখে রাত্রে ঘুম হয় না এটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু চরম আতঙ্কে এই শীতকালে ঘর্মাক্ত অবস্থায় সারারাত ঠায় বিছানায় বসে কাটানোর অভিজ্ঞতা তাঁর এই প্রথম।

কিন্তু সকাল পর্যন্ত বোমা ফাটল না, তখন কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে সাধনবাবু স্থির করলেন যে আজই সন্ধ্যায় মোড়কটা খুলে দেখতে হবে তার মধ্যে কী আছে। তাঁর নিজেরও মনে হয়েছে যে তাঁর সন্দেহটার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলা এমন একটা ঘটনা ঘটল যে সাধনবাবুর আর মোড়ক খোলা হল না।

অনেক লোক আছে যারা খবরের কাগজের আদ্যোপান্ত না পড়ে পারে না। সাধনবাবু এই দলে পড়েন না। প্রথম এবং মাঝের পাতার খবরগুলোর শিরোনামায় চোখ বুলিয়েই তাঁর কাগজ পড়া হয়ে যায়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাই উত্তর কলকাতায় খুনের খবরটা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। আপিস থেকে ফিরে একতলায় নবেন্দু চাটুজ্যের ঘরে একটা বড় রকম দাপাদাপি চলছে শুনে কারণ জিগ্যেস করে তিনি ঘটনাটা জানতে পারলেন।

পটুয়াটোলা লেনে খুন, হত ব্যক্তির নাম শিবদাস মৌলিক। কথাটা শুনেই সাধনবাবুর একটা সুপ্ত স্মৃতি খোঁচা খেয়ে জেগে উঠল।

এক মৌলিককে তিনি চিনতেন খুব ভালো করে। তার প্রথম নাম শিবদাস কি ? হতেও পারে। সাধনবাবু তখন ওই পটুয়াটোলা লেনেই। মৌলিক ছিল তাঁর প্রতিবেশী। তিন-তাসের আড্ডা বসত মৌলিকের ঘরে রোজ সন্ধ্যায়। মৌলিককে কেন জানি মৌলিক বলেই ডাকত সবাই। আরো দুজন ছিলেন আড্ডায়। সুখেন দত্ত আর মধুসূদন মাইতি। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটির মতো

সাংঘাতিক চরিত্র সাধনবাবু আর দেখেননি। তাসের খেলায় সে যে জুয়াচুরির রাজা সে সন্দেহ সাধনবাবুর গোড়া থেকেই হয়েছিল। শেষে বাধ্য হয়ে একদিন সন্দেহটা প্রকাশ করতে হল। এতে মধু মাইতির প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ভয়াবহ। তার পকেটে সব সময়ই যে একটি চাকু অবস্থান করে সেটা সেদিনই জানতে পেরেছিলেন সাধনবাবু। তিনি প্রাণে বেঁচেছিলেন মৌলিকের আর সুখেন দত্তর জন্য। ব্যবসায় উন্নতির পর সাধনবাবু পটুয়াটোলা লেনের খোলার ঘর ছেড়ে চলে আসেন মির্জাপুর স্ট্রীটের এই ফ্ল্যাটে। আর সেই থেকেই মৌলিক এন্ড কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাসের নেশাটা তিনি ছাড়াতে পারেননি, আর সেই সঙ্গে তাঁর সন্দেহ বাতিকটাও। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে পরিবর্তন হয়েছিল বিস্তর। পোশাক পরিপাট্য, বিড়ি ছেড়ে উইল্‌স সিগারেট ধরা, নীলামের দোকান থেকে মাঝে মাঝে শখের জিনিস কিনে এসে ঘর সাজানো—পেন্টিং, ফুলদানি বাহারের অ্যাশট্রে—এ সবই গত পাঁচ সাত বছরের ঘটনা।

এই খুনের ঘটনার শিবদাস মৌলিক যদি সেই মৌলিক হয়, তাহলে খুনী যে মধু মাইতি সে বিষয়ে সাধনবাবুর কোনো সন্দেহ নেই।

'খুনটা কী ভাবে হল ?' সাধনবাবু জিগ্যেস করলেন।

'নৃশংস', বললেন নবেন্দু চাটুজ্যে। 'লাশ সনাক্ত করার কোনো উপায় ছিল না। পকেটে একটা ডায়রি থেকে নাম জেনেছে।'

'কেন, কেন ? সনাক্ত করার উপায় ছিল না কেন ?'

'ধর আছে, মুড়ো নেই। সনাক্ত করবে কী করে ?'

'মুড়ো নেই মানে ?'

'মুণ্ডু ঘ্যাচাং!' জোড়া হাত মাথার উপর তুলে আবার ঝটিতি নামিয়ে এনে খাঁড়ার কোপের অভিনয় করে বুঝিয়ে দিলেন নবেন্দু চাটুজ্যে। 'খুনী যে কোথায় সরিয়ে রেখেছে মুণ্ডু সেটা এখনো জানা যায় নি।'

'খুনী কে সেটা জানা গেছে ?'

'তিন-তাসের বৈঠক বসত মৌলিকের ঘরে। তাদেরই একজন বলে সন্দেহ করছে পুলিশ।'

সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠতে উঠতে সাধনবাবু অনুভব করলেন যে তাঁর মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সেদিনের ঘটনা চোখের সামনে জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছেন তিনি—যেদিন তিনি মধু মাইতিকে জোচ্চুরির অপবাদ দিয়েছিলেন। চাকুর আক্রমণ থেকে তিনি রেহাই পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার বেশ কিছুক্ষণ পর অবধি মধু মাইতির দৃষ্টি তাঁর উপর অগ্নিবর্ষণ করেছিল সেটা মনে আছে। আর মনে আছে মধুর একটি উক্তি—আমায় চেন না তুমি, সাধন মজুমদার!—আজ পার পেলে, কিন্তু এর বদলা আমি নেব, সে আজই হোক আর দশ বছর পরেই হোক।'

রক্ত-জল-করা শাসানি। সাধনবাবু ভেবেছিলেন পটুয়াটোলা লেন থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন, কিন্তু—

কিন্তু ওই মোড়ক যদি মধু মাইতি দিয়ে গিয়ে থাকে ? মদন!—ধনঞ্জয় বলেছিল মদন। ধনঞ্জয় যে কানে খাটো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মধু আর মদন খুব বেশি পার্থক্য আছে কি ? মোটেই না। মধু অথবা মধুর লোকই রেখে গেছে ওই পার্সেল, আর সেটা যাতে সত্যিই তাঁর হাতে পৌঁছায় তাই চিরকুটে সই করিয়ে নিয়েছে।

ওই মোড়কের ভিতরে রয়েছে শিবদাস মৌলিকের মাথা!

এই সন্দেহ সিঁড়ির মাথা থেকে তাঁর ঘরের দরজার দূরত্বটুকু পেরোবার মধ্যেই দৃঢ় ভাবে সাধনবাবুর মনে গেঁথে গেল। দরজা থেকেই দেখা যায় টেবিলের উপর ফুলদানিটার পাশে রাখা মোড়কটাকে। মোড়কের ওজন এবং আয়তন দুইই এখন স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিচ্ছে তার ভিতর কী আছে।

বাবু দোরগোড়ায় এসে থেমে গেছেন দেখে পচা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল; সাধনবাবু প্রচণ্ড মনের জোর প্রয়োগ করে বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে চাকরকে চা আনতে বললেন।

'আর, ইয়ে, আজ কেউ এসেছিল ? আমার খোঁজ করতে ?'

'কই না ত।'

'হুঁ।'

সাধনবাবু অবশ্য সন্দেহ করেছিলেন পুলিশ হয়ত এরই মধ্যে হানা দিয়ে গেছে। তাঁর ঘরে খুন হওয়া ব্যক্তির মুণ্ডু পেলে তাঁর যে কী দশা হবে সেটা ভাবতে তাঁর আরেক দফা ঘাম ছুটে গেল।

গরম চা পেটে পড়তে সামান্য বল যেন ফিরে এল মনে। যাক্—অন্তত টাইম বোমা ত নয়।

কিন্তু এও ঠিক যে এই মুণ্ডুসমেত মোড়কটিকে সামনে রেখে যদি তাঁকে সারা রাত জেগে বসে থাকতে হয় তাহলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন।

ঘুমের বড়িতে ঘুম হল ঠিকই, কিন্তু দুঃস্বপ্ন থেকে রেহাই পাওয়া গেল না। একবার দেখলেন মুণ্ডুহীন মৌলিকের সঙ্গে বসে তিন-তাস খেলছেন তিনি, আরেকবার দেখলেন মৌলিকের ধড়বিহীন মুণ্ডু তাঁকে এসে বলছে, 'দাদা—ওই বাক্সে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। দয়া করে মুক্তি দিন আমায়।'

বড়ি খাওয়া সত্ত্বেও চিরকালের অভ্যাস মতো সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল সাধনবাবুর। হয়ত ব্রাহ্ম মুহূর্তের গুণেই সংকট মোচনের একটা উপায় সাধনবাবুর মনে উদিত হল।

মুণ্ডু যখন তাঁর কাছে পাচার হয়েছে, তখন সে-মুণ্ডু অন্যত্র চালান দিতে বাধাটা কোথায় ? তাঁর ঘর থেকে জিনিসটাকে বিদায় করতে পারলেই ত নিশ্চিন্তি।

ভোর থাকতেই অন্য কাজ সারার আগে বাজারের থলিতে মোড়কটা ভরে নিয়ে সাধনবাবু বেরিয়ে পড়লেন। প্যাকিংটা ভালোই হয়েছে বলতে হবে, কারণ ভিতরে রক্ত চুঁইয়ে থাকলেও তার বিন্দুমাত্র বাক্স ভেদ করে বাইরের কাগজে ছোপ ফেলেনি।

বাসে উঠে কালীঘাট পৌঁছাতে লাগল পঁচিশ মিনিট। তারপর পায়ে হেঁটে আদিগঙ্গায় পৌঁছে একটি অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে হাতের মোড়কটাকে সবেগে ছুঁড়ে ফেললেন নদীর মাঝখানে।

ঝপাৎ—ডুবুস্!

মোড়ক নিশ্চিহ্ন, সাধনবাবু নিশ্চিন্ত।

বাড়ি ফিরতে লাগল পঁয়ত্রিশ মিনিট। সদর দরজা দিয়ে যখন ঢুকছেন তিনি, তখন ষোড়শীবাবুর দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজছে।

আর সেই ঘড়ির শব্দ শুনেই সাধনবাবু মুহূর্তে চোখে অন্ধকার দেখলেন।

একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে তাঁর। কদিন থেকেই বার বার সন্দেহ হয়েছে তিনি যেন কি একটা ভুলে যাচ্ছেন। পঞ্চাশের পর এ জিনিসটা হয়। একথা নীলমণিবাবুকে বলতে তিনি নিয়মিত ব্রাহ্মীশাক খেতে বলেছিলেন।

আজ আধ ঘণ্টা আগেই বেরিয়ে পড়তে হল সাধনবাবুকে, কারণ যাবার পথে একটা কাজ সেরে যেতে হবে।

রাসেল স্ট্রীটে নীলামের দোকান মডার্ন এক্সচেঞ্জে ঢুকতেই একগাল হেসে এগিয়ে এলেন মালিক তুলসীবাবু।

'টেবিল ক্লকটা চলছে ত?'

'ওটা পাঠিয়েছিলেন আপনি?'

'বারে, আমি ত বলেইছিলাম পঠিয়ে দেব। সেটা পৌঁছায়নি। আপনার হাতে?'

'হ্যাঁ, মানে, ইয়ে—'

'আপনি পাঁচশো টাকা আগাম দিয়ে গেলেন, এত পছন্দ আপনার, আপনি পুরোন খদ্দের—কথা দিয়ে কথা রাখব না?'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই—'

'দেখবেন ফার্স্ট ক্লাস টাইম রাখবে ও ঘড়ি। নামকরা ফরাসী কোম্পানি তো! জিনিসটা জলের দরে পেয়ে গেছেন। ভেরি লাকি!'

তুলসীবাবু অন্য খদ্দেরের দিকে এগিয়ে যেতে সাধনবাবু দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। জলের দরের ঘড়ি জলেই গেল!

ভালো বদলা নিয়েছে মধু মাইতি তাতে সন্দেহ নেই। আর 'মডার্ন-কেই যে 'মদন' শুনেছে ধনঞ্জয় তাতেও কোনো সন্দেহ আছে কি?

ফা র্স্ট ক্লা স কা ম রা

আগের আমলের ফার্স্ট ক্লাস কামরা—বাথরুম সমেত ফোর বার্থ বা সিক্স বার্থ কম্পার্টমেন্ট—আজকাল উঠেই গেছে। এটা যে সময়ের গল্প, অর্থাৎ নাইনটিন সেভেনটি—তখনও মাঝে মাঝে এক আধটা এই ধরনের কামরা কী করে জানি ট্রেনের মধ্যে ঢুকে পড়ত। যাদের পুরোন ট্রেনে চড়ার অভিজ্ঞতা আছে, সেইসব ভাগ্যবান যাত্রী এমন একটি কামরা পেলে মনে করত হাতে চাঁদ পেয়েছে।

রঞ্জনবাবুও ঠিক তেমনই বোধ করলেন গাড়িতে উঠে, প্রথমে তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি। পয়সাওয়ালা বাপের ছেলে, তাই ফার্স্ট ক্লাসে চড়ার অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই। একক কামরা উঠে গিয়ে যখন ছয় কামরা বিশিষ্ট কড়িডর ট্রেন চালু হল, তখনই রঞ্জনবাবু বুঝলেন আরেকটা আরামের জিনিস দেশ থেকে উঠে গেল। গত কয়েক বছর থেকেই এ জিনিসটা লক্ষ্য করে আসছেন তিনি। বাপের ছিল ব্যুইক্ গাড়ি। পিছনের সীটে চিত হয়ে পা ছড়িয়ে বসে কত বেড়িয়েছেন সে গাড়িতে। তারপর এল ফিয়াট-অ্যামবাসাডরের যুগ। আরামের শেষ। বৃটিশ আমলে টেলিফোন তুললে মহিলা অপারেটর বলতেন *'নাম্বার প্লীজ'*, তারপর নম্বর চাইলেই লাইন পাওয়া যেত নিমিষের মধ্যে। আর এখন ডায়াল করতে করতে তর্জনীর ডগায় কড়া পড়ে যায়। সমস্ত কলকাতা শহর থেকেই যেন আরাম জিনিসটা ক্রমশঃ লোপ হয়ে যাচ্ছে। ট্রামে বাসে তাঁকে চড়তে হয়নি কোনোদিন, কিন্তু গাড়িতেই বা কী সুখ আছে ? ট্র্যাফিক জ্যামের ঠেলায় প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, গাড্ডায় গাড়ি পড়লে শরীরের হাড়গোড় আলগা হয়ে আসে।

রঞ্জনবাবুর মতে সবই দেশ স্বাধীন হবার ফল। সাহেবদের আমলে এমন মোটেই ছিল না। কলকাতাকে তখন সত্যিই একটা দেশের সভ্য শহর বলে মনে হত।

রঞ্জনবাবু বছর তিনেক আগে ছ'মাস কাটিয়ে এসেছেন লন্ডন শহরে। সাহেবরা বাঁচতে জানে, সুনিয়ন্ত্রিত জীবনের মূল্য জানে, সিভিক সেন্স কাকে বলে

জানে। ঘড়ির কাঁটার মতো লন্ডন টিউবের গতিবিধি দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। আর যেমন মাটির নিচে, তেমন মাটির ওপরে। এখানেও ত জনসংখ্যা নেহাত কম নয়, কিন্তু কই, বাসস্টপে ত ধাক্কাধাক্কি নেই, গলাবাজি নেই, কন্ডাক্টরের হুঙ্কার আর বাসের গায়ে চাপর মারা নেই। ওদের বাস ত একদিকে কাৎ হয়ে চলে না যে মনে হবে এই বুঝি উল্টে পড়ল।

বন্ধু মহলে রঞ্জনবাবুর উগ্র সাহেবপ্রীতি একটা প্রধান আলোচনার বিষয়। ঠাট্টারও বটে—আর সেই কারণেই হয়ত রঞ্জনবাবুর বন্ধুসংখ্যা ক্রমে কমে এসেছে। শহরে যেখানে সাহেব প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে, সেখানে অনবরত সাহেব আর সাহেবী আমলের গুণকীর্তন ক'টা লোক বরদাস্ত করতে পারে ? পুলকেশ সরকার ছেলেবেলার বন্ধু তাই তিনি এখনো টিকে আছেন, কিন্তু তিনিও সুযোগ পেলে বিদ্রুপ করতে ছাড়েন না। বলেন, 'তোমার এ-দেশে জন্মানো ভুল হয়েছে। তোমার জাতীয় সঙ্গীত হল গড *'সেভ দ্য কুইন', 'জনগণমন নয়।'* এই স্বাধীন নেটিভ দেশে তুমি আর বেশিদিন টিকতে পারবে না।'

রঞ্জনবাবু উত্তর দিতে ছাড়েন না।—'যাদের যেটা গুণ, সেটা অ্যাডামায়ার না করাটা অত্যন্ত সংকীর্ণ মনের পরিচায়ক। বাঙালিরা কলকাতা নিয়ে বড়াই করে—আরে বাবা, কলকাতা শহরের যেটা আসল বিউটি সেই ময়দানও ত সাহেবদেরই তৈরী। শহরের যা কিছু ভালো সে ত তারাই করে দিয়ে গেছে। শ্যামবাজার বাগবাজার ভবানীপুরকে ত তুমি সুন্দর বলতে পার না। তবে এটাও ঠিক যে ভালোগুলো আর ভালো থাকবে না বেশি দিন। আর তার জন্য দায়ী হবে এই নেটিভ বাঙালিরাই।'

মধ্যপ্রদেশের মায়াপুর শহরে দুই বন্ধুতে গিয়েছিল ছুটি কাটাতে। রঞ্জন কুণ্ডু একটা সাহেবী নামওয়ালা সদাগরী অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পুলকেশ সরকার একটি বড় বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। এবার পুজো ঈদ মিলিয়ে দুজনেরই দশ দিনের ছুটি পড়ে গেল। রায়পুর দুজনের কমন ফ্রেন্ড মোহিত বোসের সঙ্গে এক হপ্তা কাটিয়ে গাড়িতে করে বস্তারের অরণ্য অঞ্চল ঘুরে দেখে দুজনের একসঙ্গে কলকাতা ফেরার কথা ছিল। পুলকেশবাবু একবার বলেছিলেন ভিলাইতে তাঁর এক খুড়তোতো ভাইয়ের সঙ্গে দুদিন কাটিয়ে ফিরবেন, কিন্তু রঞ্জনবাবু রাজি হলেন না। বললেন, 'এসেছি একসঙ্গে, ফিরবও একসঙ্গে। একা ট্রাভেল করতে ভালো লাগে না ভাই।'

শেষ পর্যন্ত স্টেশনে গিয়েও পুলকেশবাবুকে থেকেই যেতে হল। ভিলাই রায়পুর থেকে মাত্র মাইল দশেক। পুলকেশবাবু আসতে পারবেন না জেনে

খুড়তোতো ভাই সশরীরে এসে হাজির হলেন দাদাকে বগলদাবা করে নিয়ে যাবার জন্যে। ভিলাইয়ের বাঙালিরা বিসর্জন নাটক মঞ্চস্থ করবে পুজোয়, পুলকেশবাবুর থিয়েটারের নেশা, ভাইয়ের অনুরোধ তিনি যদি গিয়ে নির্দেশনার ব্যাপারে একটু সাহায্য করেন। পুলকেশবাবু আর না করতে পারলেন না।

রঞ্জনবাবু হয়ত খুবই মুষড়ে পড়তেন, কিন্তু পুরোন ফার্স্ট ক্লাস কামরাটি দেখে তিনি এতই বিস্মিত ও পুলকিত হলেন যে বন্ধুর অভাবটা আর অত তীব্রভাবে অনুভব করলেন না। আশ্চর্য এই যে, সেকালের হলেও কামরার অবস্থা দিব্যি ছিমছাম। সব কটি আলোর বাল্‌বই রয়েছে, পাখাগুলো চলে, সীটের চামড়া কোথাও ছেঁড়া নেই, বাথরুমটিও পরিপাটি।

আরো বড় কথা হচ্ছে ফোর বার্থ কামরায় রঞ্জন কুণ্ডু আর পুলকেশ সরকার ছাড়া আপাতত আর কেউ যাত্রী নেই। পুলকেশবাবু খোঁজ নিয়ে জানালেন, 'তুমি রাউরকেলা পর্যন্ত একা যেতে পারবে। সেখানে একটি যাত্রী উঠবেন, তারপর কেউ নেই। দুটো আপার বার্থ সারা পথই খালি যাবে।'

রঞ্জনবাবু বললেন, 'তোমাকে এই পুরোন কামরার আরামের কথা অনেকবার বলেছি, আফসোস এই যে এতে ট্র্যাভেল করার সুযোগ পেয়েও নিতে পারলে না।'

বন্ধু হেসে বললেন, 'হয়ত দেখবে কেল্‌নারের লোক এসে তোমার ডিনারের অর্ডার নিয়ে গেল।'

'ওটা বলে আবার মন খারাপ করে দিও না', বললেন রঞ্জনবাবু। 'ট্রেনে খাবার কথা ভাবতে গেলে এখনও কান্না আসে। আমাদের ছেলেবেলায় কেল্‌নারের লাঞ্চ আর ডিনারের জন্য আমরা মুখিয়ে থাকতাম।'

রঞ্জনবাবু অবিশ্যি বাড়ি থেকে লুচি তরকারি নিয়ে এসেছেন টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে। রেলের থালিতে তার আদৌ রুচি নেই।

যথা সময়ে বোম্বে মেল ছেড়ে দিল। 'কলকাতায় দেখা হবে ভাই', বললেন পুলকেশ সরকার। 'তোমার জার্নি আরামদায়ক হবে তাতে সন্দেহ নেই।'

গাড়ি ছাড়ার পরে রঞ্জনবাবু মিনিট খানেক শুধু কামরার মধ্যে পায়চারি করলেন। এ সুখ বহুকাল পাননি তিনি। আজকালকার কামরায় ট্রেন চড়লে পরে সীটে বসে পড়ার আর গতি নেই। বাইরে করিডর আছে বটে, কিন্তু তা এতই সংকীর্ণ সেখানে হাঁটা চলে না। এক স্টেশন এলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পায়চারি করা যায়, তাছাড়া সারা রাস্তা অনড় অবস্থা।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর কোন সীটটা দখল করবেন এই নিয়ে একটু চিন্তা করে শেষে রায়পুরের প্ল্যাটফর্মের দিকের সীটটায় বসে সুটকেস থেকে একটা বালিস ও একটা ডিটেকটিভ বই বার করে শুয়ে পড়লেন রঞ্জনবাবু। এখন বিকেল সারে

পাঁচটা। অন্ধকার হয়ে যাবে একটুক্ষণের মধ্যেই। তবে বই পড়া বন্ধ করার প্রয়োজন নেই, কারণ মাথার পিছনে রীডিং লাইট আছে, এবং সেটা জ্বলে।

নটায় রায়গড় পেরোনর পর থেকেই একটা আমেজ অনুভব করলেন রঞ্জনবাবু। বিলাসপুরে লোক এসেছিল ডিনারের অর্ডার নিতে। রঞ্জনবাবু স্বভাবতই তাঁকে না করে দিয়েছেন। এবারে টিফিন ক্যারিয়ার খুলে খাওয়াটা সেরে নীল লাইট আর সব কটা আলো নিভিয়ে দিয়ে রঞ্জনবাবু বেঞ্চিতে গা এলিয়ে দিলেন। দেওয়া মাত্র মনে পড়ল রাউরকেলায় যাত্রী ঢুকবে ঘরে। আজকাল করিডর ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে কোনো যাত্রী উঠলে কন্ডাক্টর গার্ডই তার ব্যবস্থা করে দেয়। এই পুরোন গাড়িতে তাঁকেই উঠে দরজা খুলতে হবে। তাহলে কি দরজাটা লক্ করবেন না ? যদি ঘুম না ভাঙে ? ক্ষতি কি লক্ না করলে ? যিনি আসবেন তিনিই না হয় লক্ লাগিয়ে নেবেন। আর এমন কিছু মাঝ রাত্তির নয় তো, রাউরকেলা আসে বোধহয় সাড়ে দশটা নাগাদ। চিন্তার কোন কারণ নেই।

বেদম বেগে ছুটে চলেছে বোম্বাই মেল। কামরার দোলানিতে কারুর ভালো ঘুম হয় না, কিন্তু রঞ্জনবাবুর হয়। কোথায় যেন পড়েছিলেন যে মা শিশুকে কোলে দোল দিয়ে ঘুম পাড়ানোর স্মৃতি শিশু বড় হলেও তাঁর মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, তাই ট্রেনের দোলানিতে ঘুম পাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ছেলেবেলার ফার্স্ট ক্লাসে খাওয়া কেল্‌নারের চিকেন কারি অ্যান্ড রাইস আর কাস্টার্ড পুডিং-এর মধুর স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে রঞ্জনবাবু নিদ্রাসাগরে তলিয়ে গেলেন।

'গরম চায়! চায় গরম!'

ঘুমটা ভাঙল খোলা জানালার বাইরে থেকে ফেরিওয়ালার ডাক শুনে। স্টেশন। প্ল্যাটফর্মের ল্যাম্পপোস্ট থেকে আলোর রশ্মি টেরচা ভাবে কামরায় ঢুকে তাঁর নিজের শরীর ও মেঝের খানিকটা অংশে পড়েছে।

'হিন্দু চায়! হিন্দু চায়!!'

কী আশ্চর্য অপরিবর্তনশীল এই স্টেশনের ফেরিওয়ালার ডাক। মনে হয় একই লোক ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্টেশনে ঠিক একই ভাবে ডেকে চলেছে আবহমানকাল থেকে।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্টেশনের নাম দেখতে পেলেন না রঞ্জনবাবু। রাউরকেলা নয় ত ?

নামটা মনে পড়তেই রঞ্জনবাবুর চোখ চলে গেল বেঞ্চির বিপরীত দিকে। একটা টুং টুং আওয়াজ কানে এসেছিল ঘুমটা ভাঙামাত্র। এবার আবছা নীল আলোয় দেখলেন একটি লোক বসে আছে বেঞ্চিতে। তাঁর সামনে দুটো বোতল

ও একটি গেলাস। গেলাসে পানীয় ঢাললেন ভদ্রলোক এইমাত্র। এবার সেই পানীয় চলে গেল তাঁর মুখের দিকে।

মদ খাচ্ছেন নাকি সহযাত্রী ? উনিই কি রাউরকেলায় উঠেছেন ? এটা কি তাহলে চক্রধরপুর ? বড় স্টেশন বলেই ত মনে হচ্ছে।

রঞ্জনবাবু আগন্তুকের দিকে চেয়ে দেখলেন। মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবে একটা বেশ তাগড়াই গোঁফ রয়েছে ভদ্রলোকের সেটা বোঝা যায়। পরনে শার্ট ও প্যান্ট, তবে নীল আলোতে তাদের রঙ বোঝা মুশকিল।

রঞ্জনবাবুকে নড়াচড়া করতে দেখেই বোধহয় আগন্তুক তাঁর সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন। মদের গন্ধ পাচ্ছেন রঞ্জনবাবু। তাঁর নিজের ওসব বদ অভ্যাস নেই, কিন্তু চেনাশোনার মধ্যে অনেকেই ড্রিংক করে। পার্টি-টার্টিতেও যেতে হয় তাঁকে। কাজেই কোন্ পানীয়ের কী গন্ধ সেটা মোটামুটি জানা আছে। ইনি খাচ্ছেন হুইস্কি।

'ইউ দেয়ার।'

সোজা রঞ্জনবাবুর দিকে মুখ করে ঘড়ঘড়ে গলায় হাঁক দিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক।

গলা এবং উচ্চারণ শুনে রঞ্জনবাবুর বুঝতে বাকি রইল না যে যিনি উঠেছেন তিনি হচ্ছেন সাহেব। এ গলার দানাই আলাদা।

'ইউ দেয়ার।' আবার হাঁক দিয়ে উঠেন অন্ধকারে বসা সাহেবটি। নেশা হয়ে গেছে এর মধ্যেই, আর এত মেজাজের কী কারণ থাকতে পারে ?

'আপনি কিছু বলতে চাইছেন কি ?' ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন রঞ্জনবাবু। মনে মনে বললেন পুরোন ফাস্ট ক্লাসের সঙ্গে মানানসই বটে এই সাহেব সহযাত্রী।

'ইয়েস', বললেন সাহেব। 'গেট আউট অ্যান্ড লীভ মি অ্যালোন।'

অর্থাৎ, ভাগো হিয়াসে। আমি একা থাকতে চাই।

এবার রঞ্জনবাবু বুঝবেন যে সাহেবের নেশাটা বেশ ভালোমতোই হয়েছে। কিন্তু কথাটার ত একটা উত্তর দিতে হয়। যথাসাধ্য শান্তভাবে বললেন, 'আমারও রিজার্ভেশন রয়েছে এই কামরায়। আমরা দুজনেই থাকব এখানে—তাতে ক্ষতিটা কি ?'

গার্ডের হুইসলের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের ভো শোনা গেল, আর পর মুহূর্তেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বোম্বে মেল আবার রওনা দিল। রঞ্জনবাবু আড়চোখে স্টেশনের নামটা দেখে নিলেন। চক্রধরপুরই বটে।

এখন ঘরে নীল নাইট লাইট ছাড়া আর কোনো আলো নেই। রঞ্জনবাবুও সাহেবটিকে একটু ভালো করে দেখার জন্যে এবং মনে আরেকটু সোয়াস্তি আনার

জন্যে অন্য বাতি জ্বালানোর উদ্দেশ্যে সুইচের দিকে হাত বাড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু সাহেবের 'ডোন্ট!' হুঙ্কার তাঁকে নিরস্ত করল। যাই হোক্ এতক্ষণে রঞ্জনবাবুর চোখ অন্ধকারে সয়ে গেছে। এখন সাহেবের মুখ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। গোঁফ জোড়াটাই সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে। চোখ দুটো কোটরে বসা। নীল আলোতে গায়ের রঙ ভারী ফ্যাকাসে মনে হচ্ছে। মাথার চুল সোনালী না সাদা সেটা বোঝার উপায় নেই।

'আমি নিগারের সঙ্গে এক কামরায় থাকতে রাজি নই। তোমায় বলছি তুমি নেমে পড়।'

নিগার! উনিশশো সত্তর সালে ভারতবর্ষে বসে কোনো ভারতীয়কে নিগার বলার সাহস কোনো সাহেবের হতে পারে এটা রঞ্জনবাবু ভাবতে পারেননি। বৃটিশ আমলে এ জিনিস ঘটেছে এ গল্প রঞ্জনবাবু শুনেছেন। সব সময়ে যে বিশ্বাস হয়েছে তা নয়। সাহেবদের সম্বন্ধে অনেক মিথ্যে অপবাদ রটিয়েছে বাঙালিরা। আর যদি বা সত্যি হয়ে থাকে, সে সব সাহেব নিশ্চয়ই খুব নিম্নস্তরের। ভদ্র সাহেব, সভ্য সাহেব যারা, তারা ভারতীয়দের সঙ্গে এ ধরনের ব্যবহার কখনই করতে পারে না।

রঞ্জনবাবুর বিস্ময়ের ভাবটা কেটে গেছে। তবে এখনও ধৈর্যচ্যুতি হয়নি। মাতালের ব্যাপারে ধৈর্যহারা হলে চলে না। সুস্থ অবস্থায় এ সাহেব কখনই এ ধরনের কথাবার্তা বলতে পারত না।

রঞ্জনবাবু সংযতভাবে বললেন, 'তুমি যে ভাবে কথা বলছ, সেরকম কিন্তু আজকাল আর কোনো সাহেব বলে না। ভারতবর্ষ আজ বছর পঁচিশেক হল স্বাধীন হয়েছে সেটা বোধ হয় তুমি জান।'

'হোয়াট ?'

কথাটা বলেই সাহেব রঞ্জনবাবুকে চমকে দিয়ে ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে হো হো করে অট্টহাস্য করে উঠলেন।

'কী বললে তুমি ? ভারত স্বাধীন হয়েছে ? কবে ?'

'নাইনটীন ফর্টি সেভেন। অগাস্ট দ্য ফিফটীন্থ।'

কথাটা বলতে গিয়ে রঞ্জনবাবুর হাসি পাচ্ছিল। স্বাধীনতার এতদিন পরে নিজের দেশে বসে কাউকে তারিখ সমেত খবরটা দিতে হচ্ছে এটা একটা কমিক ব্যাপার বৈকি!

'ইউ মাস্ট বি ম্যাড!'

'আমি ম্যাড নই সাহেব,' বললেন রঞ্জনবাবু। 'আমার মনে হয় তোমার নেশাটা একটু বেশি হয়েছে।'

'বটে ?'

সাহেব হঠাৎ তাঁর ডান দিকে বেঞ্চির উপর থেকে একটা জিনিস তুলে নিলেন।

রঞ্জনবাবু সভয়ে দেখলেন সেটা একটা রিভলভার, আর সেটা সটান তাঁরই দিকে তাগ করা।

'সী দিস ?' বললেন সাহেব 'আমি আর্মির লোক। আমার নাম মেজর ড্যাভেনপোর্ট। সেকেন্ড পাঞ্জাব রেজিমেন্ট। আমার মত অব্যর্থ নিশানা আর কারুর নেই আমার রেজিমেন্টে। আমার হাত কাঁপছে কি ? তোমার শার্টের তৃতীয় বোতামের ডান দিকে আমার লক্ষ্য। ঘোড়া টিপলে সেখান দিয়ে গুলি ঢুকে সোজা জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তোমার আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। ভালো চাও ত বেরিয়ে পড়। একে ত নিগার। তার উপরে উন্মাদ, এটা কত সাল জান ? নাইনটীন থার্টিটু। আমাদের অনেক উত্যক্ত করেছে তোমাদের ওই নেংটি পরা নেতা। স্বাধীনতার সুখস্বপ্ন তোমরা দেখতে পার, কিন্তু সেটা বাস্তবে পরিণত হবে না কখনই!'

এবার সত্যিই প্রলাপ বকছেন সাহেব। উনিশশো সত্তর হয়ে গেল নাইনটীন থার্টিটু ? নেংটি পরা নেতা গান্ধীজী মারা গেছেন তাও হয়ে গেছে তেইশ বছর।

'কাম অন নাউ, গেট আপ।'

সাহেব উঠে দাঁড়িয়েছেন। রঞ্জনবাবু লক্ষ্য করেন তাঁর পা টলছে না। সবে শুরু করলেন কি তাহলে মদ খেতে ? কিন্তু এত উল্টোপাল্টা বকছেন কেন ? উনিই কি তাহলে উন্মাদ ?

'আপ! আপ!'

রঞ্জনবাবুর গলা শুকিয়ে গেছে। তিনি সীট ছেড়ে মেঝেতে নামতে বাধ্য হলেন। সেই সঙ্গে প্রায় তাঁর অজান্তেই তাঁর হাত দুটো উপরের দিকে উঠে গেল।

'নাউ টার্ন' রাউণ্ড অ্যাণ্ড গো টু দ্য ডোর।'

সাহেব বলে কি ? কমপক্ষে ষাট মাইল বেগে চলেছে মেল ট্রেন। তিনি কি চলন্ত অবস্থায় তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে চান ?

এই অবস্থাতেও কোনো মতে একটি কথা উচ্চারণ করতে সমর্থ হলেন রঞ্জনবাবু।

'শুনুন মেজর ড্যাভেনপোর্ট,—এর পরেই টাটানগর। গাড়ি থামলে আমি যাব অন্য কামরায়—কথা দিচ্ছি। চলন্ত গাড়ি থেকে নামিয়ে আমাকে মেরে ফেলে আপনার কি লাভ ?'

'টাটানগর ? ও নামে কোনো স্টেশন নেই। তুমি আবার আবোল তাবোল বকছ।'

রঞ্জনবাবু বুঝলেন যে এটা উনিশশো বত্রিশ সাল সেটা যদি সাহেব বিশ্বাস করে বসে থাকেন তাহলে অবিশ্যি টাটানগর বলে কোনো স্টেশন থাকার কথা নয়। এখানে প্রতিবাদ করাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বলে বললেন, 'ঠিক

আছে, মেজর ড্যাভেনপোর্ট, আমারই ভুল। তবে এর পর অন্য যে কোনো স্টেশনে গাড়ি থামুক, আমি তক্ষুণি নেমে যাব। ঘন্টাখানেকের বেশি তোমার নিগারের সঙ্গ বরদাস্ত করতে হবে না কথা দিচ্ছি।'

সাহেব যেন একটু নরম হয়ে বললেন, 'মনে থাকে যেন, কথার নড়চড় হলে তোমার লাশ পড়ে থাকবে লাইনের ধারে এটা বলে দিলাম।'

সাহেব গিয়ে তাঁর জায়গায় বসে হাত থেকে রিভলভার নামিয়ে রাখলেন বেঞ্চির এক পাশে। রঞ্জনবাবু এ যাত্রা প্রাণে মরেননি এটা ভেবে খানিকটা ভরসা পেয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। সাহেব যাই বলুন এর পরের স্টেশন যে টাটানগর সেটা রঞ্জনবাবু জানেন। আসতে আরো এক ঘন্টা দেরি। এই সময়টুকু তিনি এই কামরাতেই আছেন। তারপর কপালে কী আছে জানা নেই। অন্য ফার্স্ট ক্লাস কামরায় জায়গা পাবেন কি ? সেটা জানা নেই। জানার উপায়ও নেই।

ড্যাভেনপোর্ট সাহেব আবার মদ্যপান শুরু করেছেন। সাময়িকভাবে তাঁর সামনের বেঞ্চের যাত্রীর কথাটা তিনি যেন ভুলেই গেছেন। রঞ্জনবাবু আধ বোজা চোখে চেয়ে রয়েছেন তাঁর দিকে। এমন এক বিভীষিকাময় ঘটনার মধ্যে তাঁকে পড়তে হবে কে জানত ? পুলকেশ থাকলে এ জিনিস ঘটত কি ? না, তা ঘটত না। তবে এর চেয়েও সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারত। পুলকেশ রগচটা মানুষ। তাছাড়া শারীরিক শক্তি রাখে যথেষ্ট। তার দেশাত্মবোধ প্রবল। কোনো সাদা চামড়ার কাছ থেকে অপমান হজম করার লোক সে নয়। হয়ত ধাঁ করে একটা ঘুষিই লাগিয়ে দিত। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় এক গোরাকে ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেবার গল্প সে এখনো করে।

ট্রেন চলেছে রাতের অন্ধকার ভেদ করে। মিনিট দশেক পরে রঞ্জনবাবু অনুভব করলেন যে এই বিপদের মধ্যেও গাড়ির দোলানিতে তাঁর মাঝে মাঝে একটা তন্দ্রার ভাব আসছে।

এই অবস্থাতেই একটা নতুন চিন্তা তাঁকে হঠাৎ সম্পূর্ণ সজাগ করে দিল। সাহেবের কোনো মালপত্র নেই। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয় কি ? একটা সামান্য হাত-বাক্সও কি থাকবেনা ? শুধু মদ, সোডার বোতল, গেলাস আর রিভলভার নিয়ে কি কেউ ট্রেনে ওঠে ?

আর উনিশশো বত্রিশ সাল, নেংটি পরা নেতা, টাটানগর নেই—এসবেরই বা মানে কি ?

মানে কি তাহলে একটাই যে সাহেব আসলে জ্যান্ত সাহেব নন, তিনি ভূত ?

মেজর ড্যাভেনপোর্ট নামটা কি চেনা চেনা লাগছে ?

হঠাৎ ধাঁ করে রঞ্জনবাবুর একটা কথা মনে পড়ে গেল।

বছর পাঁচেক আগে ব্যারিস্টার বন্ধু নিখিল সেনের বাড়িতে আড্ডায় কথা হচ্ছিল। বিষয়টা সাহেবপ্রীতি এবং সাহেব বিদ্বেষ। কে বলেছিল ঠিক মনে নেই,

কিন্তু বোম্বে মেলেই একবার এক বাঙালিকে ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল এক গোরা সৈনিক। নামটা মেজর ড্যাভেনপোর্টই বটে। কাগজে বেরিয়েছিল খবরটা। সালটা জানা নেই, তবে থার্টিটু হওয়া আশ্চর্য না। সাহেবের হিসেবে একটু ভুল হয়েছিল। সেই বাঙালি ছিলেন অসীম সাহস ও দৈহিক শক্তির অধিকারী। অপমান হজম করতে না পেরে সাহেবকে মারেন এক বিরাশি শিক্কা ওজনের ঘুঁষি। সাহেব উল্টে পড়েন এবং বেঞ্চির হাতলে মাথায় চোট লেগে তৎক্ষণাৎ মারা যান।

রঞ্জনবাবু অনুভব করলেন তাঁর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কিন্তু এই অবস্থাতেও সামনের লোকটার দিকে আরেকবার না চেয়ে থাকতে পারলেন না তিনি।

মেজর ড্যাভেনপোর্ট হাতে গেলাস নিয়ে বসে আছেন। নাইট লাইটের আলো এমনিতেই উজ্জ্বল নয়; আলোর শেডও অপরিষ্কার, বাল্‌বের পাওয়ারও বেশি নয়। তার উপর গাড়ির ঝাঁকুনি। সব মিলিয়ে সাহেবের দেহটাকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। হয়ত এই কামরাতেই সাহেবের মৃত্যু হয়েছিল—১৯৩১ সালে। আর তখন থেকেই এই পুরোন আমলের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় রোজ রাত্তিরে...

রঞ্জনবাবু আর ভাবতে পারলেন না। সাহেব আর তাঁর দিকে দৃকপাত করছেন না; তিনি মদ নিয়ে মশগুল হয়ে বসে আছেন।

চেয়ে থাকতে থাকতে রঞ্জনবাবু অনুভব করলেন যে তাঁর চোখের পাতা আবার ভারী হয়ে আসছে। ভূতের সামনে পড়ে মানুষের ঘুম পেতে পারে এটা তিনি প্রথম আবিষ্কার করলেন। মেজর ড্যাভেনপোর্ট একবার নেই, একবার আছেন। অর্থাৎ চোখের পাতা বন্ধ হলে নেই, আবার খুললেই আছেন। একবার যেন সাহেব তাঁর দিকে চাইলেন। তারপর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা একটা কথা বার কয়েক এলো তাঁর কানে—'ডার্টি নিগার...ডার্টি নিগার...'

তারপর রঞ্জনবাবুর আর কিছু মনে নেই।

রঞ্জনবাবুর যখন ঘুম ভাঙল জানালার বাইরে ভোরের আলো। সামনের বেঞ্চে কেউ নেই। রাত্রের বিভীষিকার কথা ভেবে তিনি একবার শিউরে উঠলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ফাঁড়া কেটে গেছে বুঝতে পেরে হাঁপ ছাড়লেন। এ গল্প কাউকে বলা যাবে না। প্রথমত, কেউ বিশ্বাস করবে না, দ্বিতীয়ত, তিনি যে সাহেব ভূতের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন একটা খুব জাহির করে বলার নয়। 'ডার্টি নিগার'। কথাটা তাঁর আঁতে লেগেছিল বিশেষভাবে, কারণ তাঁর নিজের রং রীতিমতো ফরসা। অনেক রোদেপোড়া সাহেবের চেয়ে বেশি ফরসা। এই রঙের জন্য

লণ্ডনে অনেকে তাঁকে ভারতীয় বলে বিশ্বাস করেনি। আর তাঁকেই কিনা বলে ডার্টি নিগার!

সঙ্কল্প অনুযায়ী তাঁর ট্রেনের অভিজ্ঞতাটা রঞ্জনবাবু কাউকেই বলেননি। তবে তাঁর মধ্যে উগ্র সাহেব প্রীতির ভাবটা যে অনেকটা কমেছে সেটা তাঁর কাছের লোকেরা অনেকেই লক্ষ্য করেছিল।

ঘটনার দশ বছর পরে একদিন সন্ধ্যায় তাঁর নিজের বাড়িতে বন্ধু পুলকেশের সঙ্গে বসে কফি খেতে খেতে রঞ্জনবাবু ব্যাপারটা উল্লেখ না করে পারলেন না।

'সেভেনটিতে রায়পুর থেকে ফেরার সেই দিনটার কথা মনে পড়ে?'

'বিলক্ষণ।'

'তোমাকে বলি বলি করেও বলিনি, এক সাহেব ভূতের পাল্লায় পড়ে কী নাজেহাল হয়েছিলাম জান না।'

'মেজর ড্যাভেনপোর্টের ভূত কি?'

রঞ্জনবাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

'সে কি? তুমি জানলে কী করে?'

পুলকেশবাবু তাঁর হাতটা বন্ধুর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

'মীট দ্য গোস্ট অফ মেজর ড্যাভেনপোর্ট।'

রঞ্জনবাবুর মাথা ঝিমঝিম করছে।

'তুমি! তা তুমি অ্যান্দিন—?'

'বলে ফেললে ত সমস্ত ব্যাপারটাই ব্যর্থ হত ভাই। আমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার মধ্যে থেকে সাহেব প্রীতির ভূতটা তাড়ানো। ঘটনাটা যদি তুমি বিশ্বাস না কর, তাহলে কাজটা হবে কি করে? আমি নিগার বলছি, আর সাহেব নিগার বলছে—দুটোর মধ্যে তফাত নেই?'

'কিন্তু কী ভাবে—?'

'ভেরি ইজি', বললেন পুলকেশ সরকার। 'তোমার কামরাটা দেখেই ফন্দিটা আমার মাথায় আসে। গাড়ি ছাড়ার পর তোমার পাশে ফার্স্ট ক্লাস বগিটাতে উঠে পড়ি। আমার ফার্স্টএড বক্স থেকে তুলো নিয়ে গোঁফ করেছিলাম। তাছাড়া নো মেক আপ। আমারই কামরায় একটি গুজরাটি বাচ্চার হাতে দেখলাম একটা খেলার রিভলবার। এক রাতের জন্যে ধার চাইতে খুশি হয়ে দিয়ে দিল। তার বাপের সঙ্গে হুইস্কি ছিল। সেটাও চেয়ে নিলাম। অবিশ্যি কেন নিচ্ছি সেটাও বলতে হল। আমি নিজে খেয়েছি শুধু জল। হুইস্কির বোতলটা খোলা রেখেছিলাম যাতে তুমি গন্ধ পাও। বাস্। বাকি কাজ করেছিল তোমার কামরার নীল আলো, আর তোমার কল্পনা...আশাকরি কিছু মনে করনি ভাই।'

রঞ্জনবাবু বন্ধুর হাতটা দুহাতে চেপে ধরলেন বটে, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলেন না।

তাঁর বিস্ময় ভাবটা কাটতে লাগবে আরো দশ বছর।

ধাপ্পা

'চার্লস ওয়েকম্যানের 'হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক' আপনার ক' ভল্যুম ছিল ?'

সমরেশ ব্রহ্ম ইন্টারন্যাশনাল ম্যাজিক সার্কলের চিঠির উত্তরে সইটা করে মুখ তুলে চাইল মহিমের দিকে। তাঁর বন্ধু অধ্যাপক রণেন সেনগুপ্তের ছেলে মহিম। সবে লাইব্রেরিয়ানশিপ পাশ করেছে। সে নিজেই আগ্রহ করে তার সমরেশ কাকার আড়াই হাজার অগোছালো বইগুলোকে বিষয় অনুযায়ী ভাগ করে গুছিয়ে শেল্‌ফে রেখে তাদের একটা তালিকা করে দেবার ভার নিয়েছে।

'কেন, দু ভল্যুম!' বলল সমরেশ।

'মাত্র একটাই পাচ্ছি। সেকেন্ডটা ?'

'সেকি! ভালো করে দেখেছ ?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য! সেটটা কানা হয়ে গেল ? ও বই যে আর পয়সা দিলেও পাওয়া যায় না।'

সমরেশ ব্রহ্মের বইয়ের নেশা সেই কলেজ থেকেই। পঁচিশ বছর আগের কথা। ইতিহাসের ছাত্র ছিল সে, তবে তার বাইরেও অনেক বিষয়ের বইয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। যেমন ভ্রমণ কাহিনী, প্রত্নতত্ত্ব, অ্যানাটমি। আর ম্যাজিক। ম্যাজিক ছিল প্রথমে সমরেশের হবি। তারপর ক্রমে সেটা নেশায় দাঁড়ায়। বাপ ছিলেন কলকাতার নামকরা ব্যারিস্টার আদিনাথ ব্রহ্ম। ছেলেও বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টারি পাশ করে আসে, এমন একটা ইচ্ছে বাপের ছিল, এবং সে ইচ্ছে অনুযায়ী সমরেশ গিয়েও ছিল বিলেত। কিন্তু কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে তিন মাস পড়ার পর জাদুকর মার্কা সিলভারস্টোনের সঙ্গে আলাপ হয়ে পড়াশুনা শিকেয় উঠল। সমরেশ তাঁর বাপকে জানাল সে ব্যারিস্টারি পড়বে না, তাঁর শখ চেপেছে ম্যাজিসিয়ান হবার। অনুরোধটা যাতে আরো জোরদার হয় সেই উদ্দেশ্যে নিজের চিঠির সঙ্গে সিলভারস্টোনেরও একটা চিঠি সে পুরে দিল খামের মধ্যে। সিলভারস্টোন লিখেছে আদিনাথ ব্রহ্মকে,—*'তোমার ছেলের বন্ধু*

হিসেবেই তোমাকে লিখছি—সমরেশ ইজ ওয়ান্ডারফুল ক্লেভার উইথ হিজ হ্যাণ্ডস। ঐন্দ্রজালিক হিসেবে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে বলে আমি মনে করি।'

এক্ষেত্রে যে-কোনো সাধারণ বাপই হয় মর্মাহত হতেন, না হয় মারমুখো হতেন। কিন্তু আদিনাথ ছিলেন সাধারণের বাইরে। তিনি ছেলেকে লিখলেন,—*'তোর স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তোর মধ্যে যদি কোনো বিশেষ ক্ষমতা থেকে থাকে, তাহলে সেটার স্ফুরণ হোক সেটাই আমার কাম্য। লণ্ডনে যদি ম্যাজিক শেখার সুযোগ থাকে তাহলে তার জন্য কী খরচ পড়বে সেটা আমাকে জানাতে দ্বিধা করিস না। আমি টাকা পাঠিয়ে দেব।'*

সমরেশ কিন্তু আর লণ্ডনে থাকেনি। সে দুমাসের মধ্যে দেশে ফিরে আসে এবং বাড়িতেই ম্যাজিক অভ্যাস শুরু করে। তখন বয়স বাইশ। পঁচিশ বছর বয়সে সে প্রথম মঞ্চে ম্যাজিক দেখায়। সেটা অবিশ্যি একক প্রদর্শনী; শুধু হাত সাফাইয়ের খেলা। তা সত্ত্বেও এই তরুণ জাদুকরের আশ্চর্য দক্ষতার প্রচুর তারিফ করে দৈনিক কাগজের সমালোচকেরা।

বত্রিশ বছর বয়সে সাতজন সহকর্মী ও ষ্টেজ ইল্যুশনের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন *'ব্রামা দ্য গ্রেট।'* শো-এর শেষে দর্শকের তুমুল করধ্বনিতে হলের প্রথম সারিতে বসা আদিনাথ ব্রহ্মের বুক গর্বে দশ হাত হয়।

উনিশশো চুয়াত্তরে আদিনাথের মৃত্যু হয়। বাপের একমাত্র সন্তান হিসেবে সমরেশ তাঁর সম্পত্তির মালিকানা পায়। কিন্তু ততদিনে তাঁর নিজের রোজগারও কিছু কম নয়। ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে ডাক ত আসেই, এই সঙ্গে বিদেশ থেকেও আহ্বান আসা শুরু হয়েছে। আইটেমগুলোর উৎকর্ষ ছাড়াও, সমরেশের শো-এর দুটো বিশেষত্ব দেশে-বিদেশের দর্শককে, বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। জাদুকরের বুক্‌নিটা তার ম্যাজিকের একটা অঙ্গ বলেই এতদিন লোকে মেনে নিয়েছে। সমরেশই প্রথম দেখাল যে কথা না বলেও জাদু হয়। আড়াই ঘণ্টা শো-এর মধ্যে একটিবারের জন্যও মুখ খোলে না সে। তার বদলে কানে শোনার জন্য যেটা থাকে সেটা হল সমরেশের দ্বিতীয় বিশেষত্ব। সেতার সরোদ বাঁশী ও তবলার একটি চমৎকার অর্কেস্ট্রার খাঁটি রাগসঙ্গীত সমরেশ ব্যবহার করে তাঁর জাদুর সঙ্গে। সব দেশেরই দর্শকের কাছে এটা একেবারে নতুন জিনিস। বিশেষ বিশেষ জাদুর সঙ্গে বিশেষ বিশেষ রাগ যেভাবে খাপ খেয়ে যায় সেটা দর্শকের চিত্ত জয় না করে পারে না।

আজ একচল্লিশ বছর বয়সে সমরেশের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। তাঁর ম্যাজিকের উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে তাঁর জনপ্রিয়তাও বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। কলকাতায় তাঁর ম্যাজিকের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সাত দিনের সব টিকিট বিক্রী হয়ে যায়। শো-এর শেষে আনন্দে ও বিস্ময়ে বিভোর অবস্থায় ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষের

দল বেরিয়ে আসে হল থেকে। সমরেশও জানে যে একসঙ্গে হাজার দু'হাজার লোককে সুকৌশলে ধাপ্পা দেওয়ার আর্ট আজ তাঁর হাতের মুঠোয়। আমেরিকানরা তাঁর তুলনা করে থার্সটন ও হুডিনির সঙ্গে, বৃটিশরা করে ম্যাসকেলাইন ও ডেভিড ডেভান্টের সঙ্গে, ফরাসীরা রোবেয়র-উদ্যাঁ আর হংকং-এর চীনেরা চিং-লিং ফু-এর সঙ্গে।

তবে সমরেশের আকাঙ্ক্ষার শেষ এখানেই নয়; তাঁর দৃষ্টি এখনো সামনের দিকে। আরো নতুন-নতুন জাদুর উদ্ভব করবে সে, দর্শকদের আরো চমক দেবে, মুগ্ধ করবে, বিস্মিত করবে।

আর তাই তাঁর বই কেনা আর বই পড়াও শেষ হয়নি। ম্যাজিকের বই ত বটেই, সেই সঙ্গে আছে উইচ্‌ক্রাট, ভূডুইজ্‌ম ইত্যাদি আদিম ম্যাজিক, আর হিপ্‌নটিজ্‌ম, ক্লেয়ারভয়েন্স, ভেন্‌ট্রিলোকুইজম ইত্যাদি সংক্রান্ত বই। শুধু এই সব বইয়েতেই তাঁর তিনখানা বড় বুককেস ভরে গেছে। বাইরে থেকে অর্ডার আছে আরো খান-পনেরো সদ্য প্রকাশিত বইয়ের। অনেকটা সময় বাইরে থাকতে হয় বলে বইগুলো অগোছালো ভাবে ছড়িয়ে ছিল, তাই বন্ধুপুত্রের প্রস্তাবে সমরেশ আপত্তি করেনি। মহিমের কাজ শেষ হতে লাগবে আরো দিন চারেক।

এককালে বন্ধুবান্ধবদের বই ধার দিয়েছে সমরেশ, যদিও খুশিমনে দেয়নি কখনো। কেউ কিছু চাইলে না বলাটা ছিল সমরেশের ধাতের বাইরে। এটা যে চরিত্রের একটা দুর্বলতা সেটা সে নিজেও বুঝত, কিন্তু বুঝেও কারুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি কখনো। ধার দেওয়া বইয়ের হিসেব রাখার জন্য একটি খাতা করেছিল সমরেশ; যে বই নিচ্ছে সে নিজেই তাঁর নাম, বইয়ের নাম এবং ধার নেবার তারিখ সেই খাতায় লিখে রাখত। বই ফেরত এলে সমরেশ এই নাম-তারিখের উপর দিয়ে কলম চালিয়ে পাশে একটা সই করে রাখত।

কাজে সফলতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চরিত্র আরো দৃঢ় হয়, আত্মপ্রত্যয় বাড়ে। সেই কারণেই বোধহয় বছর দশেক হল সমরেশ বই ধার দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে—'মাপ করো ভাই, ওই একটি অনুরোধ রাখতে পারব না'—এই কথাটা বলা হঠাৎ তাঁর পক্ষে সহজ হয়ে গিয়েছিল। আজকাল ব্যাপারটা সকলেই জানে, তাই তাঁর আর অনুরোধটা কেউ করেও না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই একটা বই বেপাত্তা হয় কি করে?

ওই খাতাটা একবার দেখলে হত না নাকি? কিন্তু ম্যাজিকের বই নেবার মতো লোক—?

ঠিক ত! তেমন লোকও ছিল। সমরেশের মনে পড়েছে। মহিম পাশেই দাঁড়িয়ে; সমরেশ তাঁর দিকে ফিরল।

'শোন মহিম, আমার ইতিহাসের বইয়ের শেল্‌ফের ডানদিকে একটা ছোট রাইটিং টেব্‌ল আছে, দেখছ ত? তার দেরাজে দেখবে একটা নীল রঙের

নোটবুক আছে। এককালে বই ধার দিয়েছি লোককে; যে নিত সে ওই নোটবুকে লিখে রাখত। একবার ওটাতে দেখ ত 'হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক, কেউ ধার নিয়েছিল কিনা ?'

মহিম এক মিনিটের মধ্যেই খাতাটা নিয়ে এল, তাঁর মুখে হাসি।

'পাওয়া গেছে', বলল মহিম। 'লাস্ট এন্‌টি। নামটা কাটা হয়নি।'

'সুশীল তালুকদার কি ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক ধরেছি। দেখি খাতাটা।'

যাক, অন্তত হদিস পাওয়া গেছে। চার্লস ওয়েকম্যানের হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক ভল্যুম ওয়ান ধার নিয়েছিল সুশীল তালুকদার ১০.১০.৭৬ তারিখে। অর্থাৎ আজ থেকে দশ বছর আগে। ফেরত দেয়নি। হস্তাক্ষর সুশীলের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু সুশীল ত এসেছিল দিন পাঁচেক আগে। বিকেলের দিকে। তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে জানিয়ে স্লিপ পাঠিয়েছিল মহিমের হাতেই। অসুস্থতার অজুহাতে সমরেশ দেখা করেনি। সাক্ষাতের কারণ তো জানাই আছে। হয় শো-এর টিকিটের জন্য হাতে-পায়ে ধরা, না হয় কোনো ফাংশনে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি। এককালে প্যান্ডেলে ম্যাজিক দেখিয়েছে বৈকি সমরেশ। কিন্তু এখন যে সমরেশ আর সে সমরেশ নেই সে কথাটা অনেকেই ভুলে যায়। আর টিকিটের জন্য আবদার জিনিসটা ত বাঙালিদের মজ্জাগত। ফুটবলের টিকিট, ক্রিকেটের টিকিট, থিয়েটারের টিকিট, ম্যাজিকের টিকিট—এর আর শেষ নেই। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনতে হবে ভাবলেই গায়ে জ্বর আসে। যদি আসল লোকের কাছে চাইলে পাওয়া যায় তাহলে মিথ্যে হ্যাঙ্গামা কেন ? যতসব কুঁড়ের দল। অথচ না দিলে বলবে ব্রামা দা গ্রেটের ভারী দেমাক হয়েছে; নইলে পুরোন আলাপীদের এই ভাবে নিরাশ করে ?

'এ ভদ্রলোক ত এসেছিলেন সে দিন', বলল মহিম।

'হ্যাঁ। নির্ঘাত কোনো ফেভার চাইতে। সঙ্গে করে বইটা নিয়ে এলেই হত, কিন্তু তা করবে না। তখনকার দিনে আড়াইশো টাকা দাম ছিল সেটটার। বহুদিন আউট অফ প্রিন্ট। আজকের দিনে নতুন করে ছাপলে দাম হবে হাজার টাকা।'

সমরেশ কথা থামিয়ে ভুরু কুঞ্চিত করল। তারপর বলল, 'কিরকম দেখলে ভদ্রলোককে ? আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। বহুকাল দেখা নেই।'

'রোগা, আধপাকা চুল, ঘন ভুরু, চোখদুটো তীক্ষ্ণ। আমি বললাম আপনি এ সময় দেখা করেন না, তাও জোর করে স্লিপ পাঠালেন। বললেন, ওনার নাম শুনলে নাকি আপনি দেখা করতে পারেন।'

'হু...'

সুশীল তালুকদারকে ম্যাজিকের বইটা ধার দেবার স্মৃতি সমরেশের মন থেকে একেবারে মুছে গেছে। কী মূর্খই ছিল সে নিজে দশ বছর আগে। নইলে এমন বই কেউ ধার দেয় ? তখনও পর্যন্ত সুশীলের ম্যাজিক সম্বন্ধে বেশ আগ্রহ ছিল সেটা সমরেশের মনে আছে। হাত সাফাইটা বেশ ভালোই পারত। তবে ধৈর্য বা অধ্যবসায় কোনোটাই ছিল না।

তাছাড়া অবিশ্যি সমরেশের মতো ধনী বাপও ছিল না। তাই ম্যাজিকটাকে পেশা হিসেবে নেবার প্রশ্ন সুশীলের ক্ষেত্রে ওঠেনি। সেই লোকের কাছে আজ দশ বছর থেকে পড়ে আছে সমরেশের সংগ্রহের সবচেয়ে মূল্যবান দুটি বইয়ের একটি।

ভরসা এই যে, জানা যখন গেছে তখন ফেরত পাবার একটা উপায় হবে নিশ্চয়ই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা কলামন্দিরে শো ছিল। রাত দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে এসে সমরেশের আবার মনে পড়ল বইয়ের কথাটা। বছর বারো আগে প্রথম কিনে বই দুটো সুশীলকে দেখিয়েছিল সেটাও মনে পড়ল। সুশীলের মন্তব্যটাও মনে পড়ল— 'জাদুবিদ্যার ইতিহাসে একদিন তোমারও নাম লেখা হবে সমরেশ!' সুশীলের অবস্থা তেমন সচ্ছল নয় সেটা সমরেশ জানে। সে বিয়ে করেছিল বেশ অল্প বয়সে। দুটি মেয়েও হয়েছিল। একটির অন্নপ্রশনে সমরেশ নেমন্তন্ন খেয়েছিল। ইতিমধ্যে আরো সন্তান হয়ে থাকতে পারে। এমন মানুষের টাকার টানাটানি আশ্চর্য ঘটনা নয়। সে যদি বইটা বিক্রি করে দিয়ে থাকে ? মহামূল্য সেটটা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে মনে করে সমরেশের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

পন্থা একটাই। সে নিজে বইটা ফেরত নিয়ে আসেনি, তখন তাঁকে চিঠি লিখে সেটার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে।

সমরেশ লিখল,—

'প্রিয় সুশীল,

'সেদিন তুমি এলে, অথচ অসুস্থতার জন্য তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। আশা করি কিছু মনে করনি। আমার একটা বই—ওয়েকম্যানের 'হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক' প্রথম খণ্ড, ১০.১০.৭৬ তারিখে আমার কাছ থেকে তুমি পড়তে নিয়েছিলে—একথা আমার নোটবুকে তোমার নিজের হস্তাক্ষর বলছে। ওটা আমার সংগ্রহের একটা সেরা বই, এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য। পত্রপাঠ যদি সেটা ফেরত দিতে পার ত আশ্বস্ত হই। সকালের দিকে এলে চা-যোগে কিঞ্চিৎ আড্ডাও হতে পারে। শুভেচ্ছা নিও।—সমরেশ।'

চিঠিটা লিখে বার দুয়েক পড়ে দেখল সমরেশ। ফেরত দেবার ব্যাপারটা বেশ জোর দিয়েই বলা হয়েছে, তবে রূঢ়ভাবে নয়, এটাই দরকার।

খামের উপর ঠিকানা লিখে টিকিট লাগিয়ে সমরেশ ড্রাইভার রঘুনাথের হাতে চিঠিটা দিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ ডাকে ফেলে আসার জন্য।

কলকাতার ডাকবিভাগ যে সব সময়ে খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে তা নয়। তবে তাদের গাফিলতির জন্য চার দিন সময় দিয়েও যখন সুশীল তালুকদার দেখা দিল না, তখন সমরেশ রীতিমতো বিরক্ত বোধ করল। এখন করা কী ? নিজে গিয়ে সরাসরি বইটা ডিমান্ড করাটা কি একটু বিসদৃশ মনে হবে ? তা হলেও যদি ধরে নেওয়া যায় যে চিঠি সুশীলের হাতে পৌঁছায়নি, ডাকে খোয়া গেছে, তাহলে এ ছাড়া গতি কী ? বুক শেল্‌ফ-এর দিকে চোখ পড়লেই দ্বিতীয় খণ্ডের পাশে প্রথম খণ্ডের অভাবে সমরেশের মনটা হু হু করে ওঠে। বইয়ের নেশা এমনই জিনিস। ওটা উদ্ধার না করা অবধি শান্তি নেই।

সাতের তিন মাধব লেনে থাকে সুশীল তালুকদার। রবিবার সকালে গেলে তাকে বাড়িতে পাবার সম্ভাবনাটা বেশি, তাই সেটাই করল সমরেশ। ন'টার সময় সুশীলের কলিং বেলে তাঁর হাত পড়ল। মাধব লেনে এসময় লোক চলাচল যথেষ্ট। সমরেশ কোনো জনপ্রিয় ফিল্মস্টার হলে আর রক্ষা ছিল না, কিন্তু এমনি দেখে তাঁকে ব্রামা দ্য গ্রেট বলে চেনার কোনো উপায় নেই। স্টেজে সে গোঁফ ও ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ব্যবহার করে এবং নিজের আসল চেহারা কাগজে ছাপতে দেওয়ায় তার নিষেধ আছে।

'কাকে চাই ?'

দরজা খুলেছে একটি চাকর।

'সুশীলবাবু আছেন কি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কী নাম বলব ?'

'বলো যে সমরেশবাবু দেখা করতে এসেছেন।'

চাকর তাঁকে বসতে বলে ভিতরে চলে গেল বাবুকে ডাকতে।

দরজার পিছনে বৈঠকখানায় ছড়ানো রয়েছে গোটা চারেক সাধারণ সোফা ও চেয়ার, মাঝখানে একটা গোল কাশ্মীরী কাঠের টেবিল, একপাশে একটা ছোট বইয়ের আলমারির মাথায় একটা ওয়ার পরানো রেডিও, দেয়ালে গোটা তিনেক ছবি ও দু'রকম ক্যালেন্ডার।

সমরেশকে বসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার উঠতে হল। চোখ কপালে তুলে পর্দা ফাঁক করে হাসিমুখে ঘরে ঢুকেছে তাঁর কলেজের সহপাঠি সুশীল তালুকদার।

'কী সর্বনাশ! এ কী সৌভাগ্য আমার! কোনদিকে সূর্য উঠল ভাই ?'

'আমার চিঠিটা পাওনি বোধহয় ?'

'পেয়েছি বৈকি!'

'তাহলে... ?'

সমরেশ হতভম্ব। সুশীল বসেছে তাঁর মুখোমুখি সোফায়।

'ব্যাপার কী জান ? বইয়ের প্রতি তোমার যে কী দুর্বার আকর্ষণ সে ত জানি ? আর সেদিন ত গিয়ে দেখলুম আরো কত বেড়েছে তোমার সংগ্রহ। তাই ভাবলুম যদি জবাব না দিই তাহলে তোমার সশরীরে এসে পড়াটা খুব আশ্চর্য নয়। তা অনুমান ঠিকই করেছি, কী বল ?'

সশরীরে এসে পড়ে সমরেশের যে খুব ভালো লাগছিল তা নয়। দু'জনের জগৎটা যে একেবারে আলাদা হয়ে গেছে সেটা সে বেশ বুঝতে পারছিল। পৃথিবীর চল্লিশটা বড় শহরের কত লক্ষ লোককে সে তার যাদুবলে বশ করেছে, আরো কত লক্ষকে করবে। আর সুশীল ? কত সংকীর্ণ তার জগৎটা! ভাবলে অনুকম্পাই হয়। বইটা পেয়েই সমরেশ উঠবে। এর সঙ্গে বসে গালগল্প করার সময় তার নেই।

'তুমি চালটা ঠিকই চেলেছ', বলল সমরেশ। 'এমনিতে হয়ত সত্যিই আসা হত না। শো চলছে ত শহরে, তাই বেজায় ব্যস্ত। এবার বইটা যদি ফেরত দাও ত উঠে পড়ি।'

'বই ?'

'আছে ত ? নাকি...'

সুশীল তালুকদার হো হো করে হেসে উঠল।

'তোমার কোনো বই আমার কাছে নেই ভাই।'

'সে কি!'—যা আশঙ্কা করেছিল তাই। সে বই পাচার হয়ে গেছে!

'বই আছে তোমার বাড়িতেই', বলল সুশীল তালুকদার।

'মানে ? খাতায় যে তোমার হাতে লেখা দেখলাম—'

'তা থাকবে না কেন ? খাতাটা কোথায় থাকত সেটা ত আমার জানা। ওই ছোকরাটির কথা শুনেই যখন বুঝলাম তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, তখন মাথায় একটা মতলব এল। দেখিই না একটু রগড় করে! ওকে স্লিপ দিয়ে হটিয়ে দিলুম। তারপর দেরাজ খুলে দেখলুম নোটবুক সেখানেই আছে। ম্যাজিকের বইটা শেল্‌ফে দেখতে পাচ্ছিলুম, লিখে দিলুম খাতায় সেটার নাম, আমার নাম আর দশ বছর আগের একটা তারিখ। তারপর দু'ভল্যুম বইয়ের এক ভল্যুম বার করে নিয়ে লুকিয়ে রেখে দিলুম তোমারই ঘরে।'

'কোথায় ?'

'তোমার যে বাক্স প্যাটার্নের পুরোন গ্রামোফোনটা আছে, সেটার ঢাকনা খুললেই পাবে।'

'কিন্তু—কিন্তু...' কিঞ্চিৎ আশ্বস্তভাবের সঙ্গে একটা হতভম্বভাব মনটাকে দু'ভাগে চিরে ফেলেছে। 'এরকম পাগলামির কারণটা কী ?'

'কারণ আর কিছুই না, ভাই', বলল সুশীল তালুকদার। 'সেদিন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম আমার দুই মেয়ের অটোগ্রাফের খাতা। 'ব্রামা দ্য গ্রেট' আমার কলেজের সহপাঠী ছিল সেটা তাদের বলেছি। তার উপরে তোমার ম্যাজিক দেখে তারা অভিভূত। আবদার করল তোমার সই নিয়ে আসতে হবে। তুমি ত দেখা করলে না। তারা শুনে প্রচণ্ড খাপ্পা, তোমার উপর থেকে ভক্তি চলে যায় আর কি! এটা হবে আমি জানি, যদিও হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। বললুম বেচারা অসুখের জন্যে আসতে পারেনি, এবার দেখিস্ একেবারে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হবে। আর হলও ত তাই!—ওরে রুনু ঝুনু! তোরা আয়রে!—দেখে যা তোদের বাপের কথা ঠিক হল কিনা!'

পরক্ষণেই পর্দা ফাঁক করে বারো থেকে ষোল বছর বয়সের দুটি ছিপ্‌ছিপে মেয়ে মুখে সলজ্জ হাসি ও চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে ঘরে ঢুকে সমরেশকে প্রণাম করে তার সামনে খাতা কলম ধরল।

সই দিতে দিতে সমরেশ ব্রহ্ম ভাবল তাকে ধাপ্পা দিতে পারে এমন লোকও এই কলকাতা শহরেই আছে এটা তার জানা ছিল না।

❐

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বাছাই বারো

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আলোচনা সম্বলিত
বাছাই বারো প্রসঙ্গে

সত্যজিৎ রায়ের অনন্য লেখনীর যাদুতে সৃষ্ট ৪৮টি অনবদ্য কিশোরগল্প থেকে পাঠকের নির্বাচনে 'বাছাই বারো' শিরোনামে বাছাইকৃত গল্পের সংকলণটি প্রকাশমাত্রেই দুইবাংলায় সমাদৃত হয়। সত্যজিৎ রায় সংকলণটি দেখার পর মন্তব্য করেন, তাঁর নিজের বাছাই করে দেয়ার পর আবার বাছাই কেন ? প্রকাশকের জবাব ছিলো, লেখকের সব গল্পই তো সন্তানের মতো। চারটি বা পাঁচটি সন্তানের মাঝে কোন দুটি বেশি প্রিয়, বাবা-মায়ের পক্ষে এটি দুরূহ বিচার্য।

পাঠকের আগ্রহ বিবেচনা করে চার ডজন গল্পের মধ্যে এক ডজন বাছাই সত্যি কঠিন। অন্ততঃ সত্যজিৎ রায়ের গল্পের ক্ষেত্রে এই কথা অনস্বীকার্য। কোনটা কোন গল্পের চেয়ে ভালো, কোন গল্পে লেখককে কত মার্ক দেয়া যায় এভাবে বিচার না করে প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো মূলতঃ দুই বাংলার পাঠকদের মনে কোন গল্পগুলি বেশি আনন্দ দিয়েছে...

বইটি প্রকাশের পর সত্যজিৎ রায় ও বাছাইকারের সাক্ষাতকালে ছবিটি তুলেছেন দাউদ হায়দার।

ISBN 984-702-115-5
9 789848 488447